জগদীশচন্দ্র

সেরা রচনা সম্ভার

www.banglabooks.in

জগদীশচন্দ্র

সেরা রচনা সম্ভার

banglabooks.in

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009

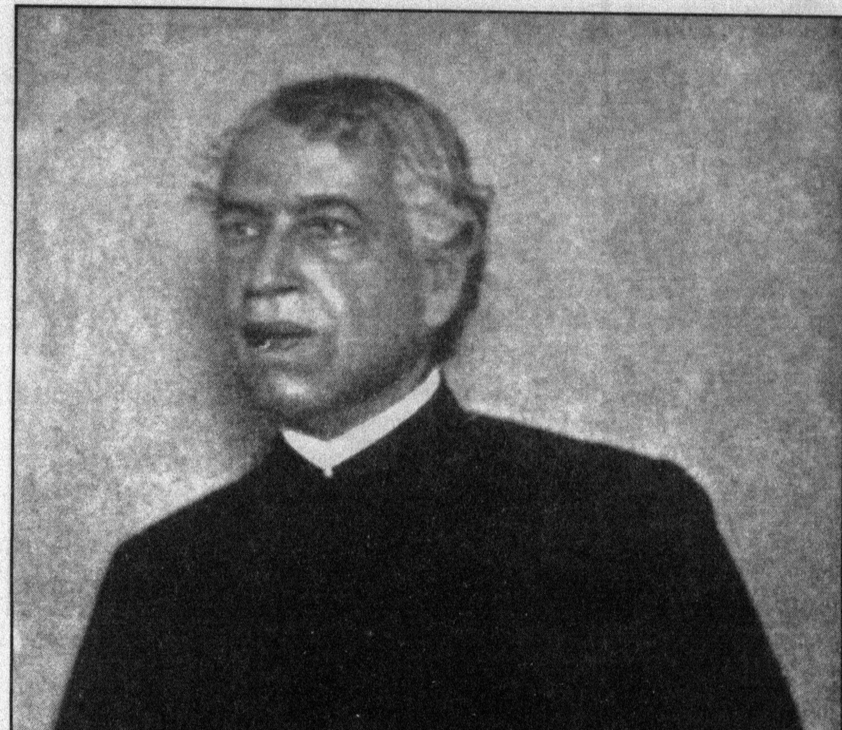

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮

মৃত্যু ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

১৯২৮ সালে ছাত্রদের সঙ্গে
বসে বামদিক থেকে—মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, জে. সি. ঘোষ
দাঁড়িয়ে বামদিক থেকে—এস. দত্ত, এস. এন. বোস, ডি. এম. বোস, এন. আর সেন,
জে. এন. মুখার্জি, এন. সি. নাগ

বসু বিজ্ঞান মন্দির

সূ চি প ত্র

প্রসঙ্গ জগদীশচন্দ্র

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ১৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ২১
জগদানন্দ রায়

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৩১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার ৫০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আমেরিকায় আচার্য জগদীশচন্দ্র ৫৯
অমলচন্দ্র হোম

জগদীশচন্দ্রের রচনা

অব্যক্ত ৬৫

অন্যান্য রচনা

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ১৫৩
উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র ১৫৮
বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গি ১৬৫
কচুরিপানা ১৬৮

ভ্রমণ বিষয়ক রচনা

লুপ্ত নগরী ১৭৭
আগ্নেয়গিরি দর্শন ১৮০
লণ্ডনের গল্প ১৮১
ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি ১৮৩
পার্লামেন্ট দর্শন ১৮৬
চিতোর দর্শন ১৮৮

লখনউ ভ্রমণ ১৯১
মাদ্রাজ ভ্রমণ ১৯৪
কাশ্মীর ১৯৭
ভেনিস ২০২

বিবিধ রচনা
নাদির শা'র শাস্তি ২০৭
অদ্ভুত কৌশল ২০৮
বিহারীলাল গুপ্ত ২০৯
বন্দির মুক্তি ২১০
ইতর প্রাণীদের দয়া ২১৪
সুরেশদের বাগান ২১৬
বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু ২১৮
কুমুদিনীর নিশি জাগরণ ২২১

বক্তৃতাবলী
ছাত্রসমাজের প্রতি ২২৭
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আচার্য বসুর ভাষণ ২২৯
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ ২৩২
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ ২৩৭
ট্রপিক্যাল মেডিসিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে বক্তৃতা ২৪৮
The Voice of life ২৫১

প্রসঙ্গ জগদীশচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কথা উত্থাপিত হইলে আমরা সচরাচর আর্য ঋষিগণের ধর্মোন্নতি এবং আর্য মনীষীগণের দার্শনিক জ্ঞানের কথাই ভাবিয়া থাকি। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিয়া থাকি বটে, কিন্তু প্রধানত পরমার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয় ভারতের প্রাধান্যই সচরাচর আমাদের পূর্বপুরুষগণের গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্তমান কালে পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলেন তাহাতেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রিক ও রোমকেরা পাটিগণিতের কোনও উন্নতি করিতে পারেন নাই। এমন কোন সংখ্যাবাচক অঙ্কের দক্ষিণে শূন্য বসাইলে তাহার মান দশ গুণ বৃদ্ধি হয়—ইত্যাকার যে দশমিক পদ্ধতি, সভ্যজগৎ তজ্জন্য প্রাচীন হিন্দুগণেরই নিকট ঋণী। এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাটিগণিতের কোনো উন্নতি হইতে পারিত না। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা বীজগণিত সম্বন্ধীয় হিন্দুগ্রন্থ অনুবাদ করেন; এবং পাইসা নিবাসী লিউনার্ডো উক্ত বিজ্ঞান আধুনিক ইউরোপে প্রবর্তিত করেন। ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুগণ জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা ছিলেন। জ্যামিতির আবিষ্ক্রিয়াও প্রথমে ভারতবর্ষেই হয়। গ্রিকগণ এই বিষয় অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এলাহাবাদ মিওর সেন্ট্রাল কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার টিব দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষেই এ বিদ্যার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে জ্যোতিষেরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। জড় বিজ্ঞানও তাহাদের অনুশীলনের বিষয় ছিল। তাঁহারা নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ

স্বর্ণমাক্ষিক, সৌমীরাঞ্জন, হরিতাল, তুত্থং (তুঁতে ইতিভাষা) পুষ্পকাশীশ, কাশীশ, লৌহভস্ম, মণ্ডুর, রসকর্পূর, রসপর্ণটি, স্বর্ণ সিন্দুর, ও মকরধ্বজ।

হিন্দুগণ দ্রাবণ, বাষ্পীকরণ, ভস্মীকরণ, ঊর্ধ্বপাতন, তির্যক পাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে,প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সংসারকে মায়াময় ভাবিয়া কেবল আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা নয়। তাঁহারা নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন একজন ভূমিশূন্য ব্যক্তির পূর্বপুরুষগণ জমিদার ছিলেন বলিয়াই তাহার উদর পূর্তি হয় না, তেমনি ভারতের পূর্ব গৌরব স্মরণ করিলেই আমাদের সাময়িক দরিদ্রতা দূর হইতে পারে না। গৌরবান্বিত নামের উত্তরাধিকারী হইয়া আলস্যে উদ্যমহীন ভাবে কালযাপন করা অতি হেয়; পূর্বপুরুষগণের যশ উজ্জ্বলতর করিতে না পারি, অন্তত তাহার ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় যে জাতির স্ফূর্তিহীনতা, নৈরাশ্য ও অনুদ্যমের উৎপত্তি

হয়, জাতীয় প্রতিভার অবনতির তাহা একটি প্রধান কারণ। তাহার উপর আমাদের দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষা থাকিলেও উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাব আমাদিগকে আরও প্রতিভাবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা এবং অন্যান্য কোনো কোনো বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় নানা বিষয়ে আবার ভারতের জাতীয় প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আজ আমরা যাহার কথা লিখিতে বসিয়াছি তিনি বিজ্ঞানবিষয়ে জাতীয় প্রতিভাকাশে ঊষার রক্তির রেখার মতো।

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রভূত; কিন্তু তিনি যে আশার আলো আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়াছেন তাহা অমূল্য। তিনি জাতিসমাজে আমাদের মুখ দেখাইবার পথ করিয়াছেন।

আমরা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কাগজে তদুপযুক্ত স্থান নাই, তদ্ভিন্ন সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বড় কঠিন। তাঁহার কার্যের, চরিত্রের ঠিক বিচারক এবং গুণগ্রাহী আমরা হইতে পারি না। যেমন চিত্র বিশেষের সৌন্দর্য অনুধাবন করিতে হইলে, উহা হইতে কিছু দূরে যাইতে হয়, তেমনি কীর্তিমানের কীর্তি ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক স্থলেই সময়ের দূরত্বের প্রয়োজন হয়।

আব এক কথা—

History is half dream --ay even
The man's life in the letters of the man.

সুতরাং প্রকৃত জীবনচরিত লেখা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুর জীবনের কয়েকটি স্থূলস্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র। কিন্তু একশ্চন্দ্রতমোহন্তি। তাঁহার ভগিনীগণ সকলেই সুশিক্ষিতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাসমাপনার্থ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভারতীয় সরকারি চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মায়া কাটাইতে না পারিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন এবং তথায় সুবিখ্যাত ক্যাবেন্ডিস গবেষণাগারে বিজ্ঞান অনুশীলন করেন। তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজের বি. এ. এবং লন্ডনের বি. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগত মহাত্মা ফসেট্ সাহেবের প্রীতিলাভ সমর্থ হন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ি। তিনি যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, তখন হইতেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে বিলক্ষণ নিপুণ হস্ত ছিলেন। সাধারণের মনোরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনে তিনি বরাবরই সিদ্ধহস্ত বলিয়া পরিচিত। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর একটি দোষ এই যে, ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোনো সুযোগ নাই। এই দোষ দূর করিবার জন্য বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ আছে।

তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসায় যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন

তিনি বউবাজার স্ট্রিটে থাকিতেন। সেখানে আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার্য দ্রব্যের আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানাবিষয়ক বন্ধুভাবে অমায়িকতার সহিত কথোপকথন করেন, এবং রাস্কিন প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখা কিছু কিছু পড়িয়া শুনান। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বোধ হয়, নিমন্ত্রিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মিষ্টান্নের গুণ গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের অধ্যাপক যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার মর্ম আমরা কতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। আমার দুর্ভাগ্য এই যে তাঁহার বিজ্ঞানোৎসাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই।

বসু মহাশয় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আগমন করেন, তখন উহাতে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাদি সামান্য রূপই ছিল। ইঁহারই যত্নে ক্রমে-ক্রমে অনেক উৎকৃষ্ট যন্ত্র ক্রীত হওয়ায় এখন তথায় পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা সম্ভবপর হইয়াছে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে জগদীশবাবু তাড়িত বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ওই বৎসর মে মাসে "On the Polarisation of the Electric Ray" সম্বন্ধে তাহার একটি সন্দর্ভ বঙ্গদেশীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতে শীঘ্রই এই সকল গবেষণার প্রতি পণ্ডিতবর্গের নজর পড়ে। বর্তমান যুগের প্রধান তাড়িত তত্ত্বজ্ঞ লর্ড কেলবিন আপনাকে literally filled with wonder and admiration for so much success in this diffcult and novel experimental problems বলিয়া প্রকাশ করেন। লন্ডনের টাইম্‌স্‌ পত্র বলেন ঃ

The originality of the achievements is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. He had to construct for himself his instruments as he went along. His paper forms the outcome of the two fold line of labour—construction and research.

বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেলি কর্তৃক রয়্যাল সোসাইটিতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত সমিতির কার্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয় ছিল "The Determination of the Indices of Refraction for the Electric Ray." এই সকল গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রয়্যাল সোসাইটি পার্লামেন্ট প্রদত্ত একটি ফন্ড হইতে বসু মহাশয়কে তাঁহার কার্য সৌকযার্থ কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন। বাঙলা গভর্নমেন্ট এই সকল গবেষণার সাহায্যার্থ একটি গবেষণা ফন্ড স্থাপিত করিয়া বসু মহাশয়কে তাহার অধ্যক্ষ করেন। তৎপরে ভারত গভর্নমেন্টের সুপারিশে সেক্রেটারি অব স্টেট এতদ্দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনার্থ জগদীশ বসুকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করেন।

ইংল্যান্ডে উপস্থিত হইয়া জগদীশ বসু ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের" গুণাবলী নির্ণয়ার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র সম্বন্ধ এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইউরোপের প্রধান-প্রধান পদার্থবিদগণ তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধটি এরূপ আগ্রহের সহিত শুনিয়াছিলেন যে অধিবেশন স্থগিত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও

তাঁহারা তাঁহাকে পাঠ করিয়া যাইতে নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার যন্ত্রের ক্রিয়ার যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লর্ড কেলবিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঘন-ঘন করতালি দিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

গ্লাসগো নগরে লর্ড কেলবিন অতিশয় হৃদ্যতা ও আদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ভিন্ন-ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আদরের সহিত গৃহীত হন। বিলাতে থাকিতে-থাকিতে তিনি আর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি এতদ্বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠ করেন। প্রবন্ধটির বিষয় "The selective conductivity exhibited by certain Polarizing substances."

ইহার পর তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউসনে শুক্র বাৎসরিক সান্ধ্য বক্তৃতা করিতে আহূত হন। যেখানে ডেবি, ফারাডে, এবং টিন্ড্যাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেখানে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক পদার্থবিদ্যায় অতি দুরূহ একটি বিষয়ে সমবেত ইউরোপীয় প্রধান-প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন ইহাকে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে।

সোসাইটি অব আর্টস্ নামক সমিতির এক অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপিত করেন ঃ— বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পঠিতব্য বিষয়ের সংখ্যা হ্রাস। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উচ্চতর বিষয়ের অনুশীলনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণের জন্য বৃত্তি স্থাপন, এবং সরকারি নানাবিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতবাসীগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শক্তির প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়াগুলি উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ীর রাসায়নিক গবেষণারও উল্লেখ করেন।

উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন ঃ

I have not yet said anything of the intellectual hunger that has been created by spread of education, a hunger which is as imperative as that of the physical body. The spectator in a recent article, has well remarked that an educated man in my country wants something absorbing to think about. His intellect is at present left to consume itself, there being no vent for his useless energies. If it could be done he would betake himself "ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature, which can never end yet is always yielding reselts, upon which yet deeper inquiries can be based." We have been called a nation of dreamers. There is a necessity for dreamers to think out the great problems of life and make the world richer by their thoughts. But there is room for workers, too, toilers who by incessant work would increase the bounds of human knowledge. We want to have our share in this work. Our ancestors did at one time contribute to enrich the stock of the world's knowledge, but that is so long past, that it is almost forgotten now. It would perhaps not be an unworthy work for

England to help us to take our place again among the intellectual nations of the world."

বিলাতী প্রধান-প্রধান সংবাদপত্রে তাঁহার প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হয়। লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলবিন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতীয় সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহ স্থাপনার্থ এক আবেদন করেন। সেক্রেটারি অব স্টেটের সহিত অধ্যাপক বসুর যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি সেক্রেটারি মহোদয়কে বলেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার বিস্তর উন্নতি হইতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক জীবনধারণার্থ কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে।

কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে; অথচ বৃষ্টির পরিমাণ অনিশ্চিত। অপরদিকে অনেক ভারতবর্ষীয় যুবক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করিলে কোনো কার্য না পাইলে আলস্যে কালযাপন করে। নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি হইলে ইহারাও কাজ পাইবে এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসীকেও কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

জার্মানিতে অধ্যাপক বসুর বিলক্ষণ আদর-অভ্যর্থনা হইয়াছিল। কিল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উহার সদস্যগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। বার্লিন নগরে তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক শ্রোতার সমক্ষে বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি হল্ ও হাইডেলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ফ্রান্সেও তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক পরিষদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির বৃত্তান্ত ফ্রান্সের প্রধান বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সভ্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন এবং তৎকৃত কার্যের সমুচিত প্রশংসা করেন।

বসু মহাশয় যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অনেক দুরূহ তত্ত্বের অনুসন্ধান হইতে পারিবে। ফরাসিদেশে এবং আমেরিকায় মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই যন্ত্র বিবিধ নূতন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্যও যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে এসম্বন্ধে দুইবৎসর পূর্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ Electrician পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। Electrical Engineer-ও এই যন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

It is worth remarking that no secret was at any time made as to its consturction, so that it has been open to all the world to adopt it for practical and possibly money making purposes.

ইম্পিরিয়েল ইনস্টিটিউসনে জগদীশবাবু যে বক্তৃতা করেন তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার হেনরি রস্কো বলেন ঃ

I am sure I express the feelings of all present when I say that we have been listening to one of the most remarkable and interesting teachers that we had ever heard....I am sure you cannot have listened to what he has said without feeling that the work which he has done has been of the highest order and it shows that Eastern people are equally capable of making great scientific discoveries and of becoming great experimentalists as those who live in the West. Really, if our rulers understood the trend of thoughts

and actions in the future they would be rather more willing to place funds at the disposal of men like Dr. Bose for the purpose of rendering service to Science and therefore rendering service to their country.

লর্ড রে বলেন ঃ

I am quite sure that we shall envy the students of the Presidency College at Calcutta in having a professor who can explain with such extraordinary lucidity of the most complicated problems of physical science.

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহাকে ডি. এস্. সি. উপাধি দিয়াছেন।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত Spectator পত্রে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হয়। আমরা তাহার কোনো কোনো স্থল উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"There is, however, to our thinking something of rare interest in the spectacle then presented of a Bengalee of the purest descent possibly lecturing in London to an audience of appreciative European Savants upon one of the most recondite branches of the most modern of the Physical Sciences. It suggests at last the possibility that we may one day see an invaluable addition to the great army of those who are trying by acute observation and patient experiment to wring from nature some of her most jealously guarded secrets."

এস্থলে বলা আবশ্যক যে বিলাতের Spectator ভারতবাসীদিগকে এতকাল অসূয়ার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। উক্ত পত্রের পূর্বমতের এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতবাসীর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে এখন লিখিয়াছেন ঃ

"He has justly burning imagination which could extort truth out of a man of apparently disconnected facts a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers and a power of persistence—which is something a little different from patience—such as hardly belonged to any European. We do not know Professor Bose, but if he is like the thoughtful among his countrymen, as of course he must be, we venture to say, that if he cought with his scientific imagination a glimpse of a wonder working 'ray' as yet unknown to man but always penetrating either, and believed that experiment would reveal its properties and potentialities, he would go on experimenting ceaselessly through a long life, and dying hand on his task to some successor, be it son or be it disciple. Just think what kind of addition to the means of investigations would be made by the arrival within the sphere of inquiry of men with the Sunnyasee mind, the mind which utterly controls

the body and can meditate or inquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment telling it to be obscured by any terrestrial temptatioin. We can see no reason whatever why such a mind, turning from absorption in insoluble problems should not betake itself ardently, thirstily, hungrily, to the research into Nature, upon which yet deeper inquiry can be based. If that happened—and Professor Bose is at all events a living evidence that it can happen, that we are not imagining an impossibility—that would be the greatest addition ever made to the sum of the mental force of mankind."

জগদীশবাবু বালক বালিকাগণের শিক্ষাকার্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য "মুকুল" নামক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। অল্পদিন হইল তিনি এক পত্রে "মুকুলের" উন্নতি কল্পে আমায় কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইংল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় একটি বাংলা প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে ফসেট্ পরিবারে তিনি যে আদর ও প্রীতি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। তাহার পর আমি যখন "দাসী"র সম্পাদক ছিলাম তৎকালে উক্ত পত্রিকায় তিনি 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" একটি ও 'কলুঙ্গীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'সাহিত্য' সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে", একটি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।" এই প্রবন্ধের একটি স্থান এখনও আমার মনে আছে। তাহা এই ঃ

"সেই দুইদিন বহু বন ও গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষার ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিতেছিল। কল্লোলিনীর মৃদুগীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল। নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে-স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রিয়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি একবার আলমোরা হইতে যে তুষার নদী দেখিতে যান ইহা তাহারই বর্ণনা। ইহার পর তিনি "সাহিত্যে" "আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ" শীর্ষক একটি এবং 'মুকুলে' "গাছেরা কি বলে" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখেন। সকলগুলিরই ভাষা মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও কবিত্বপূর্ণ। বাস্তবিক কবির কল্পনা ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সচরাচর লোকে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের মনে করিয়া থাকে, তাহা নয়। কী সৌন্দর্য রচনা, কী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার উভয়েই কল্পনার প্রয়োজন। কল্পনা ব্যতিরেকে নূতন কিছু গঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না। জগদীশ বসুর মুখচ্ছবিও কবিরই মতো। শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের মতো নয়। তাঁহার বাংলা সাহিত্যের অনুরাগের কথা বলিলাম। ইহা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন হইবে না যে তিনি বাংলা

ভাষায় কথা কহেন; কারণ, যাঁহারা কখনও জাহাজে উঠেন নাই, এরূপ অনেক ইংরাজি শিক্ষাভিমানী এখনও বাংলা লিখন, পঠন এবং উক্ত ভাষায় পত্রালাপ, এমন কী কথোপকথন পর্যন্ত লজ্জাকর, অত্যন্ত সঙ্কোচের কারণ, মনে করেন। অন্যান্য বিষয়েও জগদীশ বসুর সাহেবি-আনা কম; কিন্তু ইংরাজসুলভ সদ্‌গুণের অভাব নাই।

জগদীশবাবু গৃহে ধুতি পরেন ঃ কলেজে ইংরাজের পোশাক পরিয়া আসেন না; হ্যাট পরেন না। হ্যাটটি হজমিগুলি বিশেষ। ইহা দ্বারা বিশেষত রেলের গাড়িতে, জাতি, জন্ম, বর্ণ, শিক্ষা ও পদনত অনেক 'খুঁত' ঢাকিয়া যায়। শুনিয়াছি কোনো কোনো ব্যবসায়ে ও চাকুরিতে ইহা না পরিলে চলে না। অতএব হ্যাটের অগৌরব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল জগদীশবাবুর পোশাক বিষয়ক রুচির কথা বলিতেছি।

জগদীশবাবু সৌন্দর্য্যানুরাগী। এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। তাঁহার বাড়িতে আমি একবার টেনিসনের 'নির্ঝরিণী' কবিতার বর্ণনানুযায়ী কতকগুলি চিত্র দেখিয়াছিলাম। আমার যতদুর মনে পড়ে সেগুলি তিনি কাশ্মীর ভ্রমণকালে সৌসাদৃশ্য হইতে ফটোগ্রাফ করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার বন্ধন তিনি সর্বদাই স্বীকার করেন। অপর লোকের সহিত ব্যবহারেও তিনি অমায়িক ও নম্র প্রকৃতি। আমি তাঁহাকে 'প্রদীপে' লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই মর্মে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন—"আমি তোমার কাগজে লিখিতে পারিলে বাস্তবিকই সুখি হইতাম কিন্তু নানাকার্যে জড়িত হইয়া আমি এখন অনেক সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে কার্যে বৃত হইয়াছি, তাহার কূল-কিনারা দেখিতে পাই না—অনেক সময়েই কেবল অন্ধকারে ঘুরিতে হয়। বহু ব্যর্থ প্রযত্নের পর কদাচ অভীষ্টের সাক্ষাৎ পাই।"

জগদানন্দ রায়

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ বিদেশের বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য বৎসরাধিককাল ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ হইল তিনি নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবিষ্কারের বিবরণ প্রচারের জন্যই ইহাই তাঁহার প্রথম বিদেশ যাত্রা নয়, আরও তিনবার তাঁহাকে এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিদেশে বহির্গত হইতে হইয়াছিল।

নির্জীব ধাতুপিণ্ড আঘাতে উত্তেজনা পাইলে সজীব প্রাণীর ন্যায় সুখ-দুঃখ প্রকাশ করার মতো সাড়া দেয়, ইহাই প্রচার করা বসু মহাশয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিষয় ছিল। ইহা পনেরো ষোলো বৎসর পূর্বেকার কথা। জগদীশচন্দ্র ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায় নীরবে যে সাধনা করিতেছেন তাহার ইতিহাস যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহাদের কাছে ষোলো বৎসর পূর্বেকার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞান পরিষদ তখন তাঁহার পরীক্ষাগুলি দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি খাপ খায় না। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংবাদপত্রে ও বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে তখন জগদীশচন্দ্রের কথাই প্রকাশ হইত এবং তিনি এক পৃথিবীব্যাপী বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মাদক দ্রব্য প্রয়োগে প্রাণী উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে এবং বিষে মরিয়া যায়, ইহা আমাদের জানা কথা। বিদ্যুতের সাহায্যে প্রাণীর এই সকল অবস্থার কথা শারীরবিদগণ প্রাণীদের দিয়াই লিখাইয়া লইতে পারেন কিন্তু মাদকদ্রব্য প্রয়োগ করিলে যে ধাতুপিণ্ডও উত্তেজনা প্রকাশ করে এবং বিষে জর্জরিত হইয়া মরিয়া যায়,—ইহা কাহারো জানা ছিল না। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে ইহা জানিয়াই সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে জগদীশচন্দ্র আরও দুইবার বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয় তাঁহার অনেক আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইয়াছিল। উদ্ভিদের যে সকল জীবন ক্রিয়ার ব্যাখ্যান আধুনিক বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও দিতে পারেন নাই, বসু মহাশয় সেইগুলিরই অতি সহজ ব্যাখ্যান দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বক্তৃতা করিয়া ব্যাখ্যান দেন নাই, নিজের পরিকল্পিত অতি সুন্দর-সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক উক্তির প্রমাণ দেখাইয়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাতে উদ্ভিদতত্ত্বের অনেক রহস্যের মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

এবারেও উদ্ভিদের জীবন ক্রিয়ার আরও নূতন-নূতন তত্ত্বপ্রচারের জন্য জগদীশচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রাণীজীবনের যে সকল কার্য কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া জীবতত্ত্ববিদগণ এতকাল মানিয়া আসিতেছিলেন তাহা উদ্ভিদের জীবনেও দেখা যায়, ইহাও প্রমাণিত করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভিয়েনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সিকাগো, কলম্বিয়া

এবং টোকিয়ো প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদ সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আবিষ্কারের বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া সহজে কেহই নূতনকে গ্রহণ করিতে চায় না। যাহারা বিজ্ঞানের সত্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদেরও মধ্যে এই প্রকারের গোঁড়ামি বিরল নয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি উদ্ভিদতত্ত্ব ও শারীর তত্ত্বের প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরোধী; কাজেই যে সকল প্রবীণ বৈজ্ঞানিক প্রাচীন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নূতনের দিকে টানিয়া আনা সহজ কাজ ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এবারে এই দুঃসাধ্য সাধনেও কৃতকার্য হইয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে শত শত পরীক্ষা দেখাইয়া তিনি যে সকল সত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, প্রবীণ বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। জড় ও জীবের দুই বৃহৎ রাজ্যের মাঝামাঝি যে স্থানটি চির-রহস্যের ছিল আমাদের স্বদেশবাসী জগদীশচন্দ্রই যে তাহাতে নূতন আলোকপাত করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের সকল বৈজ্ঞানিকই তাহা এখন স্বীকার করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মভূমি ইউরোপকে এখানে ভারতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এখন বিদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বলিতেছেন, ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিকে এ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছেন, কাজেই তাহার সুন্দর পূর্ণ মূর্তিখানি কাহারও নজরে পড়ে নাই। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রই প্রকৃতিকে দৃষ্টির সীমার মধ্যে আনিয়া তাহার পূর্ণমূর্তি দেখাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

আমন্ত্রিত হইয়া জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাসমিতিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি ম্যাকোলিয়োর মাগাজিন (Mc Clure magazine) নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে বসু মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা পাঠকের নিকটে তাহারই মর্ম উপস্থিত করিতেছি। প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক জগদীশচন্দ্রের নূতন ও পুরাতন আবিষ্কারের অনেক কথাই অবগত আছেন। লেখক সেই সকল কথাকেই সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ইংরাজি প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

উপাধি গ্রহণ করিয়া জগদীশচন্দ্র যখন অক্সফোর্ড বিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তখন জড়বিজ্ঞানের অবস্থা এখনকার মতো ছিল না। তারহীন টেলিগ্রাফ তখন উদ্ভাবিত হয় নাই। ঈথরের তরঙ্গই যে বিদ্যুৎ তাপ এবং আলোক উৎপাদন করে, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাহা কাগজ কলমে প্রমাণিত করিয়া তখন পরলোকগত। কেবল জার্মান পণ্ডিত হার্জ সাহেবই সেই সময়ে ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়া পরীক্ষা করিতে ছিলেন। হার্জ সাহেবের এই পরীক্ষাগুলি জ্ঞানপিপাসু জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

হার্জ সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুতের তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন করা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পরিচয় আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই ইহার পরিচয় লইতে হইলে কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব এই কথা শুনিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাই তখন কোহেয়োর (Coherer) নামে খ্যাত হইয়াছে। কাচের নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণ যন্ত্রটির প্রধান উপাদান। বিদ্যুতের অদৃশ্য তরঙ্গ ঈথরে উৎপন্ন হইয়া ধাতুচূর্ণে আসিয়া ঠেকিলে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহণ শক্তি কমিয়া আসিত এবং ইহা দেখিয়াই অদৃশ্য বিদ্যুৎ

তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝা যাইত। কিন্তু যন্ত্রটিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার পরে ধাতুচূর্ণগুলিকে ঝাঁকাইয়া না দিলে ফলিত না। যে ধাতুচূর্ণে একবার তরঙ্গের স্পর্শ লাগিয়াছে ওই প্রকারে ঝাঁকাইয়া না দিলে তাহা আর বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাড়া দিত না। যাহা হউক, লজ সাহেবের এই যন্ত্রে বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ তরঙ্গের পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং এই অদৃশ্য তরঙ্গের চালনা করিয়া সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু নলে আবদ্ধ ধাতুচূর্ণের পরিচালন শক্তি যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পর্শে পরিবর্তিত হয় এবং কেনই বা তাহাতে ঝাঁকুনি না দিলে কাজ চলে না এসব প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থাকিয়া গেল। আমাদের জগদীশচন্দ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম গবেষণা।

কোন্ সূত্রে কোন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার হিসাবপত্র করিয়া তত্ত্বান্বেষীরা চলেন না। পূর্বোক্ত যে বিষয়টি লইয়া জগদীশচন্দ্র প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই যে জীবের জীবত্বের ও জড়ের জড়ত্বের মূল কথা বলিয়া দিবে, তাহা তিনিও সেই সময়ে ক্ষণকালের জন্য মনে করিতে পারেন নাই। যাহা হউক বিদ্যুৎ তরঙ্গের স্পর্শে লৌহচূর্ণ কেন বিদ্যুৎ পরিচালনার ধর্ম হারায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন পুনঃপুনঃ সঞ্চালনে অসাড় হইয়া যায়, বিদ্যুৎ তরঙ্গের বারবার আঘাতে লৌহচূর্ণও সেই প্রকারে অসাড় হইয়া পড়ে। তাই তাহার ভিতর দিয়া তখন বিদ্যুৎ পরিচালনা হয় না। আবার কাজ পাইতে হইলে, সেই অসাড় ধাতুচূর্ণকে ঝাঁকুনি দিয়া উত্তেজিত করিতে হয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজের এই আবিষ্কারে নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানা জড় পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ আঘাতে উত্তেজনা দিলে কি ফল হয়, তাহা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাণী দেহের যে সকল ক্রিয়া চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়া বা স্পর্শ করিয়া বুঝা যায় না, প্রাণীতত্ত্ববিদগণ তাহা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা বুঝিতে পারেন। জগদীশচন্দ্র ওই প্রকারে বিদ্যুতের সাহায্য লইয়া জড়ের নানা অবস্থা পরীক্ষা করিতে শুরু করিয়াছিলেন। সজীব প্রাণীর পেশি বা স্নায়ু উত্তেজিত করিলে উত্তেজনা প্রাপ্ত অংশে অতি মৃদু বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়; খুব ভালো তড়িৎবীক্ষণযন্ত্রে সেই বিদ্যুৎ ধরা পড়ে। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহে অবিরাম আঘাত দিলেও তাহাকে বিদ্যুৎ জন্মে না। ধাতু লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, সজীব প্রাণীর ন্যায় ধাতুও আঘাতের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; তাহারও জীবনমরণ, স্ফূর্তি ও ক্লান্তি আছে। কেবল তাহাই নয়, প্রাণীর পেশি যেমন ঠান্ডা পাইলে নিস্তেজ হয়, বিষে মৃতপ্রায় হয় এবং ঔষধে পুনর্জীবিত হয়, ধাতুপিণ্ডেও ওই সকল প্রক্রিয়ায় অবিকল একই ফল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সজীব মাংসপেশিতে চিমটি কাটিলে তাহা বেদনায় উত্তেজিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। ধাতুপিণ্ডে চিমটি কাটিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক সেই প্রকার বেদনা জ্ঞাপক বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়াছিলেন। মাংসপেশীতে পুনঃপুনঃ আঘাত দিলে তাহা অসাড় হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ দিলে তাহাতেই সাড়া দিবার শক্তি আবার ফিরিয়া আসে। অবিরাম আঘাত দিয়া জগদীশচন্দ্র ধাতুপিণ্ডেও ঠিক ওই প্রকার অসাড়তা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়া তাহাকেই আবার সসাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আঘাতে সাড়া দেওয়াই জীবের জীবত্ব বলিয়া যে একটি সংস্কার স্মরণাতীত কাল হইতে বদ্ধমূল ছিল, বসু মহাশয়ের আবিষ্কারে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিলেন, অজৈব পদার্থ মাত্রই মৃত নয়।

এই আবিষ্কারের বিবরণ রয়াল সোসাইটি প্রভৃতি বিজ্ঞান সভায় প্রচারিত হইলে বৈজ্ঞানিকগণ জগদীশচন্দ্রকে কি প্রকারে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বেই তাহার আভাষ দিয়াছি। আর কোনো গবেষণায় হাত না দিয়া তিনি যদি এইখানে সকল গবেষণা হইতে বিরত হইতেন তাহা হইলে পূর্বোক্ত আবিষ্কারই জগদীশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। কিন্তু সম্মানলাভ তাঁহার গবেষণার লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতির কার্যের মূল রহস্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র সৃষ্টির সহিত পরিচয় লাভ করাই তাঁহার জীবনের সাধনা করিয়াছিল। কাজেই এত সম্মান, এত সাধুবাদ তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ধাতুর সহিত সাধারণ সজীব বস্তুর যখন এত নিকট সম্বন্ধ, তখন সাবধানে পরীক্ষা করিতে পারিলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের কার্যে নিশ্চয়ই অনেক মিল দেখা যাইবে।

উদ্ভিদের জীবনের কার্য পরীক্ষা করিবার জন্য এ পর্যন্ত জীবতত্ত্ববিদগণ অনেক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল জগদীশচন্দ্রের নিকট এত স্থূল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে তিনি নিজেই মনের মতো যন্ত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে অনেক যন্ত্র প্রস্তুত হইল। এগুলি এত কার্যোপযোগী হইল যে শীত গ্রীষ্মে বা আঘাতের উত্তেজনায় দৈহিক অবস্থার যে অতি সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহাও উদ্ভিদগণ যন্ত্রের লেখনীর সাহায্যে যন্ত্রসংলগ্ন লিপিফলকে লিখিয়া জানাইতে লাগিল। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, কেবল জীবনমৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থূল ব্যাপারেই যে প্রাণী ও উদ্ভিদের একতা আছে তাহা নয়; প্রাণীর জীবনের কার্যে যে সকল খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখা যায়, সেগুলি উদ্ভিদেও ধরা পড়ে।

চিমটি কাটিলে বা আঘাত দিলে প্রাণীর দেহে বেদনার সঞ্চার হয় এবং তাহার লক্ষণ দেহের আকুঞ্চনে বা বিদ্যুৎ প্রবাহে প্রকাশ পায়। তাহা ফুলকপির ডাঁটায় চিমটি কাটিয়া জগদীশন্দ্র অবিকল সেই প্রকার বেদনাজ্ঞাপক লক্ষণ তাঁহার যন্ত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তা ছাড়া বিষ, মাদকদ্রব্য, অবসাদক ও উত্তেজক বস্তু প্রাণীদেহে যে প্রকার ক্রিয়া করে, উদ্ভিদদেহেও যে অবিকল তাহাই করে জগদীশচন্দ্র ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। পরীক্ষাকালে উদ্ভিদগণ যন্ত্রের লেখনী দিয়া দৈহিক অবস্থার কথা নিজেরাই লিখিয়া দেখাইয়াছিল।

শ্রমসাধ্য কাজ বারবার করিতে থাকিলে খুব বলশালী প্রাণীও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। বিশ্রামে অবসাদ দূর হইলে, আবার সে শ্রম করিতে পারে। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদকেও ওই প্রকারে পরিশ্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্রামের অবকাশ্ব দিয়া তাহাকে কার্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে ঘোড়া গাড়ি টানিতে গিয়া বেশি লাফালাফি করে, সে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হয়; কাজেই তাহার বিশ্রামেরও শীঘ্র প্রয়োজন হয়। লজ্জাবতী গাছে বসু মহাশয় ওই প্রকার উত্তেজনাশীল প্রাণীর সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সামান্য উত্তেজনায় লজ্জাবতী অধিক সাড়া দিয়া শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অন্তত পনেরো মিনিটকাল বিশ্রামের অবকাশ না দিলে সে পূর্বের স্ফূর্তি ফিরিয়া পায় না।

দেহে আঘাত দিলে আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণীরা বেদনা বুঝিতে পারে না। আঘাত-

প্রাপ্তি ও বেদনা-অনুভূতির মধ্যে এক একটু সময়ের ব্যবধান থাকে। উদ্ভিদেও আঘাত-প্রাপ্তি ও বেদনা অনুভূতির মধ্যে যে একটু অবকাশ আছে তাহাও জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। এমন সূক্ষ্ম সময় পরিমাপক যন্ত্র এ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকই উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

মদ খাইয়া মানুষ যখন মাতাল হয়, তখন তাহার চালচলন কী প্রকার অদ্ভুত হইয়া দাঁড়ায় তাহা কখনও কখনও পথে ঘাটে দেখা যায়। জগদীশচন্দ্র কিছুকাল আলকোহল বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া লজ্জাবতী লতাকে উন্মত্ত করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে একে একে মাতালের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। গাছের হাত পা নাই, বাকশক্তিও নাই; কাজেই লজ্জাবতী ওই অবস্থায় মাতালের মতো টলিতে পারে নাই বা উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাসিকান্না দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু যন্ত্রে সে নিজে যে সকল সাড়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই মাতালের সকল উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ একে-একে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠান্ডা ও নির্মল বাতাসের সংস্পর্শে মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়। আলকোহলের বাষ্পপ্রয়োগ বন্ধ কবিয়া লজ্জাবতীকে নির্মল বাতাসে রাখা হইয়াছিল; ইহাতে সে কিছুকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবল মাদকদ্রব্য নয়, যে দ্রব্য প্রাণীদেহে যে ক্রিয়াটি দেখায় উদ্ভিদ্দেহে প্রয়োগ করায় বসু মহাশয় অবিকল সেই ক্রিয়াই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত জীবতত্ত্ববিদগণ প্রাণী ও উদ্ভিদকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় জীব বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের জীবনের কার্যের মধ্যে যে কোনো ঐক্য আছে তাহা ইহাদের মধ্যে কেহই স্বীকার করিতেন না। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের এই সকল আবিষ্কারে এখন পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্যে কোনো পার্থক্যই নাই; বিধাতা উভয়কেই একই গুণবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সেই আদিম গুণগুলিই বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের মোহ উৎপাদন করিতেছে।

এগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের কথা। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যে কতটা লাগিবে, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই হিসাবেও আবিষ্কারগুলির মূল্য কম নয়। চিকিৎসার জন্য ঔষধ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কাজ। কোনো পদার্থের রোগ নাশ করিবার শক্তি জানা গেলেও, তাহা মানুষের ওপরে হঠাৎ প্রয়োগ করা যায় না। কাজেই অনেক নিরীহ প্রাণীর উপর দিয়া নূতন ঔষধাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হয়। মানুষের সুবিধার জন্য এই প্রকারে আজকাল যে কত প্রাণীহত্যা করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন উদ্ভিদের ওপরে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের গুণাগুণ বিচার করা চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

জার্মানির প্রধান উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পেফার (Pfeffer) এবং হাবেরলান্ড (Haberlandt) সাহেব নানা পরীক্ষায় লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদেও স্নায়ুমণ্ডলীর অস্তিত্ব ধরিতে পারেন নাই। ইহারা লজ্জাবতীকে ক্লোরোফর্মের বাষ্পে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার ডাঁটা পুড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি লজ্জাবতী সাড়া দিতে ছাড়ে নাই। ইহা দেখিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে লজ্জাবতীর দেহে স্নায়ুমণ্ডলী নাই; থাকিলে তাহার কার্য ক্লোরোফরমের স্পর্শে ও তাপে লোপ পাইয়া যাইত এবং সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জাবতীর সাড়া দেওয়া বন্ধ হইত। আগুনে পোড়া শাখার ভিতর দিয়া উত্তেজনায় চলা ফেরার কারণ দেখাইতে গিয়া ইঁহারা বলিয়াছিলেন,

জলপূর্ণ রবারের নলের একপ্রান্তে চাপ দিলে তাহারা তাহাতে যেমন সেই চাপ নলের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছায়, লজ্জাবতীর দেহের উত্তেজনা ঠিক তেমনি করিয়া তাহার ভিতরকার জলের সাহায্যে দগ্ধ শাখার ভিতর দিয়াও চলে।

পেফার ও হাবেরলান্ডের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া জগদীশচন্দ্র যেসকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক। তিনি একটি লজ্জাবতী গাছকে চারা অবস্থা হইতে সাবধানে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহাতে সেটি শীঘ্র-শীঘ্র বাড়িয়া পুষ্টাঙ্গ হয় তাহার জন্য যখন যে ব্যবস্থা প্রয়োজন তখনই তাহা করা হইত এবং যাহাতে উহার পাতায় বা ডালে কোনো প্রকার আঘাত না লাগে তাহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা হইত। হাত-পা বাঁধিয়া যদি কোনো লোককে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে লোকটির দেহ বেশ পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া যায়। সযত্নে পালিত লজ্জাবতী গাছটির অবস্থাও কতকটা সেই রকমই হইয়াছিল; দেখিলে গাছটিকে খুবই সুস্থ বলিয়া মনে হইত, কিন্তু মৃদু আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারিত না। ইহা দেখাইয়া তিনি লজ্জাবতীর স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। জলই যদি উত্তেজনার বাহক হইত তবে এই পরীক্ষায় গাছে সাড়ার অভাব হইত না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, দেহস্থ জলের চাপ উত্তেজনার বাহক নয়। লজ্জাবতীর দেহে প্রাণীদেহের ন্যায় স্নায়ুজাল বিস্তৃত আছে, তাহাই অনভ্যাসে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই লজ্জাবতী সাড়া দেয় নাই।

ব্যবহারের অভাবে স্নায়ুমণ্ডলী বিকল হইলে যাহার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে জোর করিয়া কিছুদিন চলাফেরা করাইলে স্নায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে; তখন সে সুস্থ ব্যক্তিরই ন্যায় হাত-পা নাড়িতে চায়। পূর্বোক্ত অসাড় লজ্জাবতীর দেহে উপর্যুপরি আঘাত দিয়া এবং সর্বাঙ্গে সেঁক দিয়া জগদীশচন্দ্র তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় সে সুস্থ গাছের মতোই সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

স্নায়বিক শক্তি সকল প্রাণীর সমান নয়। মানুষের মধ্যেই ইহার অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন লোক আছেন, যাঁহারা স্লেটের উপরে পেনসিল ঘষার শব্দ সহ্য করিতে পারেন না। বালি দিয়া বাসন মাজার সময়ে যে শব্দ হয় তাহাও অনেকের স্নায়ুমণ্ডলীকে পীড়া দেয়। উদ্ভিদ জাতির মধ্যে জগদীশচন্দ্র স্নায়বিক শক্তির এই বৈচিত্র্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কতকগুলি গাছ খুব উত্তেজনার মধ্যেও তাহাদের স্নায়ুকে সবল রাখিতে পারে; আবার কতকগুলি দুর্বল মানুষের ন্যায় অল্প উত্তেজনাতেই অধীর হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই ঐক্য সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ বৃক্ষকে স্নায়ুবর্জ্জিত মনে করিয়া যে সত্যই ভুল করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পণ্ডিতমণ্ডলী তাহা স্বীকার করিতেছেন।

গাছের ডাল পোড়াইলে এবং তাহার গায়ে ক্লোরোফর্মের বাষ্প লাগাইলেও শাখা দিয়া যে *উত্তেজনার চলাচল লক্ষ্য করা হইয়াছিল তাহা স্নায়বিক উত্তেজনারই ফল। উদ্ভিদের স্নায়ুজাল দেহের গভীর প্রদেশে বিস্তৃত থাকে, তাই বাহিরে প্রযুক্ত তাপাদি সহসা ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

স্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে একটু সময় লয়। মানবদেহের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রতি সেকেন্ডে একশত দশ ফুট করিয়া চলে। কতকগুলি নিম্নশ্রেণির প্রাণীর স্নায়ু

এমন অপূর্ণ যে কোনো উত্তেজনাকে তাহা সেকেন্ডে দুই ইঞ্চির অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারে না। উদ্ভিদের স্নায়ু থাকিলে তাহার উত্তেজনা-পরিবহণের নির্দিষ্ট বেগ থাকারও সম্ভাবনা। জগদীশচন্দ্র নানা জাতীয় উদ্ভিদের স্নায়বিক বেগও আবিষ্কার করিয়াছেন। সতেজ লজ্জাবতী লতার স্নায়ু সেকেন্ডে চৌদ্দ ইঞ্চি বেগে উত্তেজনা বহন করিতে পারে। গাছ যখন পরিশ্রান্ত হইয়া দুর্বল থাকে তখন এই বেগের পরিমাণ কমিয়া আসে, বিশ্রাম লাভ করিলে সেই বেগই বৃদ্ধি পায়। অনেক নিম্নশ্রেণির প্রাণীর তুলনায় লজ্জাবতীর স্নায়ু অধিকতর সবল ও কার্যক্ষম।

আমাদের ঘরকন্নার দিক দিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত আবিষ্কার হইতে অনেক উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী কী প্রকারে বিফল হইয়া পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি করে, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই। কাজেই এই সকল ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প। তার উপরে উচ্চশ্রেণির প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী এত জটিল যে, সেই জটিলতা ভেদ করিয়া স্নায়বিক বিকৃতির কারণ নির্ণয় করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উদ্ভিদের স্নায়ুজাল একেবারে জটিলতা বর্জিত। সুতরাং উদ্ভিদের স্নায়ু কী প্রকারে বিকল হয় এবং সেই বিকলতাকে কী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দূর করা যায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। মানবদেহের স্নায়বিক পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী গাছের চিকিৎসার দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া খুবই আশা হইতেছে।

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড একটি অদ্ভুত যন্ত্র। ভ্রূণ অবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার কার্যের বিরাম নাই। ইহাকে চালাইবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইহা তালে-তালে আপনিই চলিয়া প্রাণীর সর্বাঙ্গে নিয়ত রক্তের প্রবাহ বহাইতে থাকে। শারীর বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও হৃদযন্ত্রের অনেক ব্যাপার আজও রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল রহস্যের মীমাংসা করিতে গেলে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের জটিল যন্ত্রকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে চলে না; সরল যন্ত্রের কাজ বুঝিয়া ক্রমে জটিলতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই শুভফল পাওয়া যায়।

প্রাণীর হৃদপিণ্ডের ন্যায় কোনো যন্ত্র যে উদ্ভিদদেহে আছে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা তাহা জানিতেন না। আচার্য জগদীশচন্দ্র "বনচাঁড়াল" গাছে হৃদপিণ্ডের অনুরূপ একটি অংশ আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাহা যে হৃদযন্ত্রের মতোই তালে-তালে চলে তাহা দেখাইয়াছেন। বনচাঁড়ালের পাতার উঠানামার কথা উদ্ভিদবিদগণ জানিতেন। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে কেন এই গাছের পাতা আপনাআপনি নড়াচড়া করে তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। জগদীশচন্দ্র ইহাকে তাঁহার স্বহস্তনির্মিত যন্ত্রে ফেলিয়া এবং তাহার হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া নিজের বৃত্তান্ত নিজেকে দিয়াই লিখাইয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, বনচাঁড়ালের পাতার নৃত্য এবং প্রাণীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন একই ব্যাপার।

হৃদযন্ত্রের উপর ঈথর নামক রাসায়নিক দ্রব্যটির অনেক কাজ দেখা যায়। অল্প ঈথরে যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়; অধিক প্রয়োগ করিলে অবসাদ আসে এবং শেষে ক্রিয়া লোপ পাইয়া যায়। সুস্থ বনচাঁড়ালকে কাচের আবরণের মধ্যে রাখিয়া জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প ঈথর বাষ্প পাত্রে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র উহার পাতা জোরে-জোরে ওঠানামা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে সেরকম জোরে পাতা নাড়িতে পারে নাই।

অধিক ঈথর প্রয়োগে যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমে লোপ পাইতে থাকে, গাছটির পাতার নৃত্য সেই রকমে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

প্রাণীর হৃদযন্ত্রে ক্লোরোফর্মের যে সকল কাজ দেখা যায়—বনচাঁড়ালে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই সকল দেখিতে পাইয়াছেন। বেশি ক্লোরোফর্ম দিবামাত্র পাতার স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল; তারপরে আধঘণ্টাকাল নানা প্রকারে সেবা শুশ্রূষা করায়, তাহাতে মৃদু স্পন্দন শুরু হইয়াছিল।

প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃদযন্ত্র আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসায় যে জীববিজ্ঞানের খুব গৌবব বৃদ্ধি হইয়াছে একথা আমরা মনে করি না। উদ্ভিদের দেহে হৃদযন্ত্রের ন্যায় কোনো অংশে স্বতঃস্পন্দন ধরা পড়ায় প্রাণীর স্বতঃস্পন্দনের যে ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে, তাহাই উল্লেখযোগ্য। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড কেন আপনা হইতে স্পন্দিত হয়, জিজ্ঞাসা করিলে প্রাণীবিদগণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যায়। খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে তাঁহারা বলেন দেহের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যন্ত্র স্বতঃস্পন্দন দেখায়। সেই সঞ্চিত শক্তিই "জীবনী শক্তি"। বলাবাহুল্য, এই ব্যাখানকে কখনই সৎ ব্যাখ্যান বলা যায় না। জগদীশচন্দ্র ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলেন, বাহিরের শক্তি দিয়া যে স্পন্দনকে রুদ্ধ করা যায় এবং চালানো যায়. তাহার মূলে ভিতরকার শক্তির কাজ হইতে পারে না; তাঁহার মতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন বাহিরের শক্তিরই কার্য। বাহিরে শক্তির অভাব নাই,—জল বাতাস আলোক বিদ্যুৎ সকলই শক্তিময়। ঈথর এবং ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি দ্রব্যের শক্তি যেমন বাহির হইতে আসিয়া দেহের ওপবে কার্য দেখায়, সেই প্রকার জলবায়ু ও তাপালোক প্রভৃতির শক্তিও নিয়ত দেহের উপরে পড়িয়া স্বতঃস্পন্দন শুরু করে। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্তটি মোটামুটি এই যে, জীবন ধারণের জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন উদ্ভিদগণ তাহার চেয়ে অনেক অধিক শক্তি বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজেদেব দেহে সঞ্চিত রাখিতে চায় কিন্তু এই প্রকার শক্তিকে সংযত করিয়া রাখার ব্যবস্থা তাহাদের দেহে নাই। কাজেই অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভিদের পাতার ওঠানামা প্রভৃতি স্বতঃস্পন্দনে দেখাইয়া ব্যয় কবে।

উদ্ভিদ কী প্রকারে বৃদ্ধি পায়, ইহাও বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। পুঁথিপত্রে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে মনের খটকা মিটে না। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধিরও ব্যাখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

জগদীশচন্দ্রের নিজের পরিকল্পিত "ক্রেস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্রটি অতি আশ্চর্যজনক। ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কোন গাছ প্রতিদিন কতখানি করিয়া বাড়িল, তাহা সপ্তাহে বা মাসের গড় হিসাব করিয়া আমরা বলিতে পারি। বলাবাহুল্য এই প্রকার হিসাব কখনই সূক্ষ্ম হয় না, একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। পূর্বোক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে গাছ প্রতি সেকেন্ডে কতখানি করিয়া বাড়িতেছে তাহা হাজার লোককে একসঙ্গে দেখানো চলে। সেটি কী প্রকার আশ্চর্যজনক একবার ভাবিয়া দেখুন। কোন্ সার কোন গাছের বৃদ্ধির অনুকূল স্থির করিতে হইলে কৃষিতত্ত্ববিদকে মাসের পর মাস পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বসু মহাশয়ের এই যন্ত্রটির সাহায্যে তাহা কয়েক সেকেন্ডে স্থির হইয়া যায।

বৃদ্ধি রোধ হইলে জীবদেহে ক্ষয়ের শুরু হয় এবং ক্ষয়ের পরিমাণ অধিক হইলে

মৃত্যু দেখা দেয়। ইহাই মৃত্যুর নিয়ম। প্রাণীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। মৃত্যুর পূর্বে তাহার সর্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায় এবং তারপরে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্র নিশ্চল হইয়া আসে। ইহাই প্রাণীর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু উদ্ভিদকে এমন ধীরে ধীরে আসিয়া আক্রমণ করে যে ঠিক কোন সময়ে তাহার মৃত্যু হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। পাতা বা ডালের অবস্থা দেখিয়া মৃত্যু ধরা যায় না। মৃত্যুর পরেও অনেকদিন পর্যন্ত শাখা পল্লবকে তাজা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের মৃত্যু লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহাতে প্রাণীর মৃত্যু জ্ঞাপক প্রত্যেক লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। প্রথমে লজ্জাবতী লতাকে লইয়াই পরীক্ষা চলিয়াছিল। লজ্জাবতীর পাতা যন্ত্রের লেখনীর সহিত সূক্ষ্ম সূতা দিয়া বাঁধা ছিল। পাতা হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া নামিয়া লেখনীর সাহায্যে নিজের অবস্থার কথা নিজেই ঢেউ খেলানো রেখা টানিয়া ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ধারে লজ্জাবতীর গায়ে তাপ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঠান্ডায় গাছে ভালো সাড়া পাওয়া যায় না; কাজেই যখন একটু একটু করিয়া তাপ বাড়ানো হইয়াছিল, তখন লজ্জাবতী বেশ জোরে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনও সে আসন্ন মৃত্যু কথা বুঝিতে পারে নাই। তাপের পরিমাণ ত্রিশ ডিগ্রি হইতে ক্রমে চল্লিশ এবং তারপরে পঞ্চাশ ও পঞ্চান্ন হইয়া দাঁড়াইলে যন্ত্রের লিপিফলকে সাড়ার পরিমাণ কমিয়া আসিতে লাগিল। বোধ হয় এই সময়েই লজ্জাবতী বুঝিয়াছিল, অবস্থা ভালো নয়। তারপরে উষ্ণতার পরিমাণ সেন্টিগ্রেডের ষাট ডিগ্রি হইবামাত্র, সেই তাপক্লিষ্ট লজ্জাবতী হঠাৎ একটা প্রবল সাড়া দিয়া নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পরীক্ষা দেখিলে মৃতপ্রায় লজ্জাবতীর শেষ প্রবল সাড়াটিকে মৃত্যুর আক্ষেপ (Spasm) ব্যতীত আর কোনো কিছুই বলা যায় কি? একবার নয়, বারবার পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র ঠিক ষাট ডিগ্রি উষ্ণতার সুস্থ উদ্ভিদ মাত্রকেই মরিতে দেখিয়াছেন। তাজা পাতা পোড়াইতে গেলে তাহা আকুঞ্চিত হইয়া নিজেই নড়াচাড়া করে। কেবল তাপই আকুঞ্চনের একমাত্র কারণ নয়, পাতার মৃত্যু যন্ত্রণার আক্ষেপও ইহার অন্যতম কারণ। উদ্ভিদের এই প্রকার করুণা উদ্দীপক মৃত্যুর বিষয় যে শীঘ্র আবিষ্কৃত হইবে, কোনও বৈজ্ঞানিক কিছুদিন পূর্বে তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

একই বোঁটায় অনেক সময়ে বিচিত্র রকমের ফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল ফুলের বর্ণ দিনে-দিনে পরিবর্তিত হয়। পাতাবাহার গাছে দিনে দিনে কত বিচিত্র রঙের একটা ছিটে ফোটা প্রকাশ পায়। আচার্য বসু মহাশয় এগুলির উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলেন, তাহাও বিস্ময়কর। তাঁহার মতে পুষ্পপত্রের ওই বর্ণ-বৈচিত্র্য তাহাদের মৃত্যু-লক্ষণ। পাতা ও ফুলের দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান যখন প্রাণহীন হয়, তখনই সেই সকল স্থানে বিচিত্রবর্ণ প্রকাশ পায়। উদ্ভিদের যে সৌন্দর্যকে আমরা এত আদর করি, তাহা মৃত্যুর বিবর্ণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সহ্য গুণ সকলের সমান নয়। যুবক ও সবল ব্যক্তি যে পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আরোগ্য লাভ করে তাহাতেই বালক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। প্রাণীর এই ধর্মটিও জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সদ্য অঙ্কুরিত গাছে তাপ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর জন্য তাপের পরিমাণ ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়াইতে হয় নাই।

অল্প তাপেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—এ যেন দুর্বল শিশুর মৃত্যু। সবল ও সুস্থ গাছকে তিনি বিদ্যুতের প্রবাহ দ্বারা প্রথমে দুর্বল করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহাতে তাপ দিয়াছিলেন। দুর্বল গাছ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি উষ্ণতায় মরিয়া গিয়াছিল। তারপরে তুঁতের জল দিয়া একটি গাছকে অসুস্থ করাইয়া তাহাতে তাপ দেওয়া হইয়াছিল; বিয়াল্লিশ ডিগ্রিতেই সে মৃত্যু লক্ষ্মণ দেখাইয়াছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল, তাহার কথা আলোচনা করিলে, জগদীশচন্দ্রের চিন্তার ধারা কোন পথে চলিয়া গবেষণাকে সার্থক করিয়াছে, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। জগৎ যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহা অনুপরমাণু যে একই মহাপ্রাণে প্রাণবান হইয়া আছে, তাহা জগদীশচন্দ্র এই ভারতের অতি প্রাচীন ঋষিবাক্য হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই তিনি সজীব-নির্জীব ও প্রাণী উদ্ভিদের বাহ্য অনৈক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া অন্তরের কথা জানিবার জন্য সকলেরই কাছে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। কেহ কোনও কথা গোপন করে নাই; সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিল—"আমরা সবাই এক"। এখনকার বৈজ্ঞানিক জাতিভেদের দিনে সত্যের সন্ধানে জড় প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্বারস্থ হইয়া জগদীশচন্দ্র যে সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত পুরস্কারই তিনি লাভ করিয়াছেন।

প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কারপরম্পরা বলা উচিত। কেন না, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নূতন-নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের মতো ধারা বাঁধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নূতন তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছে, আবার প্রত্যেক নির্ণীত তত্ত্ব এক-একটা আঁধার দেশ আলোপূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত অধিক আছে, তাহা নহে।

আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্তু সত্তর বৎসর পূর্বে যখন লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনস্টিটিউশনের) প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারপরম্পরা একের পর এক বাহির হইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল, সেই সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকটা মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভালো।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাড়িত ঊর্মির অস্তিত্ব ধরিবার জন্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তখন কথাটাতে বিশ্বাস হয় নাই। কেন না, বাঙালির মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহা তো একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহু পূর্বে অবধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আর একটা ছোটো বাক্সের ভিতর রক্ষিত লোহার তারের ওপর পতিত হইবামাত্র সেই তারে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং প্রবাহকালে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ পর্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

বস্তুতই সে দিন বিজয়ের দিন বটে; কেন না, এত অল্প আয়াসে এত বড় দুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্বে শুনি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে জার্মান অধ্যাপক হার্জ তাড়িত তরঙ্গের উৎপাদনের ও তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত অল্প আয়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ যেখানে যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশিয় এক ব্যক্তি সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্তা।

সেই দিন হইতে নূতন নূতন সংবাদ সহকারে ভারতবাসীর এই বিজয়বার্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, কিন্তু আনন্দপ্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্যের ও সবলতার প্রয়োজন, সেইটুকু বল ও স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নাই।

ঘটনা বৃহৎ, কিন্তু এই বৃহৎ ঘটনা কীরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত

করিব, তাহা বুঝিতেছি না।

ধাতুদ্রব্য কাহাকে বলে, বুঝাইতে হইবে না; কোন্ জিনিস ধাতু নহে, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। ধাতু, যথা—সোনা, রূপা, তামা। ধাতু নহে—জল, বায়ু, ইট, কাঠ। কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার স্বরূপ ঠিক বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই হয়তো বুঝিবেন না। কিন্তু সে কথা বুঝাইবার এখন সময় নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্তমান, এবং সূর্যমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে সংবাদবহন এই আকাশের নিরূপিত কার্য। সূর্যের ও নক্ষত্রের শরীরগত পরমাণুগুলি এই আকাশে যে ধাক্কা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন করিয়া আমাদের চোখে লাগে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই বলি আলো ও তাহার অভাবই আঁধার। এবং সেই আলোকের অনুভূতি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ওইখানে ওটা সূর্য, আর ওইখানে ওটা একটা তারকা। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত বেশি যে, সেই ঢেউগুলি প্রায় সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে আকাশ বাহিয়া চলিয়া থাকে।

আলোকের উৎপাদক শক্তি সেই আকাশের ঢেউ, কিন্তু তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি নামে আরও দুইটা আমাদের অতিপরিচিত শক্তি আছে, সেই দুইটার সহিত আকাশের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, সত্তর বৎসর পূর্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। উপরে যে মনস্বী পুরুষ মাইকেল ফ্যারাডের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই আবিষ্কারপরম্পরা প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া দেয় যে, সেই আলোকবাহী আকাশপদার্থই তাড়িত শক্তির ও চৌম্বক শক্তিরও আধার হইতে পারে।

তৎপরে মাক্সোয়েল, ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রায় প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশ মধ্যে কোনোরূপ টান পড়িলেই তাড়িত শক্তির ও আকাশ মধ্যে কোনোরূপ ঘূর্ণি উৎপন্ন হইলেই চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও একখানা দস্তার থালা উপরি উপরি স্পর্শ করিয়া দুইখানাকে বিচ্ছিন্ন করিলেই, উভয়ের মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টান পড়ে; তখন আমরা বলি, থালা দুখানা তাড়িতযুক্ত হইয়াছে। এই টানটা বায়ুর মধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর ন্যায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যস্থ আকাশেই পড়ে; ধাতুদ্রব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান সংক্রান্ত হয় না। ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাবর্জিত; যেন উহা টান সহিতে পাবে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন টানসহ। অধাতব পদার্থের আকাশ যে রবারের মতো বা ইস্পাতের মতো, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মতো বা কাদার মতো। ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশে এই টান দিলে সেই আকাশ যেন মোমের মতো বা কাদার কত বা গুড়ের মতো বা জলের মতো সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায়, উহাতে টান পড়ে না; এইরূপে উহাতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে টান দিলে উহা রবারের মতো বা স্প্রিং-এর মতো খেঁচিয়া ধরে; উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে না।

ধাতুপদার্থের উদাহরণ একটা তামার তার। এই তারের ভিতর আকাশে টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায় ও এইরূপে উহার মধ্যে তাড়িত প্রবাহ জন্মে।

এই তাড়িত প্রবাহের সাহায্যে আমরা আজকাল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করি ও টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম-পথে গাড়ি চালাই ও রাজপথে ও গৃহমধ্যে আলো জ্বালি।

তারপথে এই তাড়িত প্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে বায়ুমধ্যস্থ আকাশে ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। সেইখানে একটা লোহার কাঁটা ধরিলে লোহার অণুগুলা সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাঁটাটাও ঘুরিয়া গিয়া সেই আবর্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই ব্যাপারের নাম চৌম্বক ব্যাপার, এবং সেই তদবস্থ লোহার কাঁটার নাম চুম্বকের কাঁটা বা কম্পাসের কাঁটা বা দিগ্‌দর্শন-শলাকা।

মাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের কোন অংশে একটা টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছুক্ষণ দুলিবার সম্ভাবনা;—একটা স্প্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়ে দিলে উহা দুলিতে থাকে। এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই আন্দোলনের ধাক্কায় চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবার সম্ভাবনা। আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলিতে পারে, তবে এই তাড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিও ঠিক সেই লক্ষ ক্রোশ বেগেই চলিবার সম্ভাবনা।

মাক্সোয়েল বলিয়াছিলেন, আকাশই যদি তাড়িত শক্তির আধার হয়, তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের ঊর্মি চলিয়া থাকে, তবে বড় বড় তাড়িত ঊর্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তাড়িত শক্তির আধার বটে কি না; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড় বড় ঢেউ উঠে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। আলোক বহন করে যে আকাশ, সেই আকাশই তাড়িত শক্তির আধার না হইতেও পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আকাশ বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। এবং তাড়িতের ঢেউ একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত নূতন ব্যাপার—কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক।

হাৎর্জ সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন; একটাতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপাদন করিবে, আর একটাতে উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে একবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন জন্মিবে; দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া পৌঁছিলে সে কোনও রকমে সাড়া দিবে। আলোকের সঙ্গে তুলনা কর। প্রথমটা যেন দীপশিখা, সেই স্থলে আকাশে ধাক্কা লাগিয়া আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ, সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। মেঘের কোলে যখন বিদ্যুল্লতা চমক দেয়, তখন আকাশে সহসা ধাক্কা পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাক্কা লাগে। বিড়ালের গায়ে একটা চাপড় দিলেও যে আকাশে ধাক্কা না লাগে, এমন নহে।

হাৎর্জের বাহাদুরী এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির আবিষ্কারে—যে যন্ত্রটি তাড়িত তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মতো কাজ করে। দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তাড়িত তরঙ্গ আকাশ বহিয়া এই যন্ত্রে

ধাক্কা দিলে সেই যন্ত্রমধ্যেও তাড়িতের খেলা আরম্ভ হয়, এবং সেই তাড়িতের খেলার বিবিধ প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। তাড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। আলো জ্বালা হইতে গাড়ি টানা পর্যন্ত তাহার উদাহরণ।

হার্ৎজ এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বাস্তবিকই আকাশের মধ্য দিয়া তাড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। দূরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দিলে, সেই তাড়িত নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দূরস্থিত আর একখানা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দেয় ও সেই নর্তনের প্রত্যক্ষ ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়। মাক্সোয়েল যাহা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, হার্ৎজ তাহা চর্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দিলেন।

তাড়িত প্রবাহ ও তাড়িত তরঙ্গ, এই দুইটি শব্দ পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছি ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, প্রবাহ ও তরঙ্গ, উভয়ের অর্থে তফাত আছে। প্রবাহের বশে পদার্থ এক মুখে চলে, যেমন—নদীতে স্রোতের জল। আর তরঙ্গের বশে গতি ইতস্তত ঘটে; নদীর তরঙ্গে তরণী উঠা-নামা করে ও দোদুল্যমান হয়। সেইরূপ তাড়িতের প্রবাহে আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে—এই প্রবাহে টেলিগ্রাফের খবর চলে। আর তাড়িতের তরঙ্গে আকাশ ইতস্তত দুলিতে থাকে; দোদুল্যমান হয়। ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ সংক্রামিত হইলে আকাশ একবার এধার যায়, একবার ওধার যায়। বর্তমান প্রবন্ধের সর্বত্র এই অর্থগত প্রভেদটি মনে রাখা আবশ্যক। তরঙ্গের সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ওপরে 'দোলন', 'আন্দোলন', 'নৃত্য', 'নতন', 'নাচ' প্রভৃতি স্পন্দনবোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে।

এখন দেখা গেল, আকাশমধ্যে ছোট বড় বিবিধ ঊর্মি উৎপন্ন হইয়া সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। ছোট ছোট ঢেউগুলির নাম আলোকতরঙ্গ, বড় বড় ঢেউগুলির নাম তাড়িত তরঙ্গ; ছোট বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ। উপযুক্ত ঊর্মি নির্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল ঊর্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আকাশতরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাহার পক্ষে ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। উপযুক্ত ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের অভাবেই হার্ৎজের পূর্বে কেহ বড়-বড় আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

হার্ৎজের পরবর্তীকালে এই ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশতরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কী জানি, কীরূপে উহার তাড়িতপ্রবাহ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। এই তাড়িত প্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পারো বা আলো জ্বালিতে পারো বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পারো বা গাড়ি টানিতে পারো। এই লোহাচুরে ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরাজিতে Coherer বলে।

ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক। নিরেট ধাতুপদার্থে তাড়িত প্রবাহ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,—কিন্তু ধাতুচূর্ণে এই ফাঁক পার হইয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক লজ অনুমান

করেন যে, আকাশ-তরঙ্গের প্রভাবে কোনো মতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তাড়িত প্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগসাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer।

ধাতুর গুঁড়া না হইলেই যে Coherer প্রস্তুত হয় না, এমন নহে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের Coherer কতকগুলি তারে নির্মিত হইয়াছিল। তারে-তারে স্পর্শ থাকে, স্পর্শস্থলে তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলেই তারের প্রবাহ পরিচালন শক্তি জন্মে।

ফলে যেরূপেই হউক, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে অপরিচালক দ্রব্যে পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচালক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায়। Coherer অর্থাৎ ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই।

মার্কনি যে ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত তাড়িত তরঙ্গ অবলীলাক্রমে ধরা পড়িতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্তা প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়। মার্কনি এই কয় বৎসর মধ্যে বহু ক্রোশ দূর হইতে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র বহু দূর হইতে সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাঁহার বন্ধুগণ এই জন্য কতকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। জগদীশবাবু তাঁহার বন্ধুগণের নিকট অনুযোগভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সংবাদপ্রেরণের ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এ জন্য স্বদেশ কালে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত বটে, কিন্তু আজ আমরা যেসকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতেছি, সে আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইত।

যাহা হউক, তৎকালে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্রেণির বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত আর সকল যন্ত্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাড়িত তরঙ্গের বিবিধ ধর্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন রহস্য উদঘাটন করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে,--আকাশবাহিত তাড়িত তরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্তমান নাই।

আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে। ধাতুপদার্থের মধ্যে আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ধাতুপদার্থ অনচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোকতরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে বা প্রতিফলিত বা পরাবর্তিত হয়।

সান্দ্র পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া যায়, অর্থাৎ আলোকরশ্মি তির্যকগামী হইয়া তিরোবর্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই ধর্ম বর্তমান।

এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত তরঙ্গের যেসকল অজ্ঞাতপূর্ব ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন পুরাণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়িত তরঙ্গ একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর বহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে

না; চুলের গোছার ভিতর চলে, ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে চলে না; কাষ্ঠদণ্ডের ভিতরে আঁশগুলি কোন মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়; প্রস্তরখণ্ডের কোন্‌দিকে পরিচালকতা বেশি, কোন্‌দিকে কম, তাহা ঠিক ধরিয়া দেয়; ইত্যাদি তত্ত্ব চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে নূতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তাড়িত তরঙ্গের যে অভিনব ধর্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ধাতুচূর্ণ তাড়িত প্রবাহের অপরিচালক, কিন্তু ধাতুচূর্ণের উপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলে উহার পরিচালকতা সহসা বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। ইহা পুরাণ কথা, এবং ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক ঊর্মিনির্দেশক Coherer যন্ত্র সকল নির্মিত হইয়াছে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার স্বভাবে আনিতে হইলে একটা আঙ্‌লের ঠোকা দেওয়া প্রয়োজন হয়; একবার নাড়িয়া দিলে তবে উহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

দুই বৎসর হইল জগদীশচন্দ্র দেখান, এইরূপ নাড়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক নহে। এমন অনেক ধাতুদ্রব্য আছে, যাহাকে নাড়া না দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে ঘুরিয়া আইসে। একটা তারে একটা মোচড় দিলে প্রথমে পাক লাগে, কিন্তু তারটার পাক আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, কতকটা সেইরূপ।

ফলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে। স্থিতিস্থাপক তারকে মোচড়ান দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্থাপকতাগুণে আপনা হইতেই সেই পাক খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু এই সীমার ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে, আর সে পাক আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক খুলিতে হয়।

ইস্পাতে ও সীসাতে এইখানে প্রভেদ; কুঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ইস্পাত ঘুরিয়া আসে। সীসাকে বাঁকাইয়া ধরিলে উহার আকুঞ্চন স্থায়ী হইয়া যায়।

ধাতুপদার্থের অণুগুলোতেও যেন এইরূপ একটা স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম আছে। তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া অণুগুলি স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও আপনার স্থিতিস্থাপতাগুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধাক্কাটা যদি অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর আপনা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন জোর করিয়া নাড়া দিয়া আঙুলের ঠেলা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এই জন্য coherer যন্ত্রে আঙুলের ঠোকর দেওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার আরও বিচিত্র। এ পর্যন্ত জানা ছিল যে, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে ধাতুচূর্ণের তাড়িতপ্রবাহ পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান, কতিপয় ধাতুর পরিচালনক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু অনেক ধাতুর পরিচালনক্ষমতা আবার কমিয়া যায়। এইরূপে "সোনা রূপা আদি করি যত ধাতু আছে", সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, ধাতুগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে; কাহারও পরিচালনশক্তি তাড়িততরঙ্গসংক্ষোভে বাড়িয়া যায়; কাহারও বা কমিয়া যায়। এই তথ্যটি

সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব; ইউরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত তরঙ্গের সহিত পরিচালনশক্তির এই সম্বন্ধ কেবল ধাতুবিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপদার্থ মাত্রেই—কেবল ধাতুপদার্থ কেন—ধাতু, অপধাতু বা অধাতু—সকল পদার্থেই অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্তমান আছে, তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ধর্মের আবিষ্কার হইল বলা যাইতে পারে। মাইকেল ফ্যারাডে বহু দিন পূর্বে পদার্থমাত্রেরই চুম্বকত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। এই নূতন আবিষ্কারের সহিত সেই প্রাচীন আবিষ্কারের অনেকটা তুলনা হইতে পারে।

গোটা সত্তর মূল পদার্থ এখন রাসায়নিকগণের পরিচিত। ইহাদের সকলেরই পরিচালকতা তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। আবার কোনো দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রায় আবার তারতম্য আছে। কোনো দ্রব্য বেশি বাড়ে, কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশি কমে, কাহারও কম কমে; এই হ্রাস বৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখিলে একটা বিস্ময়কর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রুসিয় রাসায়নিক মেন্দেলিয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাইতে গিয়া উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সত্তরটি মূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একটা অদ্ভুতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বর্তমান আছে, মেন্দেলিয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পায়। ক্রুকস্ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই জ্ঞাতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর প্রকার দ্রব্য কীরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার নিরুপণের জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ প্রাণিজাতির ও উদ্ভিদজাতির মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ডারুইন যেমন এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টিপ্রণালীর আবিষ্কারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, এই সত্তরজাতীয় মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টিপ্রণালী আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টিরহস্য ভবিষ্যতের যে ডারুইন আবিষ্কার করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলিয়েফের আবিষ্কৃত সম্পর্কের সমর্থন দ্বারা তাঁহাদের পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই।

তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে কোনো বস্তুর পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরাইল না। এই আঘাতের প্রবলতানুসারে আবার একই ধাতুরই পরিচালকতা হয়তো কমে, অথবা বাড়ে। আঘাতের তারতম্যানুসারে কখনও বা বাড়িয়া যায়, কখনও বা কমিয়া যায়। আবার যে সকল ধাতুর পরিচালকতা সহজে বাড়ে কমে না, তাহাকে একটু গরম করিলে আবার বাড়িতে থাকে বা কমিতে থাকে। অণুগুলি যেন জমাট বাঁধিয়া ছিল; উত্তাপ পাইয়া তাহারা কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া হেলিবার দুলিবার অবকাশ পাইল। এখন তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কায় তাহারা হয় এদিকে, কিংবা ওদিকে হেলিয়া পড়িবার অবকাশ পাইল।

কেবল যে মৌলিক পদার্থেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থাবিকার ঘটে, তাহা নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ তরঙ্গের ঘা পাইয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান

রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র লোহাভস্ম (সাদা কথায়, লোহার মরীচা) লইয়া তদুপরি তাড়িত তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার অদৃশ্য অণুগুলিকে কীরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক।

তরঙ্গপ্রতিঘাতে ধাতুচূর্ণের পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন। উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া কণিকাগুলির অণুগুলি কতকটা সংহত ও সন্নিকৃষ্ট হয় ও জমাট বাঁধে; যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা কাছাকাছি আসে; ফলে পরিচালকতা বাড়িয়া যায়। এই সংহতি বাড়ে বলিয়াই পরিচালকতা বাড়ে। সংহতির ইংরেজি নাম coherer ; এই জন্য ধাতুচূর্ণ-নির্মিত ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্র coherer আখ্যা পাইয়াছে।

কিন্তু যদি কোনো দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও আবার কমে; এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে; ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে আর সংহতির ব্যাখ্যা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়; অধ্যাপক লজের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোট কথায়, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা খাইলে জড় পদার্থমাত্রেরই,—ধাতুই বলো আর অপধাতুই বলো,—জড় পদার্থমাত্রেরই পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এদিকে, বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায়; ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি হ্রাস পায়। এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আবার অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতাবলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই বিচলিত হইলেও কিছুক্ষণ পরে আপনা হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও স্বাভাবিক পরিচালনশক্তি ফিরিয়া পায়। প্রবল ধাক্কা পাইলে স্থিতিস্থাপকতা সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না; তবে বাহির হইতে কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য মুখে কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া যায়। পেন্ডলমকে যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করিতে গিয়া আবার বামে উঠিয়া পড়ে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপ, যাহা ক্ষণেকের জন্য অতিপরিচালক হইয়াছিল, তাহা আবার ক্ষণেকের জন্য অপরিচালক হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারস্রোত যদি এই পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাঁহার কার্যের জন্য বিস্মিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সেই স্রোত এখন যে নূতন মুখ অবলম্বন করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে, তাহাতে কোথায় যে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন্ কূলহীন প্রকাণ্ড মহাসাগরে লীন হইয়া আমাদিগকেও ভাসাইয়া দিবে, তাহা বিস্ময় ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গ হইতে ধরাতলে নামাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে কোন সগরসন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারি না; তিনি অগ্রণী হইয়া এই পুণ্যধারার পথপ্রদর্শন করিতেছেন, তিনিও হয়তো জানেন না, ইহার সমাপ্তি কোথায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা পুরাতন কথার আলোচনা আবশ্যক।

নির্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। জীবদেহে সাধারণ জড়ধর্ম সমুদয়ই বিদ্যমান আছে; তবে জড়ধর্ম ব্যতীত কোনো অসাধারণ ধর্ম বা অতিজড়ধর্ম—যাহা নির্জীব জড়ে বিদ্যমান নাই, এরূপ কোন অসাধারণ ধর্ম—বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিচার্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্য-পরিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলির সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু তথাপি জীবশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বতমান জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায় না। গতিবিজ্ঞান, আর তাপবিজ্ঞান, আর তাড়িতবিজ্ঞান, আর রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়ার অর্থ কতক-কতক বুঝা যায়; কিন্তু সমস্ত বুঝা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণি আছে। এক শ্রেণির পণ্ডিতে বলেন,—জীবন-তত্ত্বের সমগ্র ভাগ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার কখনও সম্ভাবনা নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনোরূপ অজ্ঞাত ক্রিয়ার প্রভাবে জীবনযন্ত্র প্রধানত কাজ করে। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে vital force বা জীবনীশক্তি বা এইরূপ একটা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে বা হইবে না। জড় পদার্থে এই জীবনীশক্তি নাই; কাজেই উহা জড়। জীবদেহে উহারই প্রভুত্ব; এই জন্য জীবদেহে জীবন। জীবে ও জড়ে এইজন্য মূলগত বিরোধ।

দ্বিতীয় শ্রেণির পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা প্রাকৃতিক পরিচিত শক্তিসমূহের সাহায্যেই জীবনের কাজ সমস্ত বুঝাইতে পারিব। জীবের ও জড়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না। বস্তুত উভয়ের মধ্যে কোনো মূলগত প্রভেদ নাই। জীবদেহে ও জড়দেহে কোনো মৌলিক প্রভেদ নাই। জীববিজ্ঞান কালে জড়বিজ্ঞানেই পরিণত হইবে।

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয় পক্ষে মতের প্রকৃত অনৈক্য নাই; কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়া বিতণ্ডাব সৃষ্টি হইতেছে। মূলে কেবল কথার অর্থ লইয়া ঝগড়া। এখানেও অনেকটা সেইরূপ।

বর্তমান কালে আমরা জড় উপকরণ লইয়া জীবশরীর নির্মাণ করিতে পারি না, একথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক জৈব পদার্থ, ইংরাজিতে যাহাকে অর্গানিক পদার্থ বলে, যথা—ঘি, তেল, চিনি, মদ প্রভৃতি পদার্থ, যাহা সচরাচর প্রাণিদেহে বা উদ্ভিদের দেহ মধ্যে নির্ম্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্মিত হইতেছে। এমন দিন ছিল, এই সকল পদার্থ মানুষে জড় উপাদান লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিত না। ঘি-র জন্য গরু ও তেলের জন্য সরিষাগাছ ও চিনির জন্য ইক্ষুদণ্ড ও মদের জন্য দ্রাক্ষালতা প্রভৃতির অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই সকল জৈব অর্থাৎ জীবজ পদার্থ জড় উপাদান হইতে অবাধে নির্মাণ করিতে পারেন। এইজন্য তাঁহাদের এক সময়ে অত্যন্ত দুরাশা হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক কয়লা, আর জল, আর অ্যামোনিয়া উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ডাল-রুটি, এমন কী, মাছ-মাংস পর্যন্ত তৈয়ার

করিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সে আশা অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই। এখনও ডাল রুটি ও মাছ-মাংসের জন্য রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রকৃতিদেবীর বৃহত্তর কর্মশালায় উপস্থিত হইতে হয়, এবং শীঘ্র যে সে আশা সফল হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু দিন পূর্বে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল, এবং অদ্যাপি অনেক অপণ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, জড় পদার্থ হইতে কৃমি-কীট, মাছি-মশা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাণিবর্গকে জরায়ুজ, অন্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু অধিক দিনের কথা নহে, এই বিশ্বাসের মূলভিত্তি পর্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জীব হইতেই নূতন জীব জন্মে; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীজ হইতেই জন্তু হয়। এখন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্বেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই অন্ডজ।

জীবের উৎপাদন দূরে থাক, যে মশলায় জীবদেহ নির্মিত, ইংরাজিতে যাহাকে প্রোটোপ্লাজম বলে, যাহার বাঙলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলিল না, তাহাও এপর্যন্ত জড় উপাদানে নির্মাণ করিবার কোনো উপায়ই দেখা যায় না। সেই প্রোটোপ্লাজম পদার্থ এখনও কোনও রসায়নবিৎ কয়লা, জল ও অ্যামোনিয়ার সাহায্যে নির্মাণ করিতে সমর্থ হন নাই। যদি কখনও সমর্থ হন, তখন জীবের ও জড়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে বলিয়া নৃত্য করিবার কারণ মিলিবে; এখন নহে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু—

প্রোটোপ্লাজম এখনও নির্মিত হয় নাই, সুতরাং জীবদেহ জড় উপাদানে গঠিত হইলেও সেই জড় উপাদানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ নির্মাণ করিতে পারি না। আমরা পারি না, কিন্তু প্রকৃতি পারেন। নৈসর্গিক কারণে জড় উপাদানেই জীবদেহ গঠিত হইতেছে। উদ্ভিদের শরীর বা জন্তুর শরীর বিশ্লেষণ করিয়া জড় উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান এক কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা কিই বা পারি? আমরা জীবদেহনির্মাণে অসমর্থ; জড়দেহনির্মাণেই কি আমরা সমর্থ? যখন আমরা উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সে নির্মাণ কি আমাদেরই কাজ? এক হিসাবে উহা আমাদের কাজ বটে, আর এক হিসাবে আমাদের কাজ নহে। উদজান আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্মবশে অম্লজানসংযুক্ত হইয়া পোড়ে ও জলে পরিণত হয়; গন্ধকও আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্মবশে পুড়িয়া গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়, আমাদের সেখানে প্রভুত্ব বা কতত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা আমাদের কৃতকর্ম নহে। আমরা জিনিসগুলাকে এমনভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া মিশাইয়া আগুন ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে আগুন ধরাইয়া হাওয়া আর জল মিশাইয়া দিই, তখন উদজান আর গন্ধক আপনা হইতে প্রাকৃতিক ধর্মে পুড়িতে থাকে ও জল তৈয়ার হয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈয়ার হয়। এইটুকুই যা আমাদের কর্তৃত্ব। অর্থাৎ, আমাদের যা কিছু কর্তৃত্ব এই যোজনাকার্যে; পাঁচটা উপকরণকে আমরা এইরূপে

জোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন আপন ধর্মবশে নূতন-নূতন জিনিসের উৎপত্তি করে।

জীবদেহের নির্মাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। জল আর গন্ধকদ্রাবক আমরা জড় উপাদান লইয়া নির্মাণ করি; কিন্তু জড় উপাদান লইয়া জীবদেহ নির্মাণ করিতে পারি না। উভয়ে এই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধানের অর্থ কি? এই নির্মাণের অর্থ কি? নির্মাণ আমরা করি না; নির্মাণ প্রকৃতি করেন; প্রাকৃতিক ধর্মে নির্মাণকার্যে চলে, উভয়ত্রই চলে। আমাদের নির্মাণের নাম যোজনা। একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ; অন্যত্র এই যোজনাকার্যে অসমর্থ। জীবদেহেও জড় উপাদান ব্যতীত অজড় অপরিচিত অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই কয়লা আর উদজান আর অম্লজান আর যবক্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ—নিতান্ত পরিচিত জড় পদার্থ। কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কীরূপে যোজনা করিলে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হইবে, কীরূপে উপাদানগুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া সমাবেশ করিলে প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ নির্মিত হইবে—প্রাকৃতিক ধর্মবশে নির্মিত হইবে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানি না। এই যোজনাকার্যে আমরা একান্তই অজ্ঞ, কাজেই আমাদের জীবদেহনির্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। প্রকৃতিতে এই নির্মাণকার্য চলিতেছে; প্রকৃতির কারখানায় জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই আপনাআপনি সর্বদাই নির্মিত হইতেছে। জড় হইতেই জড় নির্মিত হইতেছে ও জীবদেহ হইতে জীবদেহ ও জড়দেহ, উভয়ই নির্মিত হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই যোজনাকার্য ঘটে বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই নিয়ত গঠিত হইতেছে। জড়দেহের নির্মাণানুযায়ী যোজনাকার্যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু জীবদেহ নির্মাণের জন্য যে যোজনার প্রয়োজন, তাহা আমরা এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসমর্থ।

এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা প্রকৃতির কর্মশালায় কার্যপ্রণালীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে-করিতে জানিতে পারিব যে, কীরূপে উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নির্মিত হইতে পারিবে। তখন অবশ্যই আমরা জীবদেহ "নির্মাণ" করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন না আসিতেও পারে; যদি না আসে, তাহা হইলে আমরা জীবদেহগঠনে কখনই সমর্থ হইব না। তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রুটি-মাংস কোনও কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয়তো পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা এখন এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, আর এখন জড় উপাদানের সেইরূপ সংযোজন-ঘটনাই জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়শক্তির সাহায্যে জড় উপাদান হইতে জীবদেহের নির্মাণচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সে যাই হউক, আমাদের পক্ষে নির্মাণের অর্থ যোজনা মাত্র, এবং জীবই বল, আর নির্জীবই বল, সর্বত্রই নৈসর্গিক নিয়মে গঠনকার্য চলে, তাহার উপর আমাদের প্রভুত্ব কিছুই নাই। আমরা এক জায়গায় যোজনাকার্যে সমর্থ হইয়াছি, অন্যত্র এখনও হই নাই বা হইতে পারিব না; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নির্জীবের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় প্রাচীর নির্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না।

আসল কথা, যাঁহারা জীবনী-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত বলিতে চাহেন এবং জীবনীশক্তি নামে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহারা সকল

সময়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা গোল আছে। মনুষ্যজাতির অধিকাংশ লোকে "সৃষ্টিকর্তা" নামক এক সৃষ্টিছাড়া "কি জানি-কি ময়" পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্মশালায় যখন একটা অদ্ভুত গোছের রহস্যাবৃত যোজনা-ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্যভেদ কুলায় না, অথচ মনের বোঝা ভারী হইয়া আসে, তখন মানুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার ওপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগের অবসর পায়। জাগতিক ব্যাপারের সর্বত্র এই সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া, স্বয়ং চিন্তায় দায় হইতে মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত আরাম পায়; এবং যখনই কোন ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোনও একটা অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্পিত প্রভুর শক্তিসঙ্কোচের আশঙ্কা কবিয়া চিৎকারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিতে থাকে। এই শ্রেণির লোকের জন্য এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতির রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার করিবার, অথবা প্রকৃতির নাটমন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার শক্তি ও অধিকার যখন মানুষের আছে; এবং সেই শক্তি জ্ঞানের ইতিহাসে পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হওয়াতেও যদি সৃষ্টিকর্তার প্রভুশক্তি সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে, এখনও হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। মাধ্যাকর্ষণ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের আবিষ্ক্রিয়ায় ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিষ্কারে পুনঃপুনঃ এই ব্যবধান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; এখন জীব ও নির্জীবের মধ্যে পর্দাটা কেহ তুলিয়া ফেলিলেও বিশ্বব্যাপার বিপর্যস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

জীবনীশক্তি নামক কোন অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞান যে কয়টি শক্তির অস্তিত্ব অবগত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি যে থাকিবে না, তাহার কোনোই কারণ নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই যে সমস্ত জীবনীক্রিয়ার তথ্য বুঝানো যাইবে, তাহাও মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা একই শক্তির অভিনব মূর্তির সহিত আমাদের নূতন পবিচয় স্থাপিত হইতেছে। তখন জীবনীক্রিয়ার জন্য যদি একটা অভিনব, অচিন্তিতপূর্ব বা অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি বা শক্তির অভিনব মূর্তি, কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনোই কাবণ নাই। এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি বা Vital force বা যাহা ইচ্ছা নাম দাও, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সেই শক্তির কার্যপ্রণালীর সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন নিয়মবন্ধনহীন অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

জীবন্ত জড়দেহে আর নির্জীব জড়দেহে প্রধান বিভেদ কতকটা এইরূপ,—

(১) জীবদেহে বাহির হইতে কোনো শক্তি কাজ করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। চিমটি কাটিলেই মাংসপেশির সঙ্কোচন ঘটে; চোখের স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোকতরঙ্গের ধাক্কা লাগিলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত-পায়ের মাংসপেশিতে নাড়িয়া দেয়। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায়। আজ বাহিরের শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল; সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি স্নায়ুযন্ত্রে কোনোরূপে

আবদ্ধ হইয়া থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় সেই ধাক্কার ফল সহসা প্রকাশ পাইল। পেশিযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূলে এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এবং এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness জড়দেহে বর্তমান দেখা যায় না। জড়দেহেও বাহ্য শক্তির সংঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক এরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কীরূপ তফাত, তাহা সহজে অল্প কথায় বুঝানো যায় না। তবে জড়দেহের ও জীবদেহের এবিষয়ে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ স্থলে তজন্য বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানত এই সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারেব সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ্য জগৎ হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ আবশ্যকমতো তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্যকমতো বিলম্বে বা অবিলম্বে আত্মপ্রসার বা আত্মসঙ্কোচ বা আত্মবিকার সাধিত করিয়া, সেই আক্রমণ নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাব চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়াব নিরন্তর চেষ্টার নামই জীবন।

(২) জীবদেহের আত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নির্জীব জড় পদার্থ তৈয়ারি মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে-বাহিরে সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটা মিছরির দানা বা ফটকিরির দানা অথবা একখানা মেঘ বা কুয়াশা। আর জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনাব শরীরোপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতা হাওয়া আর জল আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নির্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তবে গ্রহণ করিয়া মাংস মজ্জা স্নায়ু নির্মাণ করিয়া লয় ও বৃদ্ধি পায়।

(৩) জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ রক্ষা করে ও সন্তান উৎপাদন করে। এক খণ্ড জীবদেহ হইতে বহু খণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের সমুদয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

প্রধানত জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ আশ্রয়ে জীবদেহে ও জড়দেহে প্রভেদ, উল্লিখিত তিনটি। প্রথম—জীবদেহ বাহ্য শক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়। দ্বিতীয়—জীবদেহ বাহিরের অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধিত করিয়া বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়—জীবদেহ কালে-কালে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংশবিস্তার করে ও সন্তান সর্বাংশেই পিতৃধর্ম পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি, স্বতন্ত্র জীবধর্মস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, একটু তর্কের স্থল। জন্মের অর্থ, পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। উহা তৃতীয় লক্ষণের অন্তর্গত। মৃত্যু অর্থে সেই স্বাধীন জীবনের সমাপ্তি। স্পেন্সারের সংজ্ঞানুসারে বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যখন জীব সেই আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারে না, তখনই

তাহার মৃত্যু। উন্নত জীবমাত্রেরই জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটে, সেদিন বাহির হইতে বিবিধ শক্তি আক্রমণ করিলেও সেই জীব সেই আক্রমণ নিবারণে চেষ্টা করে না; সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবমাত্রের না বলিয়া উন্নত জীবমাত্রের বলিলাম; কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য, তাহা আজিকার দিনে বোধ করি আর বলা চলে না। ওয়াইজমান (Weismann) স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য নহে; তাহারা প্রকৃতই অমরত্বের অধিকারী। জন্ম ও মৃত্যু গেল; থাকে ব্যাধি। জীব বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা চলে, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ফলে জীব এই ক্ষমতার বলে বাহ্য শক্তিকে আপনার জীবনের অনুকূল করিয়া লয়; এই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। আর যখন বাহ্য শক্তি জীবনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ নিবারণে জীব অংশত অশক্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় যাহা জীবনের অনুকূল, ব্যাধির অবস্থায় তাহা প্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও ব্যাধিকে এইভাবে দেখিলে জীবদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া বলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতাত্ত্বিকগণের বিবেচনায় এই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোনো মূলগত বিভেদ নাই। বংশবৃদ্ধি দেহপুষ্টিরই একটা অবান্তর ভেদ মাত্র, আধুনিক জীববিদ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। নিম্নতম পর্যায়ের জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে সীমানির্দেশ প্রায় অসাধ্য। এই সকল জীবের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে নির্মিত। খাদ্য গ্রহণ সহকারে এই কোষটি অর্থাৎ জীবের দেহটি ক্রমে পুষ্টি পায় ও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিসহকারে একটা সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সমগ্র শরীরটি ভাঙিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ নির্মিত হইয়া দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। এক পিতৃপুরুষ আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি সন্তানের উৎপাদন করে। পিতা বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র। কেবল নিকৃষ্ট জীবে কেন, উন্নত জীবের মধ্যেও এই প্রণালী বতমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া শাখা বিস্তার করে। সেই শাখাকে ছেদন করিয়া পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে শাখাই আবার স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। ফলে বংশপুষ্টি ও আত্মপুষ্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি লক্ষণকে দুইটি মাত্র লক্ষণে আনা যাইতে পারে। এবং এই দুই লক্ষণ থাকায় জড়দেহে ও জীবদেহে ব্যবধান।

জড়ে ও জীবে এখন এই দুই বিষম ব্যবধান বর্তমান। জগদীশচন্দ্রের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাৎ প্রথম ব্যবধান দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জীবদেহের এই বাহ্য শক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, এই সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জীবদেহের প্রত্যেক অংশেই ও প্রত্যেক অঙ্গেই বর্তমান। এই খণ্ড মাংসপেশি লইয়া বা একটা স্নায়ুতন্ত্রী লইয়া তাহাতে চিম্‌টি কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে কোনো পুস্তক উদঘাটন করিলেই মাংসপেশীর ও স্নায়ুতন্ত্রীর এই সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। দুই চারিটার এখানে উল্লেখ করিব।

১। একখানা মাংসপেশিতে একটা ধাক্কা দিলেই উহা একটু প'রে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সঙ্কোচ, তার পর ক্রমশ স্বভাবে ফিরিয়া আসে।

২। এই সঙ্কোচের একটা সীমা আছে। প্রবল ধাক্কায় সঙ্কোচনমাত্রা এই সীমায় পৌঁছে; তারপর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না।

৩। একবারে প্রবল ধাক্কা না দিয়া সামান্য আঘাত দিলে খানিকটা সঙ্কোচ হয়। আবার আঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর একটু। পরপর আঘাতে সঙ্কোচ একটু একটু করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রথম আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে; তৃতীয়ে আরও কম; চতুর্থে আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌঁছিলে সঙ্কোচ আর বাড়ে না।

প্রথম আঘাতে এতখানি সঙ্কোচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে ততখানি ঘটে না, জীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ। এক সের বোঝার উপরে আর এক সের বোঝা স্পষ্ট ভার বাড়ায়। কিন্তু এক মণ বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপাইলে আর তেমন ভার বোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতন্ত্র ভাবে ভারী, কিন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি নগণ্য। আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলো কত উজ্জ্বল, কিন্তু সূর্যালোকে প্রদীপের সেই আলোর উজ্জ্বলতা কোথায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner's Law* ও Weber's Law** নামে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসূচক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই।

৪। আঘাতের পর আঘাত, সঙ্কোচের পর একটু সঙ্কোচ। কিন্তু এই আঘাতের পর আঘাত খুব তাড়াতাড়ি দিলে, সঙ্কোচন ব্যাপার আর বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশি একবারে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৫। আঘাত যখন খুব প্রবল হয়, তখন সঙ্কোচনের মাত্রা পরম বা চরম সীমায় পৌঁছে; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সঙ্কোচলাভের পর মাংসপেশি আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন ধাক্কা দিলেও আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মাংসপেশিটা যেন প্রবল আঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই শ্রান্তির অপনোদন ঘটে; সঙ্কুচিত মাংসপেশি তখন ধীরে-ধীরে স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মাংসপেশি বা স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিষ্ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বলো, আর কর্মেন্দ্রিয়ই বলো, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই সাধারণ ধর্ম্ম, এবং বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তির অপনোদনও নিত্য ঘটনা। উত্তাপপ্রয়োগে বা মর্দনে ক্লান্ত মাংসপেশির স্বাস্থ্যলাভ ঘটে।

৬। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশি আবার স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃদু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘাতের পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাবপ্রাপ্তিতে ও স্বাস্থ্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহারই নাম ঔষধ।

ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখনও বা ঔষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহা ঔষধ। কোন্ দ্রব্য অবসাদক, কোন্ দ্রব্য উত্তেজক। আবার একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও বা উত্তেজক, কখনও অবসাদকের কাজ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ঔষধের ফল জন্মায়। হোমিওপ্যাথির আচার্যেরা বলিবেন, যাহা মাত্রাধিক্যে বিষবৎ, তাহাই ন্যূন মাত্রায় পরম ভেষজ।

আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশির উল্লিখিতরূপ বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিবিধ বাহ্য শক্তির প্রয়োগে মাংসপেশি ভিতর হইতে নানারূপে সাড়া দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে সমবেত ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এবং গত মে মাসে লন্ডন রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমীপে যে নূতন আবিষ্কারবার্তা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড়দেহেরও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি বর্তমান আছে। আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশি বা স্নায়ুতন্ত্রী যেমন সাড়া দেয়, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে নির্জীব জড়পদার্থ ঠিক সেই একই রকমে সাড়া দিতে পারে।

জীবদেহে ও নির্জীব জড়দেহে প্রভেদ কিসে, জিজ্ঞাসা করিলে মোটামুটি এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ঃ

১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির হইতে বৃদ্ধি পায়। জীবদেহ অপরিণত অপূর্ণগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অভ্যন্তরে গ্রহণ করে ও তাহাকে পূর্ণগঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায়; এবং বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনি বিভক্ত হইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। বিসদৃশ বস্তু দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্টি; উভয় ব্যাপারই মূলত অভিন্ন; জীবদেহে উভয়ই বর্তমান; জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই।

২। জড়দেহ বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকৃত হয় ও প্রতিক্রিয়াও উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাশুভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাহ্য শক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া সাড়া দেয়; এবং সেই বাহ্য শক্তিকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতে চায়। এই সাড়া দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা, এই আক্রমণ নিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। যখন উচিত মতো সাড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রয়াস যখন সম্পূর্ণ সফল হয় না, তখন বাহ্য শক্তি জীবনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনকার অবস্থা ব্যাধি; এবং যখন সাড়া দিবার ক্ষমতা চিরতরে লোপ পায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ আর নিরস্ত হয় না, তখন মৃত্যু।

সংক্ষেপে এই দুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কীরূপ? বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা যে জড়ের একবারে নাই, এমন নহে। বায়ু মধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্বতশীর্ষে তুষারশৈল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, চিনির শরবতে মিছরির দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই জড়দেহের বৃদ্ধি ও জীবদেহের বৃদ্ধি (আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি), উভয়ের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে, উভয় বৃদ্ধিকে এক পর্যায়ে ফেলিতে সাহস হয় না। সেইরূপ আবার বাহ্য শক্তির আহ্বানে নির্জীব জড়ও যে সাড়া না দেয়, এমন নহে। বাত্যাবলে শৈলশিখর ভূমিসাৎ হয়, ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়; পর্বতবক্ষে যুগব্যাপী নৈসর্গিক উৎপাতের চিহ্নসকল অঙ্কিত রহিয়া যায়। এ সমস্তই বিকার বা বিক্রিয়া; কিন্তু জীবদেহে বিকার বা বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া আছে; তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নির্জীব জড়ে খুঁজিয়া মেলে না। এই প্রতিক্রিয়াই জীবন, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার আংশিক বিলোপে ব্যাধি ও পূর্ণ বিলোপে মৃত্যু। জড়ের স্বাস্থ্য বা ব্যাধি

বা মৃত্যু কাব্যের ভাষাতে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতে উহার এত দিন স্থান ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে বোধ করি, উহা বিজ্ঞানের ভাষাতেও স্থান পাইতে চলিল।

লোহাভস্মের মতো নিতান্ত নির্জীব জড় পদার্থের ওপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা দিয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—

১। তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচালন ক্ষমতা সহসা বাড়িয়া যায়। এক ধাক্কায় বাড়ে; আবার ক্রমশ স্বাভাবিক পরিচালকতা ফিবিয়া আসে।

২। পরিচালনশক্তির বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, প্রবল ধাক্কায পরিচালন মাত্রা সেই সীমায় পৌঁছে; তখন আর ধাক্কা দিলে বাড়ে না।

৩। ধাক্কার পর ধাক্কা দিলে প্রতি আঘাতে পরিচালন ক্ষমতা একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে ততটা নহে, তৃতীয় আঘাতে আরও কম ইত্যাদি।

৪। পুনঃপুনঃ দ্রুতগতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়া বিরামের অবকাশ না দিলে পরিচালন শক্তি এক টানে আপনার নিদিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাই জড় পদার্থের

৫। প্রবল আঘাতে পরিচালন শক্তি একবারে চরম সীমায উপস্থিত হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাই জড় পদার্থের ক্লান্তিলাভ। ইহাই উহার সাময়িক ব্যাধি, এবং এই ব্যাধির ফল স্থায়ী হইলেই মৃত্যু। আবার একটা নাড়া দিলে অথবা একটু গরম করিলে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রচলিত coherer যন্ত্রে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে এই ক্লান্তির অবস্থা ঘটে, নাড়া না দিলে সেই ক্লান্তির অপনোদন হয় না।

৬। নির্জীব জড়দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কখনও অবসাদকেব, কখনও বা উত্তেজকের মতো কাজ করে ও কোনো দ্রব্যে সেই জড়দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোন দ্রব্যে কমাইয়া দেয়। কোনটা বিষের মতো কাজ কবিযা স্বভাবপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়; কোন দ্রব্য ঔষধের কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে। একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে।

তাড়িতোর্মির উত্তেজনায় জড় দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল· কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তিঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম যে জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির অনুরূপ, তাহা ইতিপূর্বে কেহ জানিত না। জগদীশচন্দ্র গত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূবেই জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আবিষ্কারপরম্পরা সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি লন্ডন রয়াল সোসাইটিতে আরও কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন ও রয়াল ইনস্টিটিউশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ওই সকল প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এদেশে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিজ্ঞানের

গহনবনে যে নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীরের মতো তিনি যাত্রাকালে মরুপৃষ্ঠে অম্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, "নাব্যা নদী"কে "সুপ্রতরা" করিয়া ও কুঠারঘাতে "বিপিন"সকলকে "প্রকাশ" করিয়া পুরোমুখে অগ্রগামী হইতেছেন।

আঘাত পাইলে মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয়; স্নায়ুতন্ত্রীতে সঙ্কোচন-পরিবর্তে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংসপেশির সঙ্কোচন লাভের প্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রীর তাড়িত বিকার লাভের প্রণালী ঠিক একই নিয়মের অনুসরণ করে। শরীরবিদ্যাশাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ কোনও শাস্ত্রেই নাই। একটা স্নায়ুর সূতার একপ্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞ মাত্রই জানেন; কিন্তু একটা তামার তারের একপ্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না।

আবার আঘাতপরম্পরায় স্নায়ুসূত্রে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরূপ আঘাত-পরম্পরায় তার মধ্যে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম পরিণামের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম পরিণাম ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্বে কেহ জানিত না। অতিশয় উত্তাপের বা অতিশয় শৈত্যের প্রয়োগে স্নায়ুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে না, উহা সকলেই জানিত। কিন্তু একটা নির্জীব ধাতুময় তারের তাড়িত প্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে লোপ পায়, তাহা কেহ জানিত না। দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ে; আবার দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত। কিন্তু নির্জীব ধাতুপদার্থনির্মিত একটা তার যে দ্রব্যগুণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, উহার প্রতিক্রিয়াশক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত? ঔষধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদকতা ও আফিমের অবসাদকতা, এতদিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণস্বরূপে প্রযুক্ত হইত। জড়দেহের প্রতি ওই সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের মতো নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি ওই সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশূন্য হইবে না।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোকসম্পাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় কীরূপে আহত হয়, তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর ভিতরে স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ বিকার লাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িততরঙ্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নির্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, দর্শনক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র; কিন্তু সেই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কীরূপ, তাহা শরীরবিদ্যাশাস্ত্র ঠিক জানে না; এখন সেই কাজকর্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধ হয় বাহির হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষপর্যন্ত কীরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসমাজ-শরীর সেই উত্তেজনায় কীরূপ সাড়া দিবে জানি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্থিতিশীলতায়

বৈজ্ঞানিকসমাজের কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেহ কোনো নূতন তত্ত্ব আ... বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশ... সহিত ... ন। নূতন সত্যকে সহসা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরি... তেই মনোরম বেশে আসুক, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহাকে বাস দান করিতে স্বভ... কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। জ্বলন্ত আগুনে উহার "বিশুদ্ধি" বা "শ্যামিকা" পরীক্ষা না ...য়া উহাকে গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্ম মাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার আকার কীরূপ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতা মাত্র।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্যতর প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতির উত্তেজনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরামে বাহ্য জগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্র... করিতেছে; এই প্রয়োগকার্যে অবিরাম চেষ্টাই জীবন। জড়দেহেও যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বতমান থাকে, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকার লাভ করিয়া সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্তত একটা ব্যবধান তিরোহিত হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্ন রহিবে, তাহা বলা আবশ্যক। জীব, বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধি সাধন করিয়া স্বয়ং সংসার হইতে অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্মের সংক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট জীবধর্ম, তখনও জড়ের ও জীবের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত রাখিয়া সম্প্রদায়বিশেষকে আরও কিছুদিন সান্ত্বনা প্রদান করিবে।

'সাহিত্য', ১৩০৮ ভাদ্র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার

কলকাতা শহরের দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা প্রত্যহ খবরের কাগজে বাহির হয়। সাত দিনের সংবাদ একত্র করিয়া এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে ঃ—

তারিখ	মৃত্যুসংখ্যা
১লা বৈশাখ	৫০
২রা বৈশাখ	৪৫
৩রা বৈশাখ	৬২
৪ঠা বৈশাখ	৭০
৫ই বৈশাখ	৩৫
৬ই বৈশাখ	৬০
৭ই বৈশাখ	৫৫

এই তালিকা দেখিলে কোন্ দিন কত লোক মরিয়াছে, জানা যায়। তালিকার পরিবর্তে রেখা দ্বারা দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা-নির্দেশ চলিত পারে।

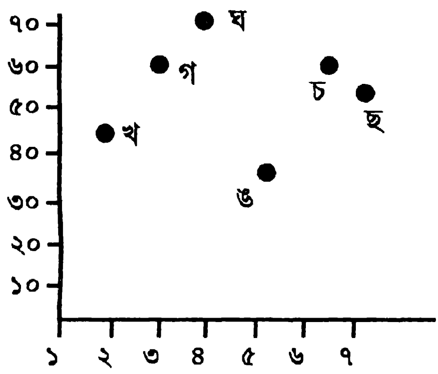

১ চিত্র

১ম চিত্রে দুইটি রেখা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত। একটি রেখা সময়নির্দেশক, উহাতে ১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখের অঙ্ক লেখা আছে। অন্য রেখাটি মৃত্যুসংখ্যা নির্দেশক, উহাতে ১০ হইতে ৭০ পর্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা অঙ্কিত আছে।

১০ অঙ্ক ও ২০ অঙ্কের মাঝের স্থানটুকু দশ ভাগে বিভক্ত করিলে ১১, ১২ হইতে ১৯ পর্যন্ত অঙ্ক পাওয়া যাইতে পারে। চিত্র কদাকার হইবার ভয়ে ওই সকল চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। পাঠকগণ মনে-মনে ঐরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারেন।

১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখ নির্দেশক অঙ্কের ওপর ক,* খ ইত্যাদি ক্রমে ছ পর্যন্ত সাতটি বিন্দু রহিয়াছে। এক এক অঙ্কের উপর এক এক বিন্দু। ৩ অঙ্কের ওপর গ, ৬ অঙ্কের ওপর চ, ইত্যাদি।

সকল বিন্দুর উচ্চতা সময়-নির্দেশক রেখা হইতে সমান নহে। কোনোটির উচ্চতা অধিক, কোনোটির কম। ঘ-বিন্দু সর্বোচ্চ আছে, আর ঙ-বিন্দু সকলের নিম্নে আছে। কোন বিন্দু কত উঁচুতে আছে, মাপিতে হইলে পাশের মৃত্যুসংখ্যা নির্দেশক রেখায় তাকাইলেই চলিবে। ক-বিন্দুর উচ্চতা ৫০; খ-বিন্দুব উচ্চতা ৪০ ও ৫০-এব মাঝামাঝি অর্থাৎ ৪৫; গ-এর উচ্চতা ৬০-এর একটু বেশি অর্থাৎ ৬২; ঘ-বিন্দুর উচ্চতা ৭০; ঙ-বিন্দুর উচ্চতা আবার ৩৫ মাত্র।

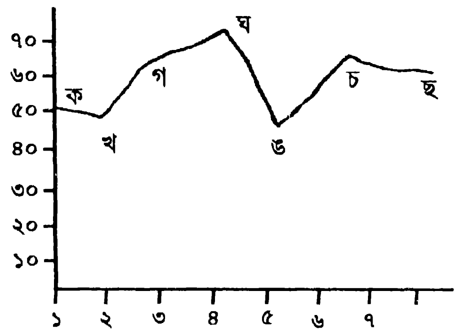

২ চিত্র

২য় চিত্রে বিন্দুগুলির মাঝ দিয়া একটা ভাঙা-চুরা বাঁকা রেখা টানা গিয়াছে।

এই রেখার অন্তর্গত কোন্ বিন্দু কত উচ্চে আছে দেখিলেই, কোন্ তারিখে কত লোক মরিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

মনে কর, জানিতে চাই—৬ই তারিখে কত লোক মরিয়াছে। তারিখের অঙ্ক ৬-এর ওপরে রেখাস্থ চ-বিন্দু; চ-বিন্দুর উচ্চতা ৬০; স্থির হইল, ৬ই তারিখে ৬০ জন লোক মরিয়াছে।

তালিকার কাজ এইরূপ রেখা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। রেখায় একটা সুবিধা আছে, তালিকায় তাহা নাই। রেখার ওঠা নামা দেখিলেই মৃত্যুর হারের ওঠা-নামা বুঝিতে পারা যায়—রেখাটি যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, মৃত্যুসংখ্যা কোন্ দিন কত বাড়িয়াছে, কোন্ দিন কত কমিয়াছে। ৪ঠা তারিখে মৃত্যুর হার একবারে ৭০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তার পরদিন একবারে সহসা ৩৫-এ পতন। কলকাতার যিনি বাসিন্দা, তাঁহাকে এইরূপ রেখা দেখাইলে, তিনি রেখার সহসা উর্ধ্বগতি দেখিলে আতঙ্কিত হইবেন; রেখার নিম্নে পতনে, তাঁহার আশ্বাসলাভ ঘটিবে।

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে কোন বৎসর কত ছাত্র বি, এ, পাশ করে, তাহার তালিকা বাহির হয়। সেই তালিকার বদলে ৩য় চিত্র দেওয়া গেল। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, কোন্ বৎসরের পাশের ফল কীরূপ।

* "ক" চিহ্নটি চিত্রে উঠে নাই, উহা পঞ্চাশের ঘর ঘেঁষিয়া অবস্থিত এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।—সম্পাদক।

৮৫ হইতে ৯৫ পর্যন্ত ইংরাজি বৎসরের অঙ্ক; ৮৫ অর্থে ১৮৮৫, ৯৫ অর্থে ১৮৯৫। অন্য রেখায় ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত অঙ্ক উত্তীর্ণ ছাত্রেব সংখ্যা নির্দেশক। বক্র রেখাটি দেখিয়া কোন বার কত ছাত্র পাশ করিয়াছে, অক্লেশে বুঝা যায়। ৮৫ সালে পাশের সংখ্যা প্রায় ৩১০; ৮৬ ও ৮৭ সালের প্রায় সমান, সাড়ে চারি শতর কাছাকাছি; ৮৮ সালে কিঞ্চিৎ

৩ চিত্র

পতন, প্রায় পৌনে চারিশতে; ৮৯ ও ৯০ দুই বৎসর ক্রমিক উত্থান, ৮৯এ ৪০৯; ৯০এ ৪৩৫; ৯১ সালে একবারে অধঃপতন ৩০৩ সংখ্যায়। আবার ৯৫ পর্যন্ত ক্রমশ উত্থান। ৯৫ সালে উন্নতির সীমা প্রায় পাঁচশত পর্যন্ত।

কলকাতা শহরের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব ২৪ ঘণ্টা পরপর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসর অন্তরে ছাত্রেরা বি. এ. পাশ করে। কিন্তু এমন বিবিধ ঘটনা আছে, যাহা ক্ষণে ক্ষণে

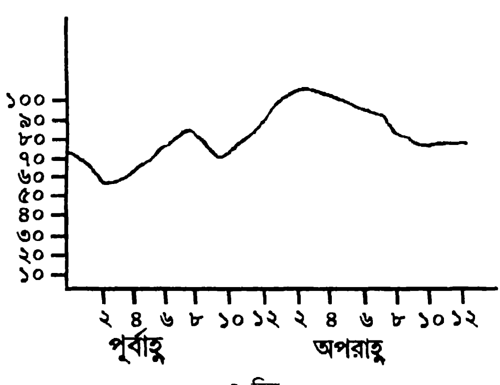

৪ চিত্র

পরিবর্তিত হয়; ক্ষণে ক্ষণে তাহার কীরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন বায়ুর উষ্ণতা। বায়ুর উষ্ণতা চব্বিশ ঘণ্টায় সমান থাকে না, উহা ক্ষণে-ক্ষণে বদলায়। বড় বড় মানমন্দিরে থার্মোমিটার দ্বারা এই অবিরাম পরিবর্তনের হিসাব রাখা হয়। এবং

সেই অবিরাম পরিবর্ত্তন রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। ৪র্থ চিত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতা কখন কীরূপ ছিল, দেখানো হইতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্বাহ্ন; বেলা ১২টা হইতে পররাত্রি ১২টা পর্যন্ত অপরাহ্ন। সময়-নির্দেশক রেখায় পূর্বাহ্নের ও অপরাহ্নেব ঘটিকাচিহ্ন এইরূপে অঙ্কিত আছে। উষ্ণতা-নির্দেশক অপর রেখায় উষ্ণতা অংশ থার্মোমিটারের ডিগ্রি ১০০ পর্যন্ত অঙ্কিত আছে।

রেখার উত্থান পতনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কোন্ সময়ে বায়ুর উষ্ণতা কত ডিগ্রি ছিল। রাত্রি বারোটার সময় উষ্ণতা প্রায় ৭৫ ডিগ্রি ছিল, ক্রমশ কমিয়া রাত্রি ৪টার সময় ৬০ ডিগ্রির নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশ উঠিয়া বেলা ৯টার সময় ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়াছে। হয়তো সেইসময় একটু মেঘ করিয়াছিল, একটু ঠান্ডা হাওয়া দিয়াছিল। উষ্ণতা সেইরূপ কোনো একটা কারণে বেলা ১২টার সময় আবার কমিয়া যায়। আবার ৪টা বেলার সময় উষ্ণতার মাত্রা ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অহোরাত্র মধ্যে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি চিত্রস্থিত বক্র রেখাটির উত্থান-পতনের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইতেছে।

যে কোনো ঘটনার পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি এইরূপ রেখা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এইরূপ কতিপয় রেখা দ্বারা ধাতুপদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রেখাগুলির অর্থ কী, বুঝাইবার জন্য একখানি ভূমিকা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন, তাঁহাদের নিকট ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন না, তাঁহাদের জন্য এই ভূমিকা আবশ্যক। নতুবা জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাগুলি তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য বোধ হইবে।

মাংসপেশিতে আঘাত করিলে উহার সঙ্কোচ ঘটে। আঘাতের ফলে একটু খাটো হয়। কতটুকু খাটো হয়, মাপিয়া দেখা চলে। আবার কতটা আঘাতে কতটুকু খাটো হয়—তাহাও মাপিয়া দেখা চলে। এই সঙ্কোচন চিরস্থায়ী হয় না; আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচ ঘটে; আবার একটু পরে মাংসপেশি স্বভাবে ফিরিয়া আসে। একটা ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কোচবৃদ্ধি, আবার কিছুক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি। শরীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা যাহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই সকল ব্যাপার পর্যবেক্ষণে দিন কাটান। একটা ধাক্কায় কতক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটিল, আবার কতক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি হইল, ঘড়ি ধরিয়া ও মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া থাকেন; এবং যাহা দেখেন, তাহা রেখা টানিয়া অন্যকে দেখান।

একখণ্ড মাংসপেশিতে একটা ধাক্কা দিলে, কতক্ষণে কতটুকু সঙ্কোচ ঘটে ও কতক্ষণে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা নিম্নের ৫ক চিত্রে দেখানো গেল। এই চিত্র Brodie's Experimental Physiology পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই চিত্রে ও পরবর্তী চিত্রসকলে লম্বরেখা দুইটি আর অনাবশ্যক বোধে দেওয়া যায় নাই; পাঠকগণ মনে-মনে কল্পনা করিয়া লইবেন, সেই রেখাদ্বয় যেন চিত্রে অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে। একটি রেখা ভূমিগত—উহা কালনির্দেশক। অপরটি উহার উপর লম্বরূপে দণ্ডায়মান—উহা সঙ্কোচের মাত্রানির্দেশক।

এ চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ধাক্কা পাইয়া সঙ্কোচ ক্রমে বাড়িতেছে; পূর্ণমাত্রায় ওঠার পর আবার সঙ্কোচ কমিয়া গিয়াছে। মাংসপেশি ক্ষণিকের জন্য বিকৃতিলাভের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা বা তদনুরূপ একটা ধাক্কা পাইলে, ধাতুপদার্থ বিকৃতি লাভ করে; উহার তাড়িত-পরিচালনশক্তি সহসা বাড়িয়া যায়। একটা ধাক্কায় ক্ষণেকের মতো বাড়ে মাত্র; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসও রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। জগদীশচন্দ্রও তাহা দেখাইয়াছেন। ৫ খ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

৫ ক চিত্র

৫ খ চিত্র

মাংসপেশির অবস্থার উত্থান-পতন, আর ধাতুপদার্থের অবস্থার উত্থান-পতন, উভয়ের সাদৃশ্য কত অদ্ভুত, তাহা ৫ (ক) ও ৫ (খ), দুই চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পরবর্তী চিত্রগুলির বোধ করি, বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। পাঠক মহাশয় আপনি বুঝিয়া লইবেন। কয়েক জোড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে প্রথম চিত্র ক-চিহ্নিত ও দ্বিতীয় চিত্র খ-চিহ্নিত করা গেল। ক-চিহ্নিত চিত্রগুলি শরীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; এই সকল চিত্রের কোনটায় মাংসপেশির, কোনটায় বা স্নায়ুসূত্রের বিকারপ্রাপ্তি দেখানো হইয়াছে। খ-চিহ্নিত চিত্রগুলি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের অঙ্কিত। ধাতুচূর্ণে, ধাতুর তারে ধাক্কা দিয়া, মোচড় দিয়া, তাড়িত তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহাতে বিকার উৎপাদন করিলে, সেই বিকারের কীরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কীরূপ উত্থান-পতন ঘটে, তাহা এই সকল চিত্রে দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার ক-এর সহিত খ-এর সাদৃশ্য কত বিস্ময়কর! মাংসপেশি বা স্নায়ুসূত্রের মতো জীবন্ত দ্রব্য যে নানাবিধ বিকার লাভ করে, তাহা সকলেই জানিত; কিন্তু নির্জীব ধাতুচূর্ণ বা ধাতুতন্ত্রীতে যে এমন বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ জানিত না। এবং মাংসপেশির বা স্নায়ুসূত্রের বিকারলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তির সহিত নির্জীব ধাতুপদার্থের বিকারলাভের ও স্বভাবপ্রাপ্তিব এত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বা কে জানিত? সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য এই, যে দ্রব্য পেশির পক্ষে বা স্নায়ুর পক্ষে মাদক বা উত্তেজক, তাহাই আবার ধাতুপদার্থের পক্ষেও মাদক ও উত্তেজক; যাহা সজীব পদার্থের পক্ষে অবসাদক, নির্জীবের পক্ষেও তাহাই অবসাদক।

এখন আমরা এক এক জোড়া চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব ও উহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিব। ক চিত্রের সহিত খ চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া, সজীবের ও নির্জীবের সাদৃশ্য পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

৬ ক।—এক খণ্ড মাংসপেশিতে পুনঃপুনঃ ধাক্কা পড়িলে উহার সঙ্কোচ কীরূপে বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখানো হইতেছে।

৬ ক চিত্র

৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে পুনঃপুনঃ ধাক্কা পড়িলে উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি কীরূপ বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখানো হইতেছে।

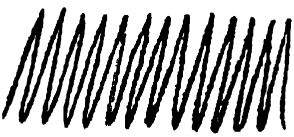

৬ খ চিত্র

৭ ক।—পুনঃপুনঃ আঘাতে মাংসপেশি যেন ক্রমশ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম-প্রথম আঘাতে যতটা সঙ্কোচ হইতেছিল, পরের আঘাতে আর ততটা সঙ্কোচ ঘটে না। সঙ্কোচের মাত্রা পরপর আঘাতে কমিয়া আসিতেছে। রেখার উত্থান পতনের মাত্রা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে; তাহার অর্থ—পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় মাংসপেশিরা ক্রমশ যেন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।

৭ ক চিত্র

৭ খ।—পুনঃপুনঃ উত্তেজনা পাইয়া ধাতুপদার্থও ক্রমশ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।

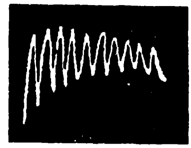

৭ খ চিত্র

৮ ক।—পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় পেশির ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ ক চিত্রেরই অনুরূপ।

৮ খ।—পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় ধাতুদ্রব্যের ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ খ চিত্রের অনুরূপ।

৮ ক চিত্র

৯ ক চিত্র

৯ ক।—প্রথমেই প্রবল আঘাত পাইয়া মাংসপেশি যেন একই আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে। তার পরের আঘাতে যেন অতি ক্ষীণভাবে সাড়া দিতেছে। আর পূর্বের মতো প্রতিক্রিয়ার যেন ক্ষমতা নাই। তারপর আঘাত থামিলে, ক্রমশ স্বভাবপ্রাপ্তি ও অবসাদলোপ।

৯ খ।—ধাতুদ্রব্যের অবস্থাও তদনরূপ—প্রবল আঘাতে ধাতুপদার্থও যেন কাতর ও অবসন্ন; পরের আঘাতগুলিতে তাহার আর পূর্বের মতো সতেজে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা নাই।

৮ খ চিত্র

৯ খ চিত্র

১০ ক।—প্রথম আঘাত এত প্রবল যে, সেই আঘাতে মাংসপেশি একবারে সম্পূর্ণভাবে অবসন্ন; এবার অবসাদের মাত্রা পূর্ণ; আর আঘাতে সাড়া দেয় না। সঙ্কোচ-নির্দেশক, রেখাটি চরম উন্নতি লাভ করিয়া একবারে সোজা চলিয়াছে; আঘাত সত্ত্বেও, উত্তেজনা সত্ত্বেও, কিছুকাল উহার আর উত্থান-পতন নাই। মাংসপেশির এই পূর্ণ অবসাদের অবস্থায় ধনুষ্টঙ্কার ঘটে। ধনুষ্টঙ্কারে মাংসপেশির সঙ্কোচনমাত্রা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; তখন উহা এরূপ কাঠিন্য ও জড়তা লাভ করে যে, আর কোনোরূপে কোনো উত্তেজনায় উহাকে কোমল করা যায় না; উহার জড়তার অপনোদন হয় না। আবার কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের পর এই শ্রান্তি দূর হয়; তখন উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাকে রোগমুক্তি বলা যাইতে পারে। উত্তাপপ্রয়োগ, ঔষধপ্রয়োগ প্রভৃতি রোগমুক্তির অনুকূল।

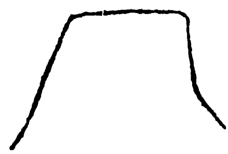

১০ ক চিত্র

১০ খ।—ধাতুদ্রব্যের পূর্ণ অবসাদ। প্রবল আঘাতে ধাতুদ্রব্যেরও আর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকে না। উহার পরিচালনশক্তি একবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন

উত্তেজনায় সে শক্তির আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাড়িতোর্মি প্রদর্শনের জন্য নির্মিত Coherer যন্ত্রে ধাতুদ্রব্যের এই অবসাদপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। বিশ্রাম লাভের পর, অথবা উত্তাপ প্রয়োগে এই অবসাদের দশা আবার দূর হয়।

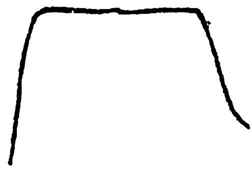

১০ খ চিত্র

১১ ক।—উত্তাপে অবসাদ নষ্ট করে, উত্তাপ রোগমুক্তির অনুকূল। ১১ ক চিত্রের অন্তর্গত উভয় রেখায় ইহা দেখানো হইয়াছে। ৩০ ডিগ্রি উষ্ণতায় মাংসপেশি যেন সতেজে সাড়া দিতেছে; উত্তেজনা পাইবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হইতেছে; আবার ক্ষণমাত্রেই স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। আর ৬ ডিগ্রি মাত্র গরমে মাংসপেশি যেন দুর্বল ও ক্ষীণ; উত্তেজনা তেমনই; কিন্তু উহার সঙ্কোচমাত্রা কত কম। ধীরে-ধীরে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ লাভ করিয়া আবার ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতেছে।

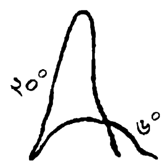

১১ ক চিত্র

উত্তাপের এই অবসাদ-নাশক শক্তি সকলেই জানেন। দারুণ শীতে শরীর অবসন্ন হয়; উত্তাপে স্ফূর্তি লাভ করে। পরিশ্রমে মাংসপেশি শ্রান্ত ও অবসন্ন হইলে, উষ্ণতাপ্রয়োগে উহার অবসাদ দূর হয়। মাংসপেশির স্ফূর্তিলাভের জন্য ডাক্তারদের ফোমেন্টেশন্ প্রয়োগের ব্যবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ।

১১ খ চিত্র

১১ খ।—এখানেও দুইটি রেখা; একটিতে ধাতুদ্রব্য গরম—২১ ডিগ্রি, অন্যটিতে ধাতুদ্রব্য ঠান্ডা—২ ডিগ্রি মাত্র। উভয় রেখায় কত তফাত। গরমে কত তেজ; ঠান্ডায় কত অবসাদ।

১১ খ খ।—এই চিত্রের তিনটি রেখা ধাতুদ্রব্যের উষ্ণতার মাত্রাভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দেখাইতেছে। প্রথম রেখায় ০ ডিগ্রি, দ্বিতীয়টিতে ৪০ ডিগ্রি ও তৃতীয় রেখায় ১০০ ডিগ্রি গরমে ধাতুর অবস্থা কীরূপ থাকে, বুঝা যাইতেছে। ০ ডিগ্রির অপেক্ষা ৪০ ডিগ্রিতে উত্তেজনা যেন কিছু বাড়িয়াছে; আবার ১০০ ডিগ্রিতে যেন একটু অবসন্ন হইয়াছে; অল্প উত্তাপে উত্তেজনা বাড়ে; কিন্তু উত্তাপের আতিশয্য আবার উত্তেজনার বদলে অবসাদ উৎপন্ন করে।

১১ খ খ চিত্র

১২ ক।—এই চিত্র দেওয়া গেল না। অ্যামোনিয়া অতি পরিচিত উগ্রগন্ধি বাষ্পীয় পদার্থ। অ্যামোনিয়া প্রয়োগে শরীরের কীরূপ অবসাদনাশ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই জানেন।

১২ খ।—এই চিত্রে ধাতুদ্রব্যের ওপর অ্যামোনিয়ার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বামের রেখার উত্থান-পতনে অ্যামোনিয়া প্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা ও ডাহিনের রেখার উত্থান পতনে অ্যামোনিয়া প্রয়োগের পরবর্তী অবস্থা দেখানো হইতেছে। নির্জীব ধাতুপদার্থ আমোনিয়া প্রয়োগে যে এমন উত্তেজিত হইয়া ওঠে, তাহা কে জানিত!

১২ খ চিত্র

১৩ ক।—বিষপ্রয়োগে স্নায়ুসূত্রের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি এই চিত্রে দেখানো হইতেছে। যাহাতে অস্বাভাবিক অবসাদ উৎপাদন করে, তাহাই বিষ। ক্লোরোফর্মের অবসাদক ক্রিয়া সকলেই জানেন। অতিমাত্রায় প্রয়োগে স্নায়ুযন্ত্র অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে। এই চিত্রের বামাংশে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের পূর্বে স্নায়ুসূত্রের স্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থা ও দক্ষিণের অংশে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের পরে অবসন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

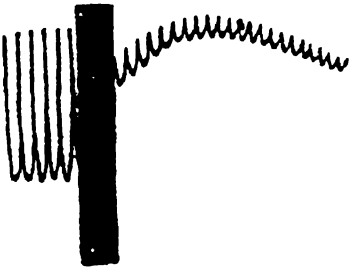

১৩ ক চিত্র

স্নায়ুসূত্রে আঘাত করিলে উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে; দ্রুত প্রবাহে স্নায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার ও ক্ষীণ প্রবাহে উহার অবসন্ন অবস্থার সূচনা করে। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে স্নায়ু ক্রমে অবসন্ন হয়; উহার আর দ্রুত প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। চিত্রে তাহাই দেখানো হইতেছে।

১৩ খ।—ধাতুপদার্থে বিষের ক্রিয়া। বামাংশে বিষ প্রয়োগের পূর্বের ও দক্ষিণের অংশে বিষ প্রয়োগের পরের অবস্থা দেখানো হইতেছে।

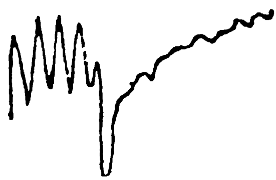

১৩ খ চিত্র

১৪ খ।—এই চিত্রে তিনটি রেখা ধাতুর ত্রিবিধ অবস্থার জ্ঞাপক। প্রথম রেখায় বিষ প্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা—ধাতুপদার্থ এখন স্বভাবস্থ; উত্তেজনা পাইলেই সতেজে সাড়া দেয়। দ্বিতীয় রেখায় বিষ প্রয়োগের পরবর্তী দশা—নির্জীব ধাতু এখন সজীবের মতো অবসন্ন—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ। তৃতীয় রেখা ঔষধ প্রয়োগের পর—ঔষধ প্রয়োগে অবসাদ দূর হইয়াছে; ধাতু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে। ১৪ ক চিত্র দেওয়া আবশ্যক হয় নাই।

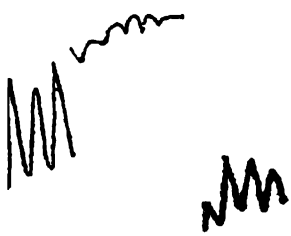

১৪ খ চিত্র

১৫ খ।—এখানেও তিনটি রেখা। প্রথম রেখা ধাতুদ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞাপক। অল্পমাত্রায় উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োগে ধাতুদ্রব্য কিরূপে উত্তেজিত হয়, তাহাও দ্বিতীয় রেখায় বুঝা যাইতেছে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগে ঔষধও কিরূপে অবসাদে পরিণত হয়, তাহা দেখা যাইতেছে। আফিম, বেলাডোনা, ইপিকাকুয়ানা প্রভৃতি দ্রব্য কীরূপে মাত্রাভেদে স্নায়ু-যন্ত্রের উপর, কখনও ঔষধের, কখনও বিষের কাজ করে, তাহা সর্বজনবিদিত; স্বতন্ত্র চিত্রে তাহা দেখানো গেল না।

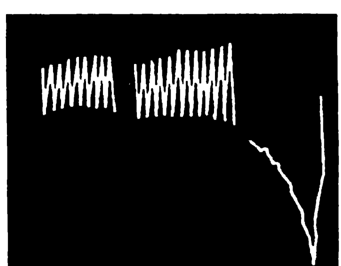

১৫ খ চিত্র

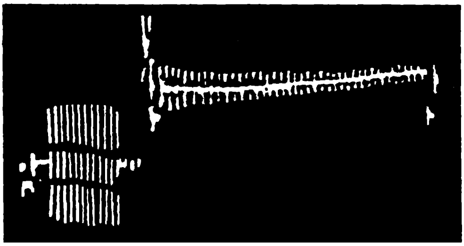

১৬ ক চিত্র

১৬ ক।—স্নায়ুযন্ত্রের উপর আফিমের ক্রিয়া দেখানো হইয়াছে। বামাংশে প্রয়োগের পূর্বতন, দক্ষিণাংশে পরবর্তী ক্রিয়া দেখানো হইয়াছে।

১৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে আফিমের তদনুরূপ ক্রিয়া।

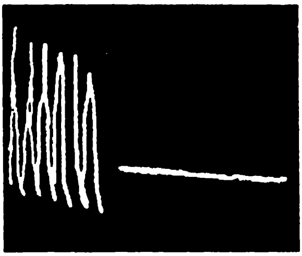

১৬ খ চিত্র

জড়দেহে ও জীবদেহে যে কতটা সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত চিত্রগুলি দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। এই সাদৃশ্যের বিষয় এতদিন কেহ জানিত না। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এই সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটা নূতন রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কোনো নূতন দেশে উপস্থিত হইবেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না। জীবদেহের মতো জড়দেহ বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জীবদেহের ন্যায় জড়দেহ বিষপ্রয়োগে অবসন্ন হয়, আবার ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের পূর্বে কোনো বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই। জড়েরও জীবন আছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অনেক বড় বড় পণ্ডিত মীমাংসা অসাধ্য বলিয়া একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন্ পথে চলিলে এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহার নির্দেশেও এপর্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া পরম্পরা সেই সমস্যার পুরণে কত দূর সফল হইবে, তাহার নির্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তমোময় রহস্যাবৃত প্রদেশাভিমুখে একাকী অগ্রণী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতৃভূমির বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছেন;—তাঁহার জননীর আশীর্বচন তাঁহার জয়যাত্রার রক্ষাকবচ হউক।

'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩০৮

অমলচন্দ্র হোম

আমেরিকায় আচার্য জগদীশচন্দ্র

মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু বর্তমান ইংরাজি মাসের "মর্ডান বিভিয়ু" পত্রিকায় আমেরিকায় আচার্য জগদীশচন্দ্রেব কার্যকলাপ ও কথাবার্তার এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

আমেরিকায় অবস্থানকালে দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধপত্র ও টেলিগ্রামে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। নানা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সভা ও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতার জন্য তাঁহার এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল যে যদি প্রতিদিন দুইবার করিয়া বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত তবু এক বৎসরেও সে সমস্ত নিমন্ত্রণ বক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। জগদীশচন্দ্র মোটে কয়েক সপ্তাহ মাত্র আমেরিকায় ছিলেন।

নিউইয়র্কের বিজ্ঞান-পরিষদ বিজ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সমিতি ব্রুকলিনের কলা ও বিজ্ঞান মণ্ডলী ফিলাডেলফিয়ার দর্শনসভা এবং বিজ্ঞান-পরিষদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতি কতক একযোগে আহুত সভা প্রভৃতি নানা বিদ্বমণ্ডলীর সম্মুখে আচার্য জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি হার্ভার্ড কলম্বিয়া, আইওয়া, ইলিনয়, শিকাগো, মিশিগান ও উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অত্যাশ্চার্য আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিস্ময় পুলকিত করিয়া দেন।

যে সমস্ত বৃহৎ ও সমজদার শ্রোতৃমণ্ডলী আমেরিকার নানাস্থানে তাঁহার সংবর্ধনা করিয়াছেন ওয়াশিংটন শহরের কসমোপলিটন ক্লাবের নিমন্ত্রণে সমবেত জনমণ্ডলী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সে সভা আরম্ভ হইবার কথা ছিল সন্ধ্যা আটটায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব হইতেই প্রকাণ্ড সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, দাঁড়াইবার স্থান পর্যন্ত আর কোথাও রইল না। অনেক বড়-বড় লোকে জানালার ওপর চড়িলেন কিংবা মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। টেলিফোনের আবিষ্কর্তা ডক্টর গ্র্যাহাম বেল সভা বসিবার কুড়িমিনিট আগে আসিয়াছিলেন কিন্তু দরজার গোড়ায় লোকের এমন ভিড় জমিয়াছিল যে তিনি অতি কষ্টেসৃষ্টেও হলের অর্ধেকের বেশি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু অদম্য উৎসাহী টেলিফোনের আবিষ্কর্তা বেলের উৎসাহ ও আগ্রহ এতটুকুও কমিল না। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার গৃহে আচার্যের সম্মানার্থ ওয়াশিংটনের কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

আচার্য বসু মহাশয় মার্কিনবাসীর নিকট সর্বত্র আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। এমন কী যুক্তরাজ্যের স্টেট সেক্রেটারি বিখ্যাত কর্মী ও বাগ্মী উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান

ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার আবিষ্কার দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, এ সম্মান-সৌভাগ্য সকলের ঘটিয়া উঠে না। আচার্যবর যেখানেই তাঁহার বিচিত্রসরল যন্ত্রতন্ত্র লইয়া দেখা দিয়াছেন যেখানেই তাহার অদ্ভুত আবিষ্কার দেখাইয়াছেন, সেখানেই সকলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছে তিনি কত বড় বিজ্ঞানবিদ্, আজ আমেরিকার সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে এবং সম্ভবত মনস্তত্ত্বরাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা রাখে।

আচার্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে আমেরিকার অনেক মাসিকে এবং দৈনিকে বহু প্রবন্ধ, রহস্য-চিত্র, এবং এমনকী কবিতা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যখন নিউইয়র্কে যান তখন "নিউইয়র্ক টাইমস"-এ Song to Sensitive নামে তাহার আবিষ্কার সম্বন্ধে এক কবিতা বাহির হয়। "নিউইয়র্ক টাইমস" মার্কিন যুক্তরাজ্যের একখানি শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকা।

ইউরোপে জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা ও পারীতে বক্তৃতা করেন। পারী হইতে জার্মানি যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন এমন সময় যুদ্ধ বাধিল। কাজেই আর যাওয়া হইল না। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি লন্ডনে রয়েল ইনস্টিটিউট, ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স, রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন এবং অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে বক্তৃতা করেন।

ইংল্যান্ডে তাহার আবিষ্কার সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তিনি যখন লন্ডনে ছিলেন তখন, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সার আর্থার ব্যালফুর, রয়েল ইনস্টিটিউটের সভাপতি সার উইলিয়াম ক্রুকস্, অধ্যাপক জেমস মারে রাজবৈদ্য সার জেমস রিড, বিখ্যাত নাট্যকার বার্নাড শ', ভারত সচিব লর্ড ক্রু প্রভৃতি ইংরেজ মনীষীগণের নিকট তাঁহার গৃহ ও গবেষণাগার মুসলমানের নিকট মক্কাতীর্থের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

* * *

জগদীশচন্দ্র বাগ্মী নন এবং বাগ্মী হইবার জন্যও তাহার কোন আগ্রহ নাই। কিন্তু তাহার বক্তৃতা বেশ সুস্পষ্ট, জোরালো ও মনোজ্ঞ। তাহার বক্তৃতার ভঙ্গীটিও বড় সুন্দর। বক্তৃতাকালে তিনি একেবারে সভামঞ্চের প্রান্তভাগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসেন, তারপর বাম হাতখানি পশ্চাৎ দিকে নিবদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া থাকেন। সভা তখন একেবারে এমন নিস্তব্ধ যে সূচিপতনের শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়। আগ্রহান্বিত নরনারী তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কথাটি শুনিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথাবিহিত সম্বোধনের পর কোনওরূপ বাহুল্য ভূমিকা সৃষ্টি না করিয়া তিনি সোজাসুজি আপনার বক্তৃতা বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন। বাগ্মিতাসূচক কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গী তাহার নাই। অতি সাদাসিধাভাবে অতিশয় আন্তরিকতার সহিত মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনি আপনার আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা বলিয়া যান। রবার্ট বার্নস তাঁহার প্রাত্যাহিক নীরস কর্ম হইতে কবিতার সৃষ্টি করিতেন। আচার্য জগদীশও তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মধ্যে কাব্য নাটক ও মহাকাব্য রচনা করিয়া তুলেন। তাঁহার বিচিত্র আবিষ্কারের আনন্দে তিনি একেবারে আত্মহারা, তিনি যাহা বলেন তাহা পরিপূর্ণ অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করিয়া উঠে। সাধা গলা ব্যবসাদার বক্তার বোলচাল ও কলাকৌশলের অবকাশ তাহার নাই। কিন্তু

তবু শ্রোতারা এমন তন্ময় হইয়া তাহার কথা শুনিতে থাকেন যে করতালি দিতে পর্যন্ত ভুলিয়া যান।

মার্কিন সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা বসুমহাশয়কে লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষে সে বড় কঠিন ঠাঁই, তাঁহার ধরাছোঁয়া পাওয়া বড়ই শক্ত। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোনো কথা বাহির করা অপেক্ষা টোকিও, পেট্রোগাড কিংবা লন্ডনের দশ-পাঁচজন রাজনীতি ধুরন্ধরকে আটিয়া উঠা সহজসাধ্য। বসুমহাশয় লোকচক্ষুর দৃষ্টির সমক্ষে থাকিতে মোটেই ভালোবাসেন না। বিশেষত মার্কিন সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইতে তাঁহার বড়ই ভয়। যখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে খবরের কাগজের লোক তাঁহার নিকট হইতে কিছু কথা বাহির করিয়া কাগজে মস্ত একটা গল্প ফাঁদিবার চেষ্টায় তাহার পিছু লইয়াছে তখনই তিনি একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলেন। যদি তাঁহাকে কেহ এমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে যাহার উত্তর দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না, তাহা হইলে তিনি কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসেন। কিন্তু এমন সৌজন্যের সহিত এ কাজটি করেন যে কেহই তাহাতে অপরাধ লইতে পারেন না। আর বাস্তবিকই বসুমহাশয়কে এজন্য দোষ দেওয়া যাইতে পারে না---কেন না আমেরিকার সংবাদপত্রের ওপর আস্থা হারাইবার কারণ তাহার যথেষ্ট আছে। অল্পদিন পূর্বে ডেট্রয়েটের একখানি সংবাদপত্র আচার্যবরের Plant Response বা উদ্ভিদের সাড়া নামক গ্রন্থের এক অধ্যায় এমন বেমালুমভাবে প্রবন্ধাকারে ছাপাইয়া দিয়াছিল যে মনে হয় যেন সেটি ওই কাগজেরই জন্য বসুমহাশয় কর্তৃক বিশেষভাবে লিখিত।

জগদীশচন্দ্রের আকৃতিকে এমন একটা কী আছে যাহা সকলকে আকর্ষণ করে। কবির মতো তাঁহার ঈষৎশুভ্র ঘনকুঞ্চিত কেশরাশি প্রশস্ত ললাটের দুই পার্শ্বে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত। তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ জ্বলন্ত চক্ষুর দীপ্তিতে যেন সামান্য একটু গর্বের লেশ মাখানো। তাঁহার সুশ্রী ও ভাবব্যঞ্জকপূর্ণ মুখখানি উচ্চবংশজাত ধীমান ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল পুরুষের মতো। তাঁহার বক্ষ প্রশস্ত, স্কন্ধ বিস্তৃত, স্বাস্থ্য সুন্দর ও পাদবিক্ষেপ ধীর ও দৃঢ়। যদিও তাঁহার দেহে ও মুখে প্রৌঢ়তার চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তবুও তাহার কাজ করিবার শক্তি ও উৎসাহ যথেষ্ট আছে।

নেপোলিয়ান একবার ইংরেজ রাজনৈতিক ফক্স ও পিটের চরিত্র বর্ণনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ফক্সের হৃদয় তাহার প্রতিভাকে দীপ্ত রাখিয়াছিল, আর পিটের প্রতিভা তাহার হৃদয়কে শুকাইয়া ফেলিয়াছিল। আচার্য জগদীশের প্রতিভা পিটের মতো নয়, ফক্সের মতো। অসামান্য প্রতিভাশালী হইলেও তাঁহার হৃদয়খানি শুষ্ক নহে, পরন্তু মানবত, সহমর্মিতা ও প্রেম প্রবণতায় পূর্ণ। মানবের ভ্রাতৃত্ব তাহার নিকট কেবল একটা উচ্চভাবে কথামাত্র নয় সজীব ও সত্য আদর্শ, ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে মিশিয়া সুখীজনের সুখেতে হাসিয়া ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলিয়া আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করেন।

ভারতবর্ষ জগদীশচন্দ্রের অন্তরের ধ্যানমন্ত্র। যেখানে যতদূরেই তিনি থাকুন না কেন, ভারতের মঙ্গল চিন্তা তাহার চিত্তের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া থাকে। আর এই কারণেই বোধ হয় তিনি আমেরিকা প্রবাসী ভারতসন্তানগণের নিকট এত শ্রদ্ধা এত সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই তথাকার "হিন্দুস্থান সমিতি"

তাঁহার সংবর্ধনা করিয়াছে। তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছে। আচার্য জগদীশচন্দ্রও তাঁহাদিগকে বারংবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—'জীবনের একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ঠিক করিয়া যতদিন না সে আদর্শ বাস্তবে ও সত্যে পরিণত হয় ততদিন ক্রমাগত অবিরাম চেষ্টা করিতে থাক। ইচ্ছাশক্তি থাকিলে কিছুই অসম্ভব বা অসাধ্য নয়, দুঃখক্লেশ স্বীকার না করিয়া কখনও কোনও বড় কাজ হয় নাই। সুতরাং যদি বড় কিছু করিতে চাও তবে দুঃখকষ্ট নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিও ওই দুঃখ নির্যাতনের মধ্য দিয়া কৃতকার্য লাভ করাই তোমাদের গৌরব অধিকার। বড় হইবার সম্ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যেই সমানভাবে বর্তমান। প্রতিভার সুশৃঙ্খলার সহিত কঠোর পরিশ্রমে কাজ করিয়া যাওয়া ভিন্ন প্রতিভা আর কিছুই নহে। যদি ইচ্ছা কর তবে তুমিও প্রতিভাশালী হইতে পারো।'

বসুমহাশয় যখন কথা বলেন তখন খুব ধীরভাবে বলেন। কথায় জোর দিবার জন্য তিনি শূন্যে হাতও ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তাহার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটিয়া ওঠে।

ভারতীয় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—'স্বদেশের কোনো না কোনো একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করো, শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতে সাহায্য করো। জীবনটা নিতান্তই ছোট—কাজেই বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবকাশ বা অধিকার কাহারো নাই। মাধুর্যে, আলোকে ও কর্মনিষ্ঠতায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই তোমাদের আদর্শ হউক।'

আচার্য জগদীশচন্দ্র ধনী হইবার আকাঙ্খা করেন না। তাঁহার মতে অর্থ সঞ্চয় বা ব্যাবসাবাণিজ্যে কৃতকার্যতাই মানুষের শক্তির সত্য বা প্রকৃত পরিচয় নয়, পৃথিবীতে টাকা জিনিসটাকেই তিনি পরম বস্তু বলিয়া মনে করেন না। খেতাব পদবির প্রতিও তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, কোনোরূপ পুরস্কারের আশায় নয়। কোনো একটা বড় কাজ করিয়াই একথা ভাবিও না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে সেটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হইয়া উঠিবে এবং চারিদিকে তোমার জয়-জয়কার পড়িয়া যাইবে।

ভারতের একতা সমস্ত ভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার কথা কহিবার সময় জগদীশচন্দ্র যেন তাহার সমস্ত শক্তি মনীষা ও প্রাণ তাহাতে ঢলিয়া দেন। এ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য এই, সর্ব প্রথমে তোমার সাধনার বস্তু হউক খাঁটি ভারতসন্তান হওয়া। তাহার পর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ভারতবর্ষের একত্বকে ধারণা করিতে শিক্ষা করা। ভারতে এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক প্রদেশবাসী হইতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা বাঙালি থাকিবে না—থাকিবে কেবল ভারতবাসী।

একদিন কোনো ধনী বিকানীরবাসীর এক পুত্র আচার্য বসু মহাশয়ের Autograph বা হাতের লেখার জন্য তাহার হোটেলে দেখা করিতে যান। জগদীশচন্দ্র তাহাকে জানাইলেন যে তিনি সচরাচর তাহার হাতের লেখা কাহাকেও দেন না এবং দিলেও তার মূল্য খুব বেশি লইয়া থাকেন, এই কথা বলিয়া বণিক পুত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি আমায় কত দিবে? উত্তর আসিল আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দিব। যুবকের এই উত্তর

শুনিয়া জগদীশচন্দ্র কি করেন তাহা দেখিবার জন্য সকলে তাঁহার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন। আচার্যবরের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বিকানীর যুবককে সম্বোধন করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—'এই নাও আমার হাতের লেখা।'

আমাদের দেশের যুবকদের আমেরিকায় শিক্ষালাভ সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করাতে জগদীশচন্দ্র বলেন—'আমার মতে বি. এস. সি. পাশ না করিয়া আমাদের দেশের কোন ছাত্রেরই এ দেশে শিক্ষালাভের জন্য আসা উচিত নয়। ছাত্রদের চরিত্রও ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল দলে দলে জাহাজ বোঝাই করিয়া তাহাদিগকে এদেশে পাঠানো কোনও মতেই সমীচীন নয়। সংখ্যায় বেশি ছাত্র না পাঠাইয়া কয়েকজন বাছা-বাছা ভালো ছাত্র পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকার বিদ্যালয় ভালো কি ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ভালো, বসু মহাশয়কে এই প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন ইংরেজ ও মার্কিন দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই আমার ভালো লাগে। উভয়েরই সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে। তবে আমার মনে হয় আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থবল বেশি এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির বন্দোবস্ত আরও ভালো। মার্কিন যুক্তরাজ্যে অনেক মেধাবী অধ্যাপক আছেন। কিন্তু তাহাদের বড় বেশি খাটানো হয় বলিয়া বোধ হয়। অন্তত তাহারা তাহাদের ছাত্রদের অপেক্ষা বেশি পরিশ্রম করেন। আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ, কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষালয়গুলিতে প্রবেশ লাভ ইংল্যান্ডের অপেক্ষা অধিক। সহজসাধ্য। কিন্তু এই নূতন দেশের পশ্চাতে সূচির কালের সঞ্চিত ইতিহাস বা 'ট্রাডিসন' নাই।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পত্নী ও প্রাইভেট সেক্রেটারি আমেরিকায় আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী অতি রমনীয়া ও ধীরস্বভাবা মহিলা। যে সমুদয় ভারতবাসী বিদেশে বেড়াইতে আসেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন বিদেশি পরিচ্ছদ পরিধান করেন বসুজায়া তেমন করেন নাই। তিনি তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছিলেন। গোলাপি রঙের জ্যাকেটের উপর তাঁহার স্তরবিন্যস্ত জরিপাড় শাড়ি বড়ই সুশ্রী ও শোভন দেখায়। তাঁহার উন্নত ললাট সুন্দর ঘন কেশরাশিতে মণ্ডিত, তাঁহার চক্ষু দুটি এক অপূর্ব আলোকে পূর্ণ। বসুজায়ার জন্ম ও শিক্ষা যদিও ভারতবর্ষে তথাপি পাশ্চাত্যসমাজে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিয়া থাকেন।

আচার্য পত্নীর কথা কহিবার শক্তি বড়ই চমৎকার এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরটিও অতি মনোরম। ইউরোপ আমেরিকার ভিতরকার জীবনটির সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় যখনওই তিনি সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন, তখনই তাহা শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হয়।

পাশ্চাত্যসভ্যতার বাহিরের জাঁকজমক বসুজায়ার নয়ন ধাঁধিয়া দেয় নাই। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা অর্থের পূজায়, ভোগের লালসায়, খেতাবের আকাঙ্খায় উন্মত্তপ্রায় —সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। যেমন পূর্বদেশে তেমনি পশ্চিমদেশে জাতিভেদ। পশ্চিমের জাতিভেদ অর্থের ওপর, আর পূর্বের জাতিভেদ জন্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এই মাত্র যা তফাত। পশ্চিম যে পথে চলিয়াছে সে পথ বেশিদিন আর চলিতে পারিবে না। দু-দিন আগেই হৌক, দুদিন পরেই হৌক তাহাকে ফিরিতেই হইবে। তখন আর একবার তাহাকে পূর্ব জগতের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শ্রীমতী বসুজায়া ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য দেশকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না। তাঁহার মনে বিদ্বেষের লেশও নাই। এমন কী যে সমুদয়, সঙ্কীর্ণমনা ভারতপ্রত্যাগত খ্রিস্টিয় মিশনারি ভারতের মিথ্যা কুৎসা রচনা করিয়া বেড়ান তাহাদের প্রতি পর্যন্ত তাঁহার কোনো বিদ্বেষভাব নাই। তিনি তাঁহাদের কৃপানেত্রে দেখিয়া থাকেন এই পর্যন্ত।

ভারতনারী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা বসুজায়ার বড়ই মনোমতো। ওই বিষয়টি তাঁহার বিশেষ প্রিয়। গুজব এই, তিনি নাকি আমাদের দেশে প্রচলনের জন্য আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের স্ত্রীশিক্ষাবিধি বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের কার্যে সাহায্যের জন্য উইসকন্সিস বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মার্কিন মহিলাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

একদিন মধ্যাহ্ন আহারকালে আলোচনা প্রসঙ্গে ইউরোপিয় ও মার্কিন মেয়েদের কথা উঠিল। বসুজায়ার মতে ইউরোপের মেয়েদের অপেক্ষা আমেরিকার মেয়েরা বেশি স্বাধীনচেতা, উদারমনা ও চিত্তানন্দদায়িনী। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি ইউরোপিয় ও ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন? বিদ্যুতের মতো উত্তর আসিল—'কখনওই নয়। বিদেশিরা আমাদের সঙ্গে কোনো মতেই একীভূত হইতে কিংবা আমাদের আদর্শ ও সভ্যতার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের জীবনের ভিতরকার সৌন্দর্য পাশ্চাত্যদের চোখে পড়ে না। ভারতবাসী ও ইউরোপিদের মধ্যে বিবাহ কখনই সুখের হইতে পারে না, এবং এরূপ বিবাহকে কোনো মতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।'

এই কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্তা বলিলেন—'কেন আপনি তো মার্কিন মেয়েদের এইমাত্র খুব প্রশংসা করিতেছিলেন? তাহাদের সঙ্গে যদি—'

বসুজায়া হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু আপনাদের মার্কিন মেয়েরা বড় বাবু। দরিদ্র ভারতমাতা তাহার বিলাসিতার খরচ জোগাইবেন কি করিয়া?'

এই কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া গেলেন।

প্রবাসী, ১৩২২ *জ্যৈষ্ঠ*

জগদীশচন্দ্র বসু

অব্যক্ত

[প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩২৮ আশ্বিন]

জগদীশচন্দ্র ঃ সেরা রচনা সম্ভার—৫

কথারম্ভ

ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব, কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎতরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি-কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এ দেশে বৈজ্ঞানিক-আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফলে হয়তো এ জীবনে দেখিব না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু-একটি কাহিনি বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির **শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু**

১লা বৈশাখ, ১৩২৮

বিষয় সূচি

যুক্তকর	৬৯
আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ	৭১
গাছের কথা	৭৬
উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু	৭৮
মন্ত্রের সাধন	৮০
অদৃশ্য আলোক	৮৪
পলাতক তুফান	৯০
অগ্নি পরীক্ষা	৯৪
ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে	৯৮
বিজ্ঞানে সাহিত্য	১০২
নির্বাক জীবন	১০৯
নবীন ও প্রবীণ	১১৫
বোধন	১১৭
মনন ও করণ	১২৩
রানি-সন্দর্শন	১২৫
নিবেদন	১২৬
দীক্ষা	১৩৩
আহত উদ্ভিদ	১৩৪
স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ	১৪২
হাজির!	১৪৮

যুক্তকর

পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কীরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা জানা আবশ্যক। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাজার বৎসর পূর্বের জীবন্ত চিত্র এখনও অজন্তার গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পথ অনেক সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বহু বৎসর পূর্বে যখন অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন রাস্তাঘাট বিশেষ কিছুই ছিল না। রেল স্টেশন হইতে প্রায় একদিনের পথ। বাহন গরুর গাড়ি। অনেক কষ্টের পর অজন্তা পৌঁছিলাম। মাঝখানের পার্বত্য নদী পার হইয়া দেখিলাম, পর্বত খুদিয়া গুহাশ্রেণি নির্মিত হইয়াছে; ভিতরে কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা। গুহার প্রাচীর ও ছাদে চিত্রাবলী অঙ্কিত; তাহা সহস্রাধিক বৎসরেও ম্লান হয় নাই। দরবার চিত্রে দেখিলাম, পারস্য দেশ হইতে দূত রাজদর্শনে আসিয়াছে। অন্য স্থানে ভীষণ সমর চিত্র। তাহাতে একদিকে অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা নারীসৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। আর এক কোণে দেখিলাম, দুইখানা মেঘ দুই দিক হইতে আসিয়া প্রহত হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান বাষ্পরাশিতে মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরস্পরের সহিত ভীষণ রণে যুঝিতেছে। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে; এখনও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম ও অধর্ম। যখন সবিতা সপ্তঅশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পূর্বদিকে উত্থিত হইবেন, তখনই আঁধার পরাহত হইয়া পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইবে।

আর-একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধি জর্জরিত, শোকার্ত মানবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহাসংক্রমণের দিন।

অর্ধ-অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহামন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পর্বতগাত্রে প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। সুখ-দুঃখের অতীত শান্তির পথ তাঁহারই সাধনার ফলে উন্মুক্ত হইয়াছে।

সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোনো সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

ইহার কয় বৎসর পর কোনো সম্ভ্রান্ত জনভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি চিত্র ছিল; অন্যমনস্কভাবে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একখানা ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম। এই ছবি তো পূর্বে দেখিয়াছি—সেই গুহামন্দিরের প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি! চিত্রে আরও কিছু ছিল যাহা পূর্বে দেখি নাই। মূর্তির নীচেই একখানা পাথরের উপরে নিদ্রিত শিশু, নিকটেই

জননী ঊর্ধ্বোত্থিত যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। যিনি সমস্ত জীবের দুঃখভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই মায়ের দুঃখ দূর করিবেন। অমনি মানস-চক্ষে আর একটি দৃশ্য দেখিলাম। বোধিবৃক্ষতলে উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু গৌতম। দুস্থজন দেখিয়া সুজাতার মাতৃহৃদয় উথলিত। দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।

আমার পার্শ্বে একজন বিদেশি বলিলেন—দেখো, দেবতার মুখ কীরূপ নির্মম—একদিকে মাতার এত আগ্রহ, এত স্তুতি, কিন্তু দেবতার কেবল নিশ্চল দৃষ্টি! এই অবোধ নারী প্রস্তরমূর্তির মুখে কীরূপে করুণা দেখিতে পাইতেছেন?

তখন প্রকৃতির উপাসক জ্ঞানীদের কথা মনে হইল। এই অবোধ মাতা ও অজ্ঞাতবাদী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কি এতই প্রভেদ?

প্রকৃতিও কি ক্রূর নয়? তাহার অকাট্য অপরিবর্তনীয় লৌহের ন্যায় কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে কয়জনে মমতা দেখিতে পায়? অনন্ত শক্তি চক্র যখন উদ্ধতবেগে ধাবিত হয় তখন তাহা দ্বারা পেষিত জীবগণকে কে তুলিয়া লয়?

সকলে প্রকৃতির হৃদয়ে মাতৃস্নেহ দেখিতে পান না। আমরা যাহা দেখি তাহা তো আমাদের মনের প্রতিকৃতি মাত্র। যাহার উপর চক্ষু পড়ে তাহা কেবল উপলক্ষ। কেবল প্রশান্ত গভীর জলরাশিতেই প্রকৃত প্রতিবিম্ব দেখিলে দেখা যায়। এই বিত্রস্ত জলরাশির ন্যায় সদা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে কীরূপে নিশ্চল প্রতিমূর্তি বিম্বিত হইবে?

যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যাতাড়নে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাঁহার আজ্ঞাতেই জলধি শান্তিময়ী মূর্তি ধারণ করে। কে বলিবে ওই অবোধ মাতার হৃদয় এক শান্তিময় করস্পর্শে কমনীয় হয় নাই?

আমরা যাহা দেখিতে পাই না, পুত্রবাৎসল্যে অভিভূত ধ্যানশীলা জননী তাহা দেখিতে পান। তাঁহার নিকট ওই প্রস্তরমূর্তির পশ্চাতে স্নেহময়ী জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিভাষিত! দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইল যেন ঊর্ধ্ব হইতে অমৃত ক্ষীরধারা পতিত হইয়া মাতা ও সন্তানকে শুভ্র ও পবিত্র করিয়াছে।

অনেক সময়ে এক অপূর্ণতা আসিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সজীবতা অপহরণ করে। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত দৃশ্য অসামঞ্জস্যহেতু অশান্তিপূর্ণ হয়; অথচ আলো ও অন্ধকারের সমাবেশ ভিন্ন সুচিত্র হয় না। কেবল আলো কিংবা কেবল অন্ধকারে চিত্র অপরিস্ফুট থাকে। যে দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার ন্যায় জীবনচিত্র অনেক সময় সৌন্দর্যহীন হয়। ওই চিত্রের ন্যায় একটি শিশু কিংবা নারীর ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুতে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলো ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য দুঃখ তখন স্ব-স্ব নির্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত হইতে কিরণ-রেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ময় করে।

১৮৯৪

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ

দৃশ্য জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম লইয়া গঠিত। রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম, অথবা আকাশ।

পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্ষিত্যাকারে—অর্থাৎ কঠিনরূপে; দ্রবাকারে—অর্থাৎ অপ্‌রূপে; বায়বাকারে—অর্থাৎ মরুৎরূপে। জড় পদার্থ সর্বসময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে। এই মহাজগৎ ব্যোমে দোলায়মান রহিয়াছে। মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহারই বলে অসীম আকাশে বিশ্বজগৎ ভ্রমণ করিতেছে, উদ্ভূত হইতেছে এবং পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে।

সর্বাগ্রে দেখা যাউক, শক্তি কি প্রকারে স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়।

রেলের স্টেশনে সংকেত প্রেরণের দণ্ড সকলেই দেখিয়াছেন। একদিকে রজ্জু আকর্ষণ করিলে দুরস্থ কাষ্ঠখণ্ড সঞ্চালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারেও শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যায়; কলের আঘাতে জল তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতটে বারংবার আঘাত করে। এ স্থলে কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।

বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয। শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতও সচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুকম্পিত বৃক্ষপত্রে, জলবিন্দুপতনে, তরঙ্গাহত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর শ্রুতিগোচর হয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেন্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

কে মনে করিতে পারে যে, শতশত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহে বাহিরে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।

জড়পদার্থের কম্পন ও তজ্জনিত সুরের কথা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আকাশেও সর্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলিতাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ হয়, বিদ্যুত্তাড়নেও সেইরূপে আকাশে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময়ে শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্বসময়ে দেখিতে পাই না।

দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে, গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্তাড়িত হইবে, এবং তড়িদ্বলে চতুর্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে। তার ছোট করিলে, অর্থাৎ গোলক দুইটিকে ক্ষুদ্র করিলে, সুর উচ্চে উঠিবে। এইরূপ প্রতি মুহূর্তে সহস্র কম্পন হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটি, এবং তাহা হইতে কোটি কোটি কম্পন উৎপন্ন হইবে।

মনে কর, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পনসংখ্যা যতই বর্ধিত করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ-লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।

এক্ষণে বিদ্যুদ্বলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক; লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক। প্রতি সেকেন্ডে যখন কোটি-কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর আরও উচ্চে উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে-ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না।

তবে তো আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা! আমরা বধির ও অন্ধ! কি দেখিতে পাই, কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! দুই-একখানা ভগ্ন দিগ্‌দর্শনশলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।

পূর্বে বলিয়াছি, উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন ত্বক দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে বহুবিধ স্পন্দন আছে, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

হস্তী-দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অন্ধেরা একই জন্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছিল; শক্তি সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ কল্পনা করি।

কিয়ৎকাল পূর্বে আমরা চুম্বকশক্তি বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বকশক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপরশ্মি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিক কম্পনজনিত, ইহা অল্পদিন হইল প্রমাণিত হইয়াছে।

আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে, বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

সূর্য এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের ওপরে বায়ুমণ্ডল

৪৫ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তারপর শূন্য। দূরস্থ সূর্যের সহিত এই পৃথিবীর আপাতত কোনো যোগ দেখা যায় না।

অথচ সূর্যের বহ্নিময় সাগরে আবর্ত উত্থিত হইলে, এই পৃথিবী সেই সৌরোৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়—অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে।

সুতরাং যাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে। শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানারূপ ধরিতেছে। সূর্যকিরণেই বৃক্ষ বর্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশ-কম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারক অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্বের সূর্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথ্বীগর্ভে নিহিত আছে। আজ কয়লা হইতে সেই কিরণ নির্মুক্ত হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুদালোকে রাজবর্ত্ম আলোকিত করিতেছে। বাষ্পযান, অর্ণবপোত এই শক্তিতেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্যা একই শক্তিবলে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে ও বর্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব গতির মূলে সূর্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে; জীবনের স্রোত বহিতেছে।

আমাদের চক্ষুর আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইল। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বহুরূপী বিবিধ শক্তিশালী জগতের মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান। এক, আকাশ ও তাহার স্পন্দন; অপর, জড় বস্তু।

জড় পদার্থ বিবিধ আকারে দেখা যায়। এক সময়ে লৌহবৎ কঠিন, কখনও দ্রব, কখনও বায়বাকার, আবার কখনও বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে উড্ডীন অদৃশ্য বাষ্প আর প্রস্তরবৎ কঠিন তুষার একই পদার্থ; কিন্তু আকারে কত প্রভেদ!

গৃহমধ্যে নিশ্চল বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার অস্তিত্ব সহসা আমরা কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বায়ুরাশিতে আবর্ত উত্থিত হইলে উহা বিভিন্ন গুণ ধারণ করে। আবর্তময় অদৃশ্য বায়ুর কঠিন আঘাতে মুহূর্তমধ্যে গ্রাম জনপদ বিনষ্ট হইবার কথা সকলেই জানেন।

জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র। কোনো কালে আকাশ-সাগরে অজ্ঞাত মহাশক্তিবলে অগণ্য আবর্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হইল। উহাদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ, মহাজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশেরই আবর্ত জগৎরূপে আকাশ-সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে।

জার্মান কবি রিক্‌টার স্বপ্নরাজ্যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। দেবদূত কহিলেন, 'মানব, তুমি বিশ্ব-রচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস, মহাবিশ্ব দেখিবে।' মানব দেবস্পর্শে পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবদূতসহ অনন্ত আকাশপথ যাত্রা করিল! আকাশের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর ভেদ করিয়া তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সপ্তগ্রহ পশ্চাতে ফেলিয়া মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল। সূর্যের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত মহাপাবকশিখা তাহাদিগকে দগ্ধ করিল না। পরে সৌররাজ্য ত্যাগ

করিয়া সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণার গণনা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এই অসীম বিক্ষিপ্ত অগণ্য জগতের গণনা কল্পনারও অতীত। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে দৃষ্টিসীনা অতিক্রম করিয়া অগণ্য জগতের অনন্ত শ্রেণি! কোটি কোটি মহাসূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া কোটি কোটি গ্রহ ও তাহাদের চতুর্দিকে কোটি কোটি চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। উর্ধ্বহীন, অধোহীন, দিক্‌হীন অনন্ত! পরে এই মহাজগৎ অতিক্রম করিয়া আরও দূরস্থিত অচিন্ত্য জগৎ উদ্দেশে তাহারা চলিল। সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া কল্পনাতীত নূতন মহাবিশ্ব মুহূর্তে তাহাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগ্রগণ্য সমাবেশ দেখিয়া মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া কহিল, 'দেবদূত! আমার প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দাও! এই দেহ অচেতন ধূলিকণায় মিশিয়া যাউক। অসহ্য এ অনন্তের ভার! এ জগতের শেষ কোথায়?

তখন দেবদূত কহিলেন, 'তোমার সম্মুখে অন্ত নাই; ইহাতেই কি তুমি অবসন্ন হইয়াছ? পশ্চাৎ ফিবিয়া দেখ, এ জগতের আরম্ভও নাই।'

শেষও নাই, আরম্ভও নাই।

মানুষের মন অসীমের ভার বহিতে পারে না। ধূলিকণা হইয়া কীরূপে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা মনে ধারণা করিব?

অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বিন্দুতে বৃহৎ জগৎ দেখা যায়। বিপর্যয় করিয়া দেখিলে জগৎ ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়; অণুবীক্ষণ বিপর্যয় করিয়া দেখ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া ক্ষুদ্র কণিকায় দৃষ্টি আবদ্ধ করো।

আমাদের চক্ষুর সমক্ষে জড়বস্তু মুহূর্তে মুহূর্তে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। অগ্নিদাহে মহানগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। তাহা বলিয়া একবিন্দুও বিনষ্ট হয় না। একই অণু কখনও মৃত্তিকাকারে, কখনও উদ্ভিদাকারে, কখনও মনুষ্যদেহে, পুনরায় কখনও অদৃশ্য বায়ুরূপে বর্তমান। কোনো বস্তুরই বিনাশ নাই।

শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান নদীস্রোত যেরূপ উপলখণ্ডকে বারবার ভাঙিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই স্রোত অপ্রতিহত গতিতেপ্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। সমুদ্রের এক স্থানে ভাঁটা হইলে অন্য স্থানে জোয়ার হয়। জোয়ার ভাঁটা উভয়ই এক কারণজাত; সমুদ্রের জল পরিমাণ সমানই রহিয়াছে। এক স্থানে যত হ্রাস হয়, অপর স্থানে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এইরূপ জেয়ার ভাঁটা—ক্ষয় বৃদ্ধি—তরঙ্গের ন্যায়, চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শক্তির তরঙ্গেও এইরূপ—ক্ষয় বৃদ্ধি, প্রত্যেক বস্তু এই তরঙ্গ দ্বারা সর্বদা আহত হইতেছে—উপলখণ্ড ভাঙিতেছে ও গড়িতেছে। শক্তিপ্রক্ষিপ্ত উর্মিমালার দ্বারাই জগৎ জীবন্ত রহিয়াছে।

এখন জড়-জগৎ ছাড়িয়া জীব-জগতে দৃষ্টিপাত করি। বসন্তের স্পর্শে নিদ্রিত পৃথিবী জাগরিত করিয়া, প্রান্তর বন আচ্ছন্ন করিয়া, উদ্ভিদ্-শিশু অন্ধকার হইতে মস্তক তুলিল।

দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রসূনিত। শরৎকাল আসিল, কোথায় সেই বসন্তের জীবনোচ্ছ্বাস? পুষ্প বৃন্তচ্যুত, জীর্ণপল্লব ভূপতিত, তরুদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত। জাগরণের পরেই নিদ্রা!

আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিল; শুষ্ক পুষ্পদলে আচ্ছাদিত, বীজে নিহিত, নিদ্রিত বৃক্ষ-শিশু পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বৃক্ষ, মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিন্দু হইতে বৃক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত।

সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্ত ব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

আর মনুষ্য? প্রথম জীবকণিকা মনুষ্যরূপে পরিণত হইবার পূর্বে কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। অসংখ্য বৎসরব্যাপী, বিভিন্ন শক্তিগঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব!

আজ সেই কীটাণুর বংশধর, দুর্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বল ধারণ করিতে চাহে। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আহরণ করিয়া স্বীয় রথে যোজনা করে। অজ্ঞান ও অন্ধ হইয়াও পৃথিবীর আদিম ইতিহাস উদ্ধার করিতে উৎসুক হয়। ঘনতিমিরাবৃত যবনিকা উত্তোলন করিয়া ভবিষ্যৎ দেখিবার প্রয়াসী হয়।

যদি কখনও সৃষ্ট জীবে দৈবশক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়, তবে ইহাই সেই দৈবশক্তি।

অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিংবা এই সসীম ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোন্‌টা অধিক বিস্ময়কর?

পূর্বে বলিয়াছি, এ জগতের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এজগতে ক্ষুদ্রও নাই, বৃহৎও নাই।

জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! একথা সর্ব সময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য হইতে এই বহুরূপী জগৎ ও তদ্‌বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। উর্ধ্বাভিমুখেই সৃষ্টির গতি। আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।

সাহিত্য ১৩০২ বৈশাখ

গাছের কথা

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনো দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সেসব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না, আবার ফুটিয়া যে দুই-চারটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো আধো ও ভাঙা ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল, বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়, খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পায়রায় কী-রকম ভাবে ডাকে?' বলিলেই ডাকিয়া দেখায়, তদ্‌ভিন্ন সুখে-দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে, মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ওই ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালোবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোনো কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালোবাসি বলিয়া। তোমরা, দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখি, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, এবং সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের

মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন *দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এসব কথা তোমাদিগকে বলিব।*

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো, এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়েচড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম, বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্‌না, তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোট, কোনোটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছ-পালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমূল ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম, হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক ওপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন রাত্রি দেশ দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের ওপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেকদিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে, ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন-কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে করো, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে করো, একটি বীজ সমস্ত দিন রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ভেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধূলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাইরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

মুকুল ১৩০২ আষাঢ়

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তার পর বর্ষার আরম্ভে দুই এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।' আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেরই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখো, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উলটা করিয়া ঝুকাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপর দিকে উঠিয়াছে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়।

গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেইসব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায়, ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট-ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এইসব মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না, তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখো। যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার ওপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখো, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছের যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহরণ করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই

মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফ‌্টিয়া উঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয়, গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে 'কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পারো, সেজন্য নানা রঙে ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালন পালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছুদিন পূর্বে সতেজ ছিল, তখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত, ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

মুকুল ১৩০২ ভাদ্র

সাধন

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবালকীটের দেহ পঞ্জরে নির্মিত হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞান দ্বারা যেসব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে,

তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে প্রথমে যাঁহারা কোনো নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেরূপ একটু-একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল-তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যাল্‌ভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙটা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, 'ব্যাঙ-নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?'

কি লাভ?—যেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস কত পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে—দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ির একদিক হইতে অন্যদিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি। এমন কী, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কী হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোনো বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এপর্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে যেমন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া, বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান এইজন্য অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। অ্যালুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হালকা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূল যাইতে পারে সেজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি স্ক্রু নির্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল।

যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোযার্জের সহধর্মিনী তখন জার্মান গভর্নমেন্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্মান গভর্নমেন্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখ কাহিনি শুনিয়া গভর্নমেন্ট দয়া করিয়া বেলুনটা পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুনির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোনোদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে, সুতরাং অন্তত নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে, ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু পাতলা করিলে হয়তো ২/৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না, বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না। যে সব কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। এসব কল দ্বারা বেলুনটিকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণে, বামে, উর্ধ্বে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জের অবর্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার সাধ্যমতো কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গুণিতেছিলেন। বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃত ব্যক্তির আশা ভরসা হয় এইবারে পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্মূল হইবে। কল চালানো হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যেসব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, স্বল্পকালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কোনোদিন হয়তো সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আটলান্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

ব্যোমযান গ্যাস ভরিয়া লঘু করিতে হয়, সুতরাং আকারে অতি বৃহৎ এবং নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পাখিরা কি সহজেই উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখির মতো উড়িতে পারিবে? বড় বড় পাখিগুলি কেমন দুই-চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে ওঠে, তাহার

পর পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখির মতো উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্মানি দেশে লিলিয়েন্‌থাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখির মতো আকাশ ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যাসাধন করিতে অনেক দিন লাগিবে। শিশু যেরূপ একটু-একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর তো উঠিবার সাধ্য থাকিবে না, মৃত্যু নিশ্চয়। এত বিপদ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানা প্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, যে দুইখানা পাখার পরিবর্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখা ব্যবহাব করা হয় তাহা হইলে হয়তো উড়িবার বেশি সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এইসব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য শেষ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্বের মতো দৃঢ় হইল না। তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবাব অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া ওপরের একখানা পাখা ভাঙিয়া দিল।

এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যে সব পরীক্ষা দ্বারা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক ল্যাঙলি পাখা সংযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে অতি হালকা একখানা এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্মকারেব শৈথিল্যবশত একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়াছিল। এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরামুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙলির মৃত্যু পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট উড়িবার-কল লইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যায় এবং আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

** মুকুল ১৩০৫ প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত।*

অদৃশ্য আলোক

সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে ঝংকার দিয়া উঠে। দেখা যায়, তার কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয় সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে তিনের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে—প্রথমত শব্দের উৎস ওই কম্পিত তার, দ্বিতীয়ত পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়ত শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দনে প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাটো করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিংবা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোনও শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়; অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ স্পন্দনেও সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক; আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুরমাত্র দেখিতে পাই। আকাশস্পন্দন প্রতি সেকেন্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে; কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনি রং দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির ঊর্ধ্বে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য তখন অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্মান অধ্যাপক হার্টজ সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঊর্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরলরেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতুফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে; কিন্তু বৃহদাকার আকাশের ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ ঊর্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশোর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ

মাত্র। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়। এক দিকে একটি খোলা নল; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়তো অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করা আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু নির্মিত একখানি পরদা আছে। তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সংকেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।

আলোর সাধারণ প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক, দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

১. ইহা সরলরেখায় ধাবিত হয়—

২. ধাতু-নির্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

৩. আলোর আঘাতে আণবিক পরির্বতন ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডেভেলপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।

৪. সব আলোর রঙ এক নহে; কোনো আলো লাল, কোনোটা পীত, কোনোটা সবুজ এবং কোনোটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রঙের পক্ষে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ।

৫. আলো বায়ু হইতে অন্য কোনো স্বচ্ছ পদার্থের ওপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৬. আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোনো শৃঙ্খলা নাই; উহা সর্বমুখী; অর্থা কখনও উর্ধ্বাধ, কখনও বা দক্ষিণে বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকজাতীয় পদার্থ দ্বারা আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ, এক্ষণে সেই পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমত, অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে একপাশে ধরিলে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রত্যাবর্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোকও যে আণবিক পরিবর্তন করে তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের· অনুভূতির দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই ধরিতে পারি; কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা অনেকেই ধরিতে পারেন না। তাঁহাবা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধবা যাইতে পারে, সে বিষয় পরে বলিব। এখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রমবিকাশ হইতেছে। বহু পূর্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সংকীর্ণ ছিল, তাহা অন্তত এক দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্য দিকেও কোনোদিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তখন তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রঙ সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোনো বিশেষ রঙ নাই, সূর্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জল স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম; অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় আছে। ইট-পাটকেল, যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম; সে দেশে জলাশয় হইতে মৎস্যেরা ডাঙায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের কার্যও যেন অনেকটা সেইরূপই অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছি; তাহাতে অভ্যস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটি বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে ভেদ করিয়া যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম; লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না; কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে; (২) কোনো পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলেও একই পদার্থের ভিতর দিয়া এক আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে, দুইটি আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষ্ণা মিটিত?

মৃত্তিকা-বর্তুল ও কাচ-বর্তুল

পূর্বে বলিয়াছি যে, আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন, তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজেব সম্মুখে যে ইষ্টকনির্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেবণ কবিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরকখণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তুবিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পবিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীনা-বাসনেব অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোনোদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয়, তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনেব মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবাব বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কাব হেতু চীনা বাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা বাসন সাজান রহিয়াছে। ইহার এমন কি মূল্য যে, এত যত্ন? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইতে চীনা বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে! সেদিন শৌখিন রমণীগণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান কবিয়া পেয়ালা পিরিচেব মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

সর্বমুখী ও একমুখী আলো

প্রদীপেব অথবা সূর্যেব আলো সর্বমুখী; অর্থাৎ স্পন্দন একবার ঊর্ধ্বাধঃ অন্যবার দক্ষিণে বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়; কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। কীরূপে তাহা হয় বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালেব গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বল শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বাবংবার অনুরোধ কবিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল; কিন্তু শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক ঠোঁট কাৎ কারিয়াও কোনও প্রকারেই পানীয় শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বাবা যেরূপে লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্‌টা মুখের বিভিন্নতা বুঝা যায়, সেইরূপ একমুখী আলোকের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্‌টা—ঊর্ধ্বাধঃ অথবা এপাশ ওপাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর, দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে—লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্‌টা জীব কচ্ছপ। সর্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ এই প্রকারের স্পন্দনসঞ্জাত। দুই প্রকারের জীবদিগকে বাছিবার সহজ উপায় সমুখে লোহার গরাদ খাড়াভাবে রাখিয়া দেওয়া। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই পার হইয়া যাইবে; কিন্তু চেপ্‌টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদখানাকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটি গরাদ অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে। দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে, তখন দ্বিতীয় গরাদটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয়, তাহা হইলে কোনো কোনো বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মতো সজ্জিত। বিলাতে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেবিল্, অর্থাৎ ব্রাড্‌শ ছিল, তাহাতে ১০ হাজার ট্রেনের সময়, রেল-ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। আমি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময় দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে এরূপ করিয়া ধরিলে উহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবামাত্র হাসির রোলে হল্ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথম প্রথম রহস্য বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড রেলি আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাড্‌শ-এর ভিতর দিয়া এ পর্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। কি করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শিখাইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে বইখানা ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একেবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলোমেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছ প্রবেশ করে, তথাপি বাহির হইবার সময় একবারে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসি মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্যকরী। এবিষয়ে জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। প্যারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই, তখন সমবেত ফরাসি পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লসিত, হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির ওপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার কোনো সন্দেহই রহিল না। বলাবাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।

যেসব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম তাহা হইতে দেখা যায় যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি একই, আমাদের দৃষ্টিশক্তির অস্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি।

তার-হীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-ঊর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানা প্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কনি তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতিসাধনে কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূর দেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশ-তরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের সুরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অহরাত্রি কথাবার্তা চলিতেছে। কান পাতিয়া তবে একবার শোনো। 'কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ?' উত্তব— 'সমুদ্র-গর্ভ, তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পিডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি, আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।' আবার এ কি? একেবারে লক্ষ-লক্ষ কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্য-কণ্ঠের কত মর্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যায়। ইহার মধ্যে কে একজন অবুঝের মতো বারবার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'কোথায় তুমি— কোথায় তুমি?' কোনো উত্তর আসিল না—সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপ দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের সুর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর, কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের বিবিধ স্টপ আঘাত করিতেছে। বামদিকের স্টপে আঘাত করাতে এক সেকেন্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুৎ-ঊর্মি ধাবিল্ল হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেন্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় স্টপ আঘাত করিল, এবার প্রতি সেকেন্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে উঠিবে; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোনো ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও ঊর্ধ্বে উঠুক, তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য আলোক এক সপ্তম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সুর আরও উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা, কতটুকুই বা দেখিতে

পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল-তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ. আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোর্তিময় হইয়া উঠিবে।

পলাতক তুফান

(বৈজ্ঞানিক রহস্য)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এবিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এপর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮এ সেপ্টেম্বব তারিখে কলিকাতাব ইংরেজি সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা হাওয়া আফিস ২৭এ সেপ্টেম্বর ঃ

"বঙ্গোপসাগবে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল ঃ

হাওয়া আপিস আলিপুব। "দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মন্ড-হারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

৩০এ তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল, তাহা অতি ভীতিজনক।

"আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামীকল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীতচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমস্তদিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্র রহিল না।

তার পরদিন হাওয়া আফিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্বপ্রধান ইংরেজি কাগজ লিখিলেন—এত দিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্ব্বৈ মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া হাওয়া আফিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দাও।

গভর্নমেন্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে হাওয়া আফিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড় সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গভর্নমেন্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।"

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাতত বহুবিধ চাপের নীচে আছে ঃ

১ম বায়ু		প্রতি বর্গইঞ্চে	১৫	পাউন্ড
২য় "	ম্যালেরিয়া	...	২০	...
৩য় "	পেটেন্ট ঔষধ	..	৩০	...
৪র্থ "	ইউনিভার্সিটি	...	৫০	..
৫ম "	ইন্‌কম ট্যাক্স	...	৮০	...
৬ষ্ঠ "	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	...	১	টন

বায়ুর ২/১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে চায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকাব দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গভর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আফিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না। একবার কোনো বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে; তাঁহার থিয়োরি এই যে কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কীরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ুর উৎপত্তি হয় নাই। কি করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা। যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনও প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থেব ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি সংখ্যা কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষ জাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূ-পৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ-কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই; কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল; কারণ রেডিয়ামের গুঁতো খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলাযন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন—সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?' আমার কন্যা

ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরলকেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, 'তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' দিয়াছি; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু-একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।"

'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এ দেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায়। এবং এ দেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অব-ধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তলে-কেশরী' নামে জগৎ বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোক-হিতার্থেই এই শুভসংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন-কী, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮এ তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, 'যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা ঊর্মি জাহাজের ওপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ

লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

"বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের ওপর তেলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এবিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের ওপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

ওপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর ব্যাতা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

অগ্নি পরীক্ষা

১৮১৪ খিস্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মার্কলি কাটমুণ্ডু আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনি নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাদুন হইতে কলুঙ্গা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে নেপাল রাজ্য চারি দিক হইতে একবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ সহস্র; তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্নমেন্ট ঊনত্রিংশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—প্রয়োজনও নাই।

অগ্নিদগ্ধ হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। মনুষ্যও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র- ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন ঊর্ণনাভ তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়, বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্ত প্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিনশত মাত্র। বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। অস্ত্রশস্ত্রেরও বিশেষ অভাব। কাহারও তীর, ধনুক ও খুড়কি, কাহারও বা পুরাতন বন্দুক—ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এতকাল যুদ্ধের

কোনও সম্ভাবনা ছিল না, এইজন্য সৈনিকেরা তাহাদের পুত্র-কলত্র লইয়া এক স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড়শত হইবে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বলভদ্র এই সংবাদ পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোনওপ্রকারে সংস্কাব করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ-সেনাপতি, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ লইয়া বিব্রত এবং সৈন্য ও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন। এমন সময়ে ইংরেজ-সেনাপতি মাউব্রি পঁয়ত্রিশ শত সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন।

যে যুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পারে; কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুযিক বলের প্রয়োজন।

দেখিতে দেখিতে ইংরেজ সৈন্য দুর্গের চারিদিক সেনাজালে আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সুদিনে কলুঙ্গার সৈন্যাধ্যক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন দুর্দিন উপস্থিত। আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে।

২৫ অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ দূত বলভদ্রের নিকট যুদ্ধপত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমনসময় ইংরেজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, 'এই অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে; গোরক্ষ সেনাপতির বিনা রক্তপাতে দুর্গাধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।' উত্তরে গোরক্ষ সেনাপতি ইংরেজ দূতকে বলিলেন, 'তোমাদের সুবাদারকে বলিও, আগামীকল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন।'

পরদিন, প্রত্যুষে কামানের গোলা এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল। চতুর্দিকে কামানের অগ্নির ধূম অপসারিত হইবার পূর্বেই ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তরস্তূপের পশ্চাতে এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা কামানের গোলা ভেদ করিতে পারে না। সেই মানসিক মহাশক্তি আজ চকিতে দেখা দিল এবং সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার হৃদয়ে নহে---দুর্বল নাবী ও নিরুপায় শিশুকেও সেই মহা অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরেজ সৈন্য পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইল। পরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করিল।

তাহার পর জেনারেল গিলেস্পি দুর্গ ভগ্ন কবিবার উপযোগী নূতন কামান এবং নূতন সৈন্যদল লইয়া মাউব্রির সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল, সৈন্যদল এক সময়ে চারিদিক হইতে দূর্গ আক্রমণ করিবে এবং কামানের গোলাতে দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে।

২৬ তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ আরদ্ধ হইল; কিন্তু অল্প সময়েই ইংরেজ-সৈন্য পরাহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং নূতন তিন দল সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একেবারে বহুসংখ্যক কামান অগ্নি উদ্‌গীরণ করিয়া দুর্গে অনলপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, এই ঝটিকায় তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ খসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষ-সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন

লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্নস্থানে মুহূর্তমধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারীদেহে রচিত। গোরক্ষ-রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্নস্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় দেহ দ্বারা কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রক্তমাংসে গঠিন জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গ প্রাচীর নির্মিত হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে—এই দুর্বল কষ্ট-অসহিষ্ণু দেহ বজ্রবৎ কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সৈন্য তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল; ইংরেজ-সৈন্যের ভগ্নাবশেষ দেরাদুন প্রত্যাবর্তন করিল।

ইহার পর দিল্লি হইতে নূতন সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান যুদ্ধস্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নভেম্বর তারিখে এই নূতন সৈন্যদল পুনরায় কলুঙ্গা আক্রমণ করিল।

এবারে কামান হইতে গোলাপূর্ণ শেল অনবরত দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ভূমিস্পর্শমাত্র এই শেল ভীষণ রবে শতধা বিদীর্ণ হইয়া চর্তুদিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। এতদিন যোদ্ধায় যোদ্ধায় প্রতিযোগিতা চলিতেছিল; কিন্তু এখন মৃত্যু সর্বগ্রাসীরূপে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না।

একমাসের অধিককাল কলুঙ্গার অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আহার্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষ প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধারা অবিচলিতচিত্ত। মুমূর্ষু শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগরোর্মির ন্যায় ইংরেজ সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু গোরক্ষ-সৈন্য অমানুষিক শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ ফুরাইলে তীর-ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তর নিক্ষেপে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। দুর্গাধিকারের কোনো আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ-সৈন্য দেরাদুনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কলুঙ্গার দুর্গে পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরে এক নির্ঝরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে জল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ করিতে পারিলেই তৃষ্ণাতুর শত্রু নিরুপায় হইয়া পরাভূত হইবে।

নির্ঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল। ইহার পর দুর্গমধ্যে যে ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তাহা কল্পনারও অতীত—আহত ও মুমূর্ষু নরনারী এবং শিশুর 'জল জল' এই আর্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইল!

এদিকে ইংরেজরা শত্রুকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহ-শিশুদিগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গের চতুর্দিকে সৈন্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহির্গমন-পথে বহুসংখ্যক সৈন্য সন্নিবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল।

গোরক্ষ সৈন্যের সংখ্যা প্রথমে তিনশত ছিল, মাসাধিক কাল যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারিদিন পর্যন্ত ইহাদের কেহ একবিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা

নীরবে সহ্য করিয়াছে—তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্তনাদ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তারবারি শত্রুর পদে স্থাপন প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে কোনো উপায় নাই—জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে? সম্মুখে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে সংকীর্ণ হইতেছে। সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিত বর্ণ কামানের বিকট মূর্তি দেখা যাইতেছ। এই জালে কি আবদ্ধ হইতে হইবে? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিমা ক্ষণিকের জন্য গাঢ়তর করিবে? তবে তাহাই হউক!

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল। আত্মবলিদানে উন্মুক্ত সেই সত্তরটি বীর—মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়—অগণিত শত্রুদলের উপর পতিত হইল এবং অসির আঘাতে পথ কাটিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইল।

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ সৈন্য যোদ্ধ-পরিত্যক্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল। এই কি দুর্গ? না শ্মশান? এই শব—কবন্ধমণ্ডিত ভূমিতে কী প্রকারে মানুষ এতদিন বাস করিয়াছে? আহত, জীবিত ও মৃতের কী ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মুখে সুবাদারের মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাঁদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে একটি স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়া গিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্তপদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে—এস্থানে শেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটি শিশু রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—এখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুর্দিকে কেবল 'জল জল' এই কাতর ধ্বনি!

বলভদ্র সত্তরটি সঙ্গী লইয়া যোঁতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল; কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তারপর বলভদ্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া যতক দুগের আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাঁহার তরবারির আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গীদের সহিত রণজিৎ সিংহের শিখ-সৈন্যে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে রণজিৎ সিংহ আফগান যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাঁহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটি সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টি সেনা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের সময় পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। আজ এই শেষবার সুবাদার ও সিপাহি এক শ্রেণি হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে কামান গর্জন করিতেছিল। এক-এক বার সেই জীমূত-নাদ পর্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—সেইসঙ্গে শ্রেণির মধ্যে এক একটি স্থান শূন্য হইতে লাগিল; কিন্তু শ্রেণি টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সত্তরটি শবদেহ অনন্তশয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ধরায় পতিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

ইংরেজ সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল। এখন পূর্ব দুর্গস্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্তূপ দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ যুদ্ধের লীলাভূমিতে এখন গভীর নির্জনতা বিরাজিত। মৃত্যুর

এপারেই ঝটিকা, পরপারে চিরশান্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধহয় কোনো শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া জেতৃগণের বীরহৃদয়ে করুণ রস সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

যে স্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধূলি একত্র মিশ্রিত হইতেছিল সেই স্থানে ইংরেজ দুইটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। একটি প্রস্তরফলকে জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা যুদ্ধে হত ইংরেজ-সৈন্যের স্মরণার্থে স্থাপিত; ইহার অদূরে দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে ঃ

আমাদের বীরশত্রু কলুঙ্গা-দুর্গাধিপতি বলভদ্র
এবং তাঁহার অধীনস্থ বীর সেনা
যাঁহারা রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন
এবং
আফগান কামানের সম্মুখীন
হইয়া
একে-একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—
সেই বীরগণের স্মরণার্থে
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।

** দাসী ১৮৯৫ মে*

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত! যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত "মহাদেবের জটা হইতে।" তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব কথা শুনিতাম "মহাদেবের জটা হইতে"।

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত

হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে তো আর ফিরে না; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাহের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে-যাইতে কূর্মাচল নামক পুরাণ প্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিবহন লঙঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে-চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহ দ্বারা পশ্চাদের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, 'এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদেব দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।'

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!'

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়--মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে।

ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।[১]

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ, সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, 'সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে। উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার নদী দেখিতে পাইবে।'

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত একদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে-স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখানি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণি, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগদেশ পর্যন্ত উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তব ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শতশত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম— সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেইসঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

---

১) কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্রপ্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণি দেখিতেছি, হিমানুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, 'আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।'

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্যা অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না, পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সারিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশে অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জলপদের মধ্যে দিয়া সাগরোদ্দেশ প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয় কুলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদীতট উল্লঙঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারুণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা বলে পর্বত শিখরাখিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই!

এখনও ভাগীরথী তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

'মহাদেবের জটা হইতে।'

দাসী ১৮৯৫ এপ্রিল

বিজ্ঞানে সাহিত্য*

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিংবা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সংকোচ। আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙালির যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোনো ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোনও সুন্দর অলংকার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য সম্মিলন যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। যেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পযন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বস্তুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমবা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই এই ঐক্যবোধ কাজ করিযাছে। আমবা এই সম্মিলনেব প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সংকীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু, আমবা তাহাব অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলত জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পবিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমবা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কাবণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য সম্মিলন সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পাবে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমাব আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অপরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা কবেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবেব দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে

পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ্য উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ্, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন-ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে সচেতনকে তাঁহারা অলঙঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না,। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্যে প্রতিদিনই দেখিতে পাই, জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্ত্যনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণস্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রঙ তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য-আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্ত্যনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানির অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কীরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ-বতুর্ল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎ-বতুর্ল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে; তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদে রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ, বাহিরের আঘাতে, দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক

সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোনো সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানত এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয়, কোনো প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চিৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোনও প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্যে কোনো উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক লিপি-সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মতো—অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানস-সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করানো, দ্বিতীয়ত, গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক

সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি --সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূঁচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং অ্যাসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোনো মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ্‌ করিতে পারেন।

'যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ কবিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার কবা যাইতে পারিত।' কিন্তু এই কথা তো দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত করিতে চাহি তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আবদার এবং ক্রন্দনধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট, পরীক্ষাগারেব অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণ সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পবের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিযা কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কব, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সে-ই আমাদেব প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদেব কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগাব আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পবীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনও কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইযা ওঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলেন। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে-মুহূর্তে নির্ণীত হইবে, তাহার স্বতস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে, এক সেকেন্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে-কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এই এদেশে আমাদের কারিগর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, ‘‘বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া।’’ কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি; কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙালি-চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে

তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদেব মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনও চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোনো বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্যপরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান! ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার কবিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

প্রবাসী ১৩৯৮ বৈশাখ

নির্বাক জীবন

ঘর হইতে বাহির হইলেই চারিদিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ। শীত ও গ্রীষ্ম, মলয় সমীর ও ঝটিকা, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আলো ও আঁধার এই নির্বাক জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত ও কত প্রকারের আভ্যন্তরিক সাড়া এই স্থির, এই নিশ্চলবৎ জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে! কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটি বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিংবা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তাহার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনোরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনাপ্রবাহ কীরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহগতি বৃদ্ধি হয়? কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্তন কোনো প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশি আছে, উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেই নির্বাণ মুহূর্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্তে কি বৃক্ষ কোনো একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধাব হইবে।

তরুলিপি

জীব কোনোরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সংকোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া বৃহৎ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়। বৃক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সংকুচিত হয়; কিন্তু সেই সংকোচন স্বল্প বলিয়া সচরাচর দেখতে পাই না। কলের সাহায্যে সেই স্বল্প আকুঞ্চন বৃহদাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। ইহার বাধা এই যে, বৃক্ষের আকুঞ্চনশক্তি অতি ক্ষীণ এবং সাড়া লিখিত হইবার সময় লেখনী ফলকের ঘর্ষণে থামিয়া যায়। এই বাধা দূর করিবার জন্য 'সমতাল' যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদি দুই বিভিন্ন বেহালার তার একই সুরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝংকার দিয়া থাকে। তরুলিপি-যন্ত্রে লেখনী লৌহ তার নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত এক সুরে বাঁধা। মনে কর, দুইটি তারই প্রতি সেকেন্ডে একশত বার কম্পিত হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশত বার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত করিবে। এইরূপে ফলকের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের বাধা দূরীভূত হয়। ইহা ব্যতীত সাড়ালিপিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয়; কারণ এক বিন্দু ও পরবর্তী বিন্দুর মধ্যে এক সেকেণ্ডেব শতাংশের ব্যবধান।

গাছ লাজুক কি অ-লাজুক

পরীক্ষার ফল বর্ণনা করিবার পূর্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অ-লাজুক, সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূব করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয় তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখানো যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছ কেন দেয় না? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশিব সংকোচন দ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দিই। উভয় দিকের মাংসপেশিই যদি সংকুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দিকের পেশি আহত হইয়া সমভাবে সংকুচিত হয়; তাহার ফলে কোনো দিকেই নড়া হয় না। কিন্তু এক দিকের পেশি যদি ক্লোরোফর্ম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তিও সহজেই প্রমাণিত হয়।

অননুভূতি কাল নিরূপণ

জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে তার ন্যূনাধিক সেকেন্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। ইংরেজি ভাষ্যে, এই সময়টুকু 'লেটেন্ট পিরিয়ড্'। 'অননুভূতি-সময়' ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি-কালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে বেশি সময়েব অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহাব অনুভূতি কাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখনও অনুভূতি করিবার পূর্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমনকী সে সময়ে কখনও কখনও একেবারেই অনুভবশক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতি-কাল সেকেন্ডের শতাংশের ছয় ভাগ—উদ্যমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশি। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কি না, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অননুভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছেব প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগে। তাহার পূর্বে আঘাত করিলে অননুভূতি-সময় প্রায় দেড় গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতি শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কীরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা

সময়ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। সকালবেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতাজনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকালবেলা এসব উলটা হইয়া যায়;

ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পনেরো মিনিটে সারিয়া যায় তাহা সারিতে শীতকালে আর ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষে উত্তেজনা প্রবাহ

জন্তুদেহে এক স্থানে আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমত স্নায়বীয় বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎপ্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্য স্থানে অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোনো অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোনো সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে, ভেকদেহের তুলনায় মন্থর; কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। প্রাণী ও উদ্ভিদে নয় ডিগ্রি উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের আরম্ভকালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থানে উত্তেজিত, অন্য স্থল অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা জীব ও উদ্ভিদে যে এ সম্বন্ধে কোনো ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

স্বতঃস্পন্দন

জীবদেহে অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ বেশি আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোনও ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধান ফলে সম্ভবত জীবস্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত

ব্যাঙটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে, এজন্য তাঁহারা হৃদযটিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কী কী অবস্থায় হৃদয গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয।

হৃদয কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দনী বন্ধ হইবার উপক্রম হয। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুন্ন গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয, কিন্তু ঢেউগুলি খর্বকায হয। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভেষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয। ইহার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায। ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে কোনো, বিষে হৃদয়স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয। এইরূপ পরস্পর বিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের ক্রিয়া ক্ষয হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কযটি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিলাম। গাছেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া কোনো কোনো উদ্ভিদপেশিও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইযাছি।

বনচাঁড়ালের নৃত্য

বনচাড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয। গাছের স গীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোনো সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিযমিত তাহা নিশ্চযরূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমত পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায আরম্ভ হয এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তাহার পর দেখা যায যে, উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয। ক্লোরোফর্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদয নিস্পন্দিত হয, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোনো উদ্ভিদ পেশিতে আঘাত করিলে সেই মুহূর্তে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া যায না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে, উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয করিয়া রাখে, যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন

সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠান্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছের অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া ওঠে; কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা উত্তেজনার কাঙাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন্ পথে—কামরাঙা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

মৃত্যুর সাড়া

পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এমন সময় আইসে যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দেওয়ার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তেব জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়—ঊর্ধ্বগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীব মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণ ১৩২৩ ভাদ্র ২০

নবীন ও প্রবীণ

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা দেখা যায় এই যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহতের সন্ধান করিয়াছে। অন্য দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথায় সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ; তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অন্বেষণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্যের মধ্যে এই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্যের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্বে একজন বিজ্ঞানসেবীকে তাঁহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, তাহা অন্য দিন বলিব। তৎপূর্বে পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব। যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। একদিকে সময়াভাব ও ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্যদিকে পরিষদে কোনো কার্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন আপনারা আমাকে মুক্তি দেন নাই তখন স্থির করিলাম, সাহিত্য পরিষদের জন্য যথাসাধ্য কার্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু সে-ই মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে; যে জীবিত তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে এই বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না; বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে। ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

আরও ভাবিবার বিষয় আছে। যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পঙ্গুপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষদকে কীরূপে রক্ষা করা যায়? এবং সেইসব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য---সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কীরূপে সাধিত হইতে পারে?

দলাদলি

জীবনের বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে, হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয়, তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে সাহিত্য পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয় সেজন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোনো সাহিত্য-সমিতিকে খর্ব করিয়া নিজেরা বড় হইবাব প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সদস্যদিগের উদ্যমের উপর পবিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুল পরিমাণ নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে লিখিযাছিলাম—'পবিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সভা সাহিত্যপরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ মাত্র!' আরও লিখিয়াছিলাম যে, 'সদস্যগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যশীল সভ্য নির্বাচিত করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্য ভবিষ্যৎ-দুর্গতির কারণ হইবে।' এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি শ্রেয় হইবে? তথায় প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অন্য পক্ষও জবাবে এক কাঠি উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিত্তবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকশিত হয় তাহা কি এইরূপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে?

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদের প্রধান কারণ নহে? ব্যক্তিবিশেষের আত্মম্ভরিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ; ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও নিজস্ব নহে। প্রবীন অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বার্ধক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে, সে তো চিরনবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অন্য দিকে নবীন, অভিজ্ঞতা অভাবে হয়তো অতি দ্রুত চলিতে চাহেন এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখেন না। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া কোনো অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয়তো কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অর্জিত ধন নবীন বিনা দ্বিধায় নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চায়; প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এতদিনের চেষ্টা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। যে দেশে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীন ও প্রবীণের কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য

সাবিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি একথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য সাধারণ সদস্যগণের নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা পবিচালিত হয়। তাহারই সাধারণের প্রতিভূ হইয়া আসেন; তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাই প্রতি বিষয় নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয় তজ্জন্য যদি কেহ পরিষদের সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন, তবে সেটা ছেলেদের আবদার ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা--অতীতের ত্রুটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোনো নূতন প্রচেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

এ সব যে ত্রুটির কথা বলিলাম, তাহা একান্ত সাময়িক। বাদানুবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাহার অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই, তাঁহাদের মধ্যে কী কী বিষয় লইয়া বিসংবাদ, তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদেব প্রকৃত কারণ কিছু নাই বলিলেই হয়।

পরিষদ-গৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়েব কথা উত্থাপন করিলাম তাহা কার্য করিবার উপলক্ষ মাত্র। সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পাবিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদর্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবাব জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পবিদর্শন করিতে আসেন; সেই কমিশনেব বিদেশিয় সভ্যগণ ইহার কার্য লক্ষ্য কবিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পবিস্ফুটনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদেব এই সাহিত্যপরিষদকে আদর্শ কবিয়া তথায় অন্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হইতেছে। এ সবই তো আমার কথা--আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে? সম্মুখে যে ভয়ংকব দুর্দিন আসিতেছে তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্যন্ত সংকটাপন্ন। দুর্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব? যে দুই একটি আমার কথা আছে, তাহার মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ অন্যতম। আমাদের অবহেলায় এই ক্ষীণ প্রদীপটি কি নিবিয়া যাইবে?

** ১৯১৮ খ্রিঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেব সভাপতিবভাষণ*

বোধন

শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালন পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তপুরে আসিয়া

মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিলতিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্তে তেজস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি, আমার তেজস্বিনী বংশ-জননীর মতো। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে তাড়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কালহরণ কবিতে দেন নাই; কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢস্বরে বলিয়াছেন 'পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্মক্ষেত্রে যখন যশঃ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।' মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বহু বাঙালি ভারতের বহু স্থানে গমন করিয়া কর্ম, যশঃ ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন। এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্বলের নহে। আমার পূজা হয়তো তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী, তোমারই আশীর্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভাবতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহূত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন নিয়মে আমাদের দেশে কোনো এক সংকীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয়, সেই নিয়মেই লোকালয় হইতে দূরে পরীক্ষাগারে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যম করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় শিক্ষা দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজনসুলভ মান অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

জীবনসংগ্রাম

জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্বল নির্মূল হয়, এ কথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে; এখন দেখিতেছি, বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্তমান দুরাবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর

এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে, দেশি শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এ সব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোনও তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোনো সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।

বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এইসব বিপদ একেবারে অনিবার্য নয়, কিন্তু এ আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এইসব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে; আর কোনো কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সহজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্বসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকথা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্ধারণ। এসব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা স্থাপন। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলার স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়া চিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী ইত্যাদি গ্রামাহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাঁহাদের দেশ পরিচর্যাবৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।

লোকসেবা

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেস্ড্ মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ি ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বন্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণির প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য

অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বন্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করো। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণিরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই, কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির বেদনা নিহিত আছে।

শিল্পোদ্ধার

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক অন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সরকারি একজন ডিরেক্টার নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টার মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতাপুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, ভারতবাসী ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোনো স্থান নাই। জাপানি কিন্তু ওই অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের ওপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' এ কথা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশি শিল্পের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহুদিনের চেষ্টার পর তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের ব্যবসায় যে স্থায়ী হইবে তাহার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ পর্যন্ত তাঁহারা একজনও কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরানিবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসায় শিক্ষার সময় আপিসে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কায স্বহস্তে করিয়া সম্যক শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পেতেই লোকের মান ক্ষয় হয়। এমন কী আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোনো কার্য হীন জ্ঞান করে নাই। এমনকী, দারোয়ানি করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষলাভ করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশির বাহ্য ধরণ ধারণ অবলম্বন করে। তখন তাহাদের পক্ষে অনেক কার্য অপমানকর মনে হয়।

এসব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে,

সেখানে আমাদের সম্বন্ধে দু-একটি আমোদজনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙালি বাবুদের জন্য তাহাদিগকে হুকার কল্কে প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, এখন হইতে এশিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে। আমাদের দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলে কোনোদিন কি শিল্পে সার্থকতা লাভ করিতে পারিব?

মানসিক শক্তির বিকাশ

শিল্পের উন্নতির আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমতো কারখানা এ দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোনও প্রকারে কার্যকরী হয় তাহা হইলেও অতদিনে পূর্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। কোনোদিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখো, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে, এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রে থাকিবে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দু রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাতে ও আমাতে যে কোনো পার্থক্য নাই, ইহা কেবল

ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবে না?

ভয় করিতেছে কি, সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ঠ লাভ করিতে পারিবে না? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপন করিতে পার না? হয় জয় কিংবা পরাজয়!

বিফলতা

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোনো—ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোনো উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধাব জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুবে লোন আফিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনি আসামে স্বদেশি চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়তো এ কথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোনো সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হে বঙ্গবাসী, বর্তমান দুর্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখ। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে না? তুমি কি বুঝিতে পারো না যে, অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুণ সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মতো প্রবাহিত রাখিতে আশা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবনের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতিমাতার এই আপাতক্রূর নির্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ণ ও দুর্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে? বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তোমার কী আছে, যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্খা

করো? বোধ হয় পূর্বপিতৃগণের অর্জিত পূণ্য এখনও কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চিত আছে; সেই পুণ্যবলেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্মপরম্পবায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুষগণ মানবের ক্লেশভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্বপিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যফল ও দেবতার আশীর্বাদ হইতে আমরা কি চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আববণ ভাঙিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়! ভাঙিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল করুক।

* *১৯১৫—বিক্রমপুব সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ*

মনন ও করণ

পূর্বে বাংলা মাসিকপত্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিযাছিলাম, তাহাতে বলিয়াছিলাম যে উদ্ভিদ-জীবন মানব-জীবনেরই ছাযা মাত্র। সেই প্রবন্ধটি লিখিতে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে নাই। কিন্তু সেই বিষয়টির কিয়দংশ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বহু বৎসর গিযাছে। অতি সামান্য দ্রব্য গঠন করিতে অনেক চেষ্টা, অনেক অধ্যবসায়, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক কলকারখানার আবশ্যক। কিন্তু মন কোনো বাঁধন মানে না। উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা নিমেষে স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসে। মুহূর্তে স্বকল্পিত সত্য-মিথ্যা মিথ্যা ঘটিত নূতন রাজ্য সৃজন করে এবং সে রাজ্য স্থাপনে যদি কেহ বাধা দেয় তাহা হইলে মানস-সম্ভব অক্ষৌহিণী সৈন্য ও অগ্নিবাণ সাহায্যে বিপক্ষ নাশ করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করে।

কিন্তু কার্য-জগতের প্রথা অন্যরূপ; এখানে পদে পদে বাধা। সমস্ত জীবনের চেষ্টা দিয়াও নিজের জীবন শাসন করিতে পারিলাম না, ইহা জানিয়াও নিজের কর্তব্য ভুলিয়া পরের কর্তব্য নির্ধারণ করিবার বাসনা দূর হয় না। কঠিন পথ ত্যাগ করিয়া যাহা সহজ এবং যাহা কথা বলিয়াই নিঃশেযিত হয়, সেইদিকে ইচ্ছা স্বতঃই ধাবিত হয়।

মনন এবং করণ ইহার মধ্যে কত প্রভেদ! কার্যের গতি শম্বুকের গতি হইতেও মন্থর।

কর্ম-রাজ্যের কঠিন পথ দিয়া মন সহজে চলিতে চাহে না। এজন্য পথ-নির্দেশকের অভাব নাই; কিন্তু পথের যাত্রী কই এই ভবের বাজারে?

'সকল বিক্রেতা হেথা, ক্রেতা কেহ নাই।'

বঙ্গজননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র তাড়না করিলে কোনো ফল পাইব না, এ কথা বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যে প্রধানত বঙ্গ সন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদেব আত্মসম্মানবোধ জাগরণ আবশ্যক; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ-কেহ দুঃখ করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায়াতে প্রকৃষ্ট পথ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই মায়াবশেই বাঙালি বৈজ্ঞানিক স্বীয় আবিষ্কাব বিদেশি ভাষায় প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যদি এই সকল তত্ত্ব কেবল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশিরা অমূল্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাংলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মস্তক অবনত করিত।

ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যে কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশত এদেশের সুধী-শ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল্-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাংলা দেশে আবিষ্কৃত, বাংলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাংলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশি ডুবুরিগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশা মাত্র।

যে সকল বাধার কথা বলিলাম, তাহার পশ্চাতে যে কোনো এক অভিপ্রায় আছে তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি, সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মতো সমস্ত শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য-অন্বেষণ জীবনের সাধনা করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া গৌরব করা কর্তব্য মনে করি নাই; তাহাকে জয়ী করাই আমার লক্ষ্য ছিল। আজিকার দিনে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে প্রসারিত। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালির যেরূপ দুর্নাম ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারতবাসীদের সেইরূপ নিন্দা ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ-জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার পরিণাম হইবে। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি অভিভব স্বীকার করি নাই। তৃতীয়বাব পশ্চিম সমুদ্র পার হইলাম এবং বিধাতার বরে সার্থকতা লাভ করিতে পারিলাম। এই সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।

সত্য বটে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে-সকল অমর তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুই

চারিজন বিদেশি কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে কারণে প্রতীচ্য বর্তমান যুগের প্রাচ্যের নিকট মস্তক অবনত করিযাছে, এরূপ কোনো লক্ষণ দেখি না। গ্রিক এবং ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচীন মিশর-সভ্যতার নিকট বহু ঋণে ঋণী; কিন্তু সেই মিশর জাতির বংশধর ফেলাহীন আজ জগতে ঘৃণ্য। হে বেদ-উপনিষদ রচয়িতার বংশধর, হে ভারতীয় ফেলাহীন, আজ তোমার স্থান কোথায়?

হায় আলনস্কর, তোমার দিবাস্বপ্ন কি কোনওদিন ভাঙিবে না। তোমার পণ্যদ্রব্য শুধু গিল্টি ও কাচ। স্বর্ণ ও হীরক বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে করিয়াছিলে এবং অলীক ধনে আপনাকে ধনী মনে করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিলে! দর্শকগণের উপহাস এত অল্পদিনেই ভুলিয়াছ? কি বলিতেছ? তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনী ছিলেন, তাঁহারা পুষ্পকরথে বিমানে বিহার করিতেন! মূঢ়! তবে কি করিয়া সেই সম্পদ হারাইলে? চাহিয়া দেখো! দূরে যে ধবল পর্বত দেখিতেছ তাহা নরকঙ্কালে নির্মিত। তুমি যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিস্তূপ। দেখো, কাহারা সেই অস্থিনির্মিত সোপান বাহিয়া গিরিশৃঙ্গে উঠিয়াছে এবং শূন্যে ঝাঁপ দিয়া নীলাকাশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তাব করিয়াছে। উড্ডীয়মান শ্যেন-পক্ষীশ্রেণি বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। অবাক হইয়া তুমি ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছ। অকস্মাৎ মেঘরাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত বহ্নিশেল তোমার চতুর্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও নিস্তার নাই। বিষ-বাহক বাষ্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহিব হইতে হইবে।

কথার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে জাল বিস্তাব করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি। সে জাল কাটিয়া বাহির হইতে হইবে। মাতৃদেবীকে অযথা সভাস্থলে আনিয়া তাঁহার অবমাননা করিও না। হৃদয়-মন্দিরেই তাঁহার প্রকৃত পীঠস্থান; জীবন-উৎসর্গই তাঁহার পূজার উপকরণ।

রানি-সন্দর্শন

একদিন সম্মুখের গলির মোড়ে দেখিলাম, এক ভিক্ষুক বিকট অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া পথ-যাত্রীর করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা একেবারেই ভণ্ড; প্রতারণা করিয়া সকলকে ঠকাইতেছে বলিয়া আমার রাগ হইল। এই সময় সেখান দিয়া একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। তাহার পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভিক্ষুকের কান্না শুনিয়া স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার অঞ্চল-কোণে একটি মাত্র পয়সা বাঁধা ছিল; হয়তো তাহাই তাহার সর্বস্ব। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পয়সাটি ভিক্ষুককে দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনেই আমার প্রকৃত রানি-সন্দর্শন লাভ হইয়াছিল—মাতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী রানি! এইজন্যই তো বয়স নির্বিশেষে ছোট মেয়ে হইতে বর্ষীয়ান পর্যন্ত সকল নারীকেই আমরা মা বলিয়া সম্বোধন করি।

বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়। একবার ১০/১২ বৎসরের একটি ছেলে দেখিলাম।

শিশুকালে নেকড়ে-বাঘিনী তাহাকে লইয়া যায়। ক্ষুধার্ত শিশু বাঘিনীর স্তন্যপান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। সেই অবধি বাঘিনী স্বীয় শাবকের ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিল। কিন্তু শাবকদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সে অন্য মূর্তি ধরিয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল। মাতৃস্নেহে দুইটি রূপ দেখা যায়;—উভয়ই আশ্রিতের রক্ষা-হেতু। একটি মমতাপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংহাররূপিণী শক্তিময়ী।

নারীর হৃদয়ের যে সন্তান-স্নেহ উথলিত হইয়া সমস্ত দুস্থজনকে সন্তানজ্ঞানে আগুলিয়া রাখিবে তাহা আশ্চর্য নহে। এতদ্ব্যতীত নারী স্বতঃই অভিমানিনী; প্রিয়জনের অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে মর্মে-মর্মে বিদ্ধ করে। হে অভিমানিনী রমণী, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি যাহার গৌরবে গৌরবিনী, এ জগতে তাহার স্থান কোথায়? পৃথিবী হইতে শান্তি পলায়ন করিয়াছে, সম্মুখে ঘোর দুর্দিন। যাহার উপর তুমি নির্ভর করিয়া আছ, সে কি সেই দুর্দিনে তোমাকে ঘোরতর লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? বাক্য ছাড়া যে তাহার আর কোনও অস্ত্র নাই। কে তাহার বাহু সবল করিবে, হৃদয়ের শক্তি দুর্দম রাখিবে এবং মৃত্যুর বিভীষিকার অতীত করিবে? এ সকল শিক্ষা তো মাতৃ ক্রোড়েই হইয়া থাকে। কি তোমার দীক্ষা, যাহা দিয়া তুমি সন্তানকে মানুষ করিয়া গড়িবে? কৃচ্ছ্রসাধনা অথবা বিলাসিতা—ইহার কোন্ পথ তুমি গ্রহণ করিবে? রানি হইয়া জন্মিয়াছিলে, দাসী, হইয়াই কি তুমি মরিবে?

** ভারতবর্ষ ১৩২৮ আষাঢ়*

নিবেদন

বাইশ বৎসব পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক-সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা সেই ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে; তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্যে কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গ আঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া; তাহা অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা! তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর! জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইযাছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন্ কোন্ বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনোদিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্মানিতে আচার্য হার্টজ বিদ্যুৎ

তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোনো সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে কোনো মতবাদ প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমান কালের সর্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেই দিন যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃপুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যেব বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ আমার স্বীয় গণ্ডি ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার, পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহু বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনোদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিশ্বজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্যটন

ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম—উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সে দুর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য ভারত গর্ভনমেন্ট ১৯১৪ খিস্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোনো কোনো আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি, মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তো চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জুনের।

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি, যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্বসংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনোদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কী কোনো স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্যদেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে

এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন-অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা, কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে অনিয়াছে। আদেশের বলে জড়জগৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না; পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর-একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য-আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধিমাত্রায় পরিবর্তন, মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সংকুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশির স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষ শরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কী মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী সংগমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়;

আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসেব বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোনোদিন পরাঙমুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনোদিন একেবার বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই-এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশার কার্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতে দূরস্থানেও মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সংকল্প করিয়াছিলাম তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়তো দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোনো বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দিব হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়তো তদ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দেওয়ার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্খা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের

দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইয়ের সংযোগস্থলে বর্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবেব স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। তিল-তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিযা পড়িবে তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্ত্যনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তূষ্ণীভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কী করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড় সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশ-বিজয়ে কোনোদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম কল্য হইতে পুনরায় কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে

নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। তাঁহার পূজার উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্খা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

** বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাষণ। প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ*

দীক্ষা

আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি, দিন-দিন অগ্রসর হইতেছি এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'গাছের উপর যে পাখিটি বসিয়া আছে তাহার চক্ষুই লক্ষ্য! পাখিটি কি দেখিতে পাইতেছ?' অর্জুন উত্তর করিলেন, 'না, পাখি দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

তবে সেই লক্ষ্য কি? লক্ষ্য, শক্তি সঞ্চয় করা, যাহা দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনোরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেই-ই শক্তিমান্, সেই-ই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ ধরিবে?

এ জন্য কেবল অল্প কয়জনকেই আহ্বান করিতেছি। দুই-এক বৎসরের জন্য নহে; সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য। দেখিতেছ না ধূলিকণার ন্যায়, কীটের ন্যায় নিয়ত কত জীবন পেষিত হইতেছে। ভীষণ জীবনচক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ? স্বভাবের নির্মম ও কাণ্ডারীহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? কিন্তু তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল করো। হয়তো প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আহার উল্কাপিণ্ড, তাহার শিরায়-শিরায় গলিত ধাতুর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না; জীবনও হয়তো তবে অবিনশ্বর।

মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেহ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা মানুষ একই স্থানে উপনীত হয়। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ করো। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক। নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবনকে মহাহবে নিক্ষেপ করো।

** বসু বিজ্ঞানমন্দিরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।*

আহত উদ্ভিদ

পশ্চিমে কয় বৎসর যাবৎ আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি পৌঁছিত না। অপরিস্ফুট আর্তনাদ কামানের গর্জনে পরাহত। কিন্তু যেদিন হইতে শিখ ও পাঠান, গুরখা ও বাঙালি সেই মহারণে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে, সেদিন হইতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবনধারায় রক্তিম হইয়াছে, তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। কি এই আকর্ষণ, যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যাই? সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিকেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষকে আঘাত করিলে সে চিৎকার করে। তাহা হইতে মনে করি, সে বেদনা পাইয়াছে। বোবা চিৎকার করে না, কি করিয়া জানিব, সে বেদনা পাইয়াছে? সে ছটফট করে, তাহার হস্ত পদ আকুঞ্চিত হয়; দেখিয়া মনে হয়, সেও বেদনা পাইয়াছে। সমবেদনার দ্বারা তাহার কষ্ট অনুভব করি। ব্যাঙকে আঘাত করিলে সে চিৎকার করে না, কিন্তু ছটফট করে; তবে মানুষ ও ব্যাঙে যে অনেক প্রভেদ! ব্যাঙ বেদনা পাইল কি না, এ কথা কেবল অর্ন্তযামীই জানেন। সমবেদনা সতত ঊর্ধ্বমুখী, কখনও-কখনও সমতলগামী, ক্বচিৎ নিম্নগামী। ইতর লোকে যে আমাদের মতোই সুখ-দুঃখ, মান-অপমান বোধ করে, এ কথা কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। ইতর জীবের তো কথাই নাই। তবে ব্যাঙ আঘাত পাইয়া যে কিছু একটা অনুভব করে এবং সাড়া দেয়, এ কথা মানিয়া লইতেই হইবে। অনুভব করে, এই কথা, টের পায় এই অর্থে ব্যবহার করিব। মানুষ বেদনা পায়, ইতর জীব সাড়া দেয়, এই কথাতে কেহ কোনো আপত্তি করিবেন না। ব্যাঙের ছট্‌ফটানি দেখিয়া হয়তো অভ্যাস-দোষে কখনও বলিয়া ফেলিতে পারি যে, সে বেদনা পাইয়াছে। এ কথাটা রূপক অর্থে লইবেন। কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন, যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক

অথবা অয়স্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয়, তখন ঝিনুক কোনও কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঘ্র-কবলিত হইয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।

জীবনের মাপকাঠি

এখন দেখা যাউক, জীবন্ত অবস্থার কোনোরূপ মাপকাঠি আছে কি না। জীবিত ও মৃতের কি প্রভেদ? যে জীবিত, তাহাকে নাড়া দিলে সাড়া দেয়। কেবল তাহাই নহে; যে অধিক জীবন্ত, সে একই নাড়ায় অতি বৃহৎ সাড়া দেয়। যে মৃতপ্রায় সে নাড়ার উত্তরে ক্ষুদ্র সাড়া দেয়? যে মরিয়াছে, সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সুতরাং আঘাত দিয়া জীবন্ত ভাবের পরিমাণ করিতে পারি। যে তেজস্বী, সে অল্প আঘাতেই পূর্ণ সাড়া দিবে। আর যে দুর্বল, সে অনেক তাড়না পাইয়াও নিরুত্তর থাকিবে। মনে করুন, কোনোপ্রকারে আমার অঙ্গুলির ওপর বার বার আঘাত পড়িতেছে। আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইতেছে এবং তজ্জন্য নড়িতেছে। অল্প আঘাতে অল্প নড়ে এবং প্রচণ্ড আঘাতে বেশি নড়ে। শুধু চক্ষে তাহার পরিমাণ প্রকৃতরূপে লক্ষিত হয় না। আকুঞ্চনের মাত্রা ধরিবার জন্য কোনোপ্রকার লিখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখানো হইয়াছে তাহা হইতে কলের আভাস পাওয়া যাইবে। স্বল্প আঘাতের পর স্বল্প আকুঞ্চন; কলমটা ওপরের দিকে অল্প দূর উঠিয়া যায়, আকুঞ্চনরেখাও স্বল্প-আয়তনের হয়। বৃহৎ আঘাতে রেখাটা বড় হয়।

কেবল তাহাই নহে। আঘাতের চকিত অবস্থা হইতে আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হই; সংকুচিত অঙ্গুলি পুনরায় স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়। আঘাত দিলে সংকুচিত অঙ্গুলির টানে লিখিত রেখা হঠাৎ উপর দিকে চলিয়া যায়। প্রকৃতিস্থ হইতে কিছু সময় লাগে; ঊর্ধ্বোত্থিত রেখা ক্রমশ নামিয়া পূর্ব স্থানে আইসে। আঘাতে বেদনা অল্প সময়েই পূর্ণ মাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বেদনা অন্তর্হিত হইতে সময় লাগে। সেইরূপ আকুঞ্চনের সাড়া অল্প সময়েই হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার প্রসারণ রেখা অধিক সময় লয়। গুরুতর আঘাতে বৃহত্তর সাড়া পাওয়া যায়, প্রকৃতিস্থ হইতে দীর্ঘতর সময় লাগে। বেদনাও অনেক কাল স্থায়ী হয়। যদি জীবিত পেশি একই অবস্থায় থাকে এবং একইবিধ আঘাত তাহার উপর বার বার পতিত হয়, তাহা হইলে সাড়াগুলি একই রকম হয়। কিন্তু জীবিত পেশি সর্বসময়ে একই অবস্থায় থাকে না; কারণ বাহ্য জগৎ এবং বিগত ইতিহাস আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন রূপে গড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা বিমর্ষ, কখনও বা মুমূর্ষু। এই সকল ভিতরের পরিবর্তন অনেক সময় বাহির হইতে বুঝা যায় না। যিনি দেখিতে ভালোমানুষটি তিনি হয়তো কোপনস্বভাব, অল্পেতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন; অন্যকে হয়তো কিছুতেই চেতানো যায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্য, অবস্থাগত পরিবর্তন, তদ্ভিন্ন জীবনের অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি আছে যাহার ছাপ অদৃশ্যরূপেই থাকিয়া যায়। সে সকল লুপ্ত কাহিনি কি কোনোদিন ব্যক্ত হইবে? প্রথমে মনে হয়,

এই চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। দেখা হউক, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে কি না। কি করিয়া লোকের স্বভাব পরখ করিব? সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ কি? টাকা পরখ করিতে হইলে বাজাইয়া লইতে হয়; আঘাতের সাড়া, শব্দরূপে শুনিতে পাই। সাচ্চা ও ঝুটার সাড়া একেবারেই বিভিন্ন, একটাতে সুর আছে, অন্যটা একেবারে বেসুর। মানুষের প্রকৃতিও বাজাইয়া পরখ করা যায়। অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে; সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

হয়তো এইরূপে জীবের প্রকৃতি ও তাহার ইতিহাস বাহির করা যাইতে পারে—আঘাত করিয়া এবং তাহার সাড়া লিপিবদ্ধ করিয়া। সাড়া-লিপি তো রেখা মাত্র, কোনোটা একটু বড় কোনোটা কিছু ছোট। দুইটি রেখার সামান্য বিভেদ হইতে এমন অব্যক্ত, এমন অন্তরঙ্গ, এমন রহস্যময় ইতিহাস কীরূপে ব্যক্ত হইবে? কথাটা যত অসম্ভব মনে হয়, বাস্তবিক তত নয়। গ্রহবৈগুণ্যে হয়তো আমাদিগকে কোনওদিন আসামিরূপে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে আসামির বাগাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কৌসুলির জেরাতে কেবল 'হাঁ' কি 'না' এইমাত্র উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া দিতে পারিব—শিরের ঊর্ধ্বাধঃ অথবা দক্ষিণ বামে আন্দোলন দ্বারা। যদি আসামির নাকের উপর কালি মাখাইয়া সম্মুখে একখানি অতি শুভ্র স্ট্যাম্প কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে কাগজে দুই রকম সাড়া লিখিত হইবে। ইহাই প্রকৃত নাকে-খৎ এবং এই দুইটি রেখাময়ী সাড়া দ্বারা স্বয়ং ধর্মাবতার বিচারপতি আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষা করিবেন এবং সেই বিচারের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নিরূপিত হইবে—কলিকাতায় কিংবা আন্দামানে, ইহলোকে কিংবা পরলোকে!

এতক্ষণ মানুষের কথা বলিলাম। গাছের কথা ও তাহার গূঢ় ইতিহাসের কথা এখন বলিব। গাছের পরীক্ষা করিতে হইলে গাছকে কোনো বিশেষরূপে আঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে এবং তাহার উত্তরে সে যে সংকেত করিবে, তাহা তাহাকে দিয়াই লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। সেই লিখনভঙ্গী দিয়াই তাহার বর্তমান ও অতীত-ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং এই দুরূহ প্রযত্ন সফল করিতে হইলে দেখিতে হইবে—

১. গাছ কি আঘাতে উত্তেজিত হয় এবং কিরূপে সেই আঘাতের মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে?

২. আঘাত পাইয়া গাছ উত্তরে কিরূপ সংকেত করে?

৩. কি প্রকারে সেই সংকেত লিপিরূপে অঙ্কিত হইতে পারে?

৪. সেই লেখার ভঙ্গি হইতে কি করিয়া গাছের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে?

৫. গাছের হাত অর্থাৎ ডাল কাটিলে গাছ কিভাবে তাহা অনুভব করে?

গাছের উত্তেজনার কথা

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। তদ্ভিন্ন আহত স্থান হইতে সেই বিকারজনিত একটা ধাক্কা স্নায়ুসূত্র দিয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে; তাহা আমরা আঘাতের মাত্রা ও প্রকৃতিভেদে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া মনে করি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধিলে যদিও নড়িবার শক্তি বন্ধ হয়, তথাপি

সেই স্নায়ুসূত্র বাহিয়া যে সংবাদ যায় তাহা বন্ধ হয় না। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দিতেছে। গাছের মৃত্যুর পর আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোনো কোনো গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়; যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্র-মূলের নীচের দিকে উদ্ভিদপেশি অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের মাংসপেশি আহত হইলে যেরূপ সংকুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকের উদ্ভিদপেশিও আঘাতে সেরূপ সংকুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা পড়িয়া যায়। আঘাতজনিত আকস্মিক সংকোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। মানুষ যেরূপ হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়, লজ্জাবতী সেইরূপ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

মানুষকে যেরূপ উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে—যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এ সকল ভীষণ তাড়না পাতা অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য এমন কোনো মৃদু তাড়নার ব্যবস্থা আবশ্যক, যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণে থাকে।

গাছটিকে কোনো সহজ উপায়ে নিদ্রিত অথবা নিশ্চল অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে। রাজকন্যা মায়াবশে নিদ্রিতা ছিলেন; সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সম্মুখের পরীক্ষা হইতে জানা যাইতেছে যে, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি স্পর্শ করা মাত্র লজ্জাবতী লতা ও নিশ্চল ব্যাং পাতা ও গা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার কারণ এই যে, দুই বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ হইলেই বিদ্যুৎ স্রোত বহিতে থাকে এবং সেই বিদ্যুৎবলে সর্বপ্রকার জীব ও উদ্ভিদ একইরূপে উত্তেজিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবার সুবিধা এই যে, কল দ্বারা উহার শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, অথবা একই প্রকার রাখা যাইতে পারে। ইচ্ছাক্রমে বিদ্যুতের আঘাত বজ্রানুরূপ ভীষণ করিয়া মুহূর্তে জীবন ধ্বংস করা যাইতে পারে, অথবা কলের কাঁটা ঘুরাইয়া আঘাত মৃদু হইতে মৃদুতর করা যায়। এইরূপ মৃদু আঘাতে বৃক্ষের কোনো অনিষ্ট হয় না।

গাছের যন্ত্রলিপি

গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণত কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেই রূপই হইয়া থাকে। এমন কী, বন-চাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোনো ওজন নাই। প্রথমত, প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি

বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম, তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোনোদিন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল, সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম, সফলতা বিফলতারই উলটা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পরে বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিন হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না। ইহাব পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫-৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার 'সমতাল' যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল কলের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু-রেখা তাহার আয়ু পরিমাণ করে।

গাছের লেখা হইতে তাহার ভিতরকার ইতিহাস উদ্ধার

গাছের লিখনভঙ্গি ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ। তবে উত্তেজিত অবস্থায় সাড়া বড় হয়, বিমর্ষ অবস্থায় সাড়া ছোট হয়, মুমূর্ষু অবস্থায় সাড়া লুপ্তপ্রায় হয়। এই যে সাড়ালিপি সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহা লিখিবার সময় আকাশ ভরিয়া পূর্ণ আলো এবং বৃক্ষ উৎফুল্ল অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সাড়াগুলির পরিমাণ কেমন বৃহৎ! দেখিতে দেখিতে সাড়ার মাত্রা কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ছোট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা আমার অনুভূতিরও অগোচর ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোকের যে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, তাহা ঘরের ভিতর হইতে কোনোরূপে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু গাছ টের পাইয়াছিল, সে ছোট্ট সাড়া দিয়া তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখণ্ড চলিয়া গেল, অমনি তাহার পূর্বের ন্যায় উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব-শক্তি আছে। একথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই

গাছটি প্রত্যুষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্তনের অনুভূতিজনিত। তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃক্ষলিখিত সাড়া দ্বারা তাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে। গাছের পরীক্ষা হইতে জীবন সম্বন্ধে এইরূপ বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত অনেক দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাত্রাধার তৈল

শুনিতে পাই, কুকুরের লাঙুল আন্দোলন লইয়া দুই মতের এ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কুকুর লেজ নাড়ে; অন্য পক্ষে বলিয়া থাকেন, লেজই কুকুরকে নাড়িয়া থাকে। এইরূপ পাতা নড়ে, কি গাছ নড়ে; তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল? কে নাড়ায় আর কে সাড়া দেয়? বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এ দেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন না। কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাঁহারা চলাফেরা করিয়া থাকেন। কে কাহার ইঙ্গিতে চলে? রাশ কাহার হাতে? কে নাড়ায়, কুকুর কিংবা তাহার লেজ? ভুক্তভোগীরা যাহা-যাহা বলেন, তাহা অন্যরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচ মাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে। এমন সময়ও আসে, যখন রমণী সেই বন্ধন-রজ্জু স্বীয় হস্তেই ছেদন করেন। অঞ্চল দিয়া যাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকেই আদেশ করেন—যাও তুমি দূরে, কেবল আশীর্বাদ লইয়া! তোমাকে মৃত্যুর হস্তেই বরণ করিলাম!

আঘাত করিলে লজ্জাবতীর পাতা পড়িয়া যায়। পাতা নড়ে কিংবা গাছ নড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথম, গাছ ধরিয়া রাখিলে গাছ নড়িতে পারে না, পাতাই নড়ে। কিন্তু যদি পাতা ধরিয়া মাটি হইতে মূল উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—আঘাতে গাছই নড়িয়া উঠে, পাতা স্থির থাকে। অঙ্গে আঘাত পাইলে সেই আঘাতের বেদনা সমস্ত শিরায়-শিরায় বৃক্ষের সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধাবিত হয় এবং একের আপদ অন্যে নিজের বলিয়া লয়। কারণ, যদিও বৃক্ষটি শত সহস্র শাখাপ্রশাখা লইয়া গঠিত, তাহা সত্ত্বেও কোনো গ্রন্থি ইহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। কেবল সেই একতার বন্ধনের জন্যই বাহিরের ঝটিকা ও আঘাত তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষ তাহার শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

আহতের সাড়া

এক্ষণে দেখা যাউক, কী-কী বিভিন্নরূপে আহত বৃক্ষ তাহার ক্লিষ্টতা বাহিরে জ্ঞাপন করে। আমি এ সম্বন্ধে বৃক্ষের দুই প্রকার সাড়া বিবৃত করিব। প্রথমতঃ, বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে বৃদ্ধির মাত্রা বাড়ে কি কমে, সে বিষয় জ্ঞাপন করিব। দ্বিতীয়তঃ, গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিলে সেই অস্ত্রাঘাতে গাছ এবং বৃক্ষবিচ্যুত পাতা কীরূপ অনুভব করিবে, তাহা দেখাইব।

গাছ স্বভাবত কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতেও গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ, এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধি-মাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশি। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না; এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাংলা-নাগপুর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের গাড়ির দৌড় হইয়াছিল—কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ কবিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কোগ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ি বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইযা উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম; যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশি প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমত, এই সকল নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, 'যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটিন ও গ্রিক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?' বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে। হান্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোনো একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা হইতে পারে; কেবল হয় না, ঋ ও ৯। তাহাও উপরে কিংবা নীচে দুই-একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারি হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান—হইতে বার্‌ডোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।

বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। অমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিল। হে বেত্রপাণি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ-কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার

হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে, এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। সর্বপ্রকার আঘাতেই বৃদ্ধি কমিয়া যায়। সুচ দিয়া বিন্ধিয়াছিলাম, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া এক-চতুর্থ হইয়া গেল। এক ঘণ্টা পরেও সে আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও তাহার বৃদ্ধির গতি অর্ধেকেরও অধিক হইতে পারে নাই। ছুরি দিয়া লম্বভাবে চিরিলে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তাহাতে বৃদ্ধি অনেক সময় পর্যন্ত থামিয়া যায়। কিন্তু লম্বা চেরার চেয়ে এপাশ ওপাশ করিয়া কাটা আরও নিদারুণ। কই মাছ কাটিবার সময় এই কথাটি যেন গৃহলক্ষ্মীরা মনে রাখেন।

আঘাতে অনুভূতি-শক্তির বিলোপ

ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে কাটা পাতা এবং গাছের যে সকল পাতা ছিল সমস্তগুলিই মুষড়াইয়া পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে কাটা পাতা ও আহত বৃক্ষের অবস্থা কীরূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ৩/৪ ঘণ্টা পর্যন্ত উভয়েই একেবারে অচেতন। তাহার পরের ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত। কাটা পাতাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সুখাদ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা চারি ঘণ্টার পর মাথা তুলিয়া উঠিল ও বড় রকমের সাড়া দিল। ভাবটা এই—কি হইয়াছে? ভালোই হইয়াছে; গাছটার সঙ্গে একদিন বাঁধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে! এইরূপে পাতাটা জেদের সহিত বারংবার সাড়া দিতে লাগিল। এই ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কি যে হইল জানি না, সাড়াটা একেবারে কমিয়া গেল। ৫০ ঘণ্টার পর পাতাটা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তার পরেই মৃত্যু! যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল সেই গাছটার ইতিহাস অন্যরূপ। সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। 'কুছ্‌পুরোয়া নেই' ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহা আছে, তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে-ধীরে আহত বৃক্ষ তাহার বেদনা সামলাইয়া লইল। যে সাময়িক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে সক্ষম হইল।

জন্মভূমি

কেন তবে এই বিভিন্নতা? কি কারণে ছিন্নশাখ-বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কিয়দ্দিন পর বাঁচিয়া ওঠে, আর বিচ্যুত-পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংঘটিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বৃক্ষের ভিতরেও আর একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিযাছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক, সে তাহা গ্রহণ করিয়াছে; যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখাপ্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? যে ধৈর্য, ও দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

** প্রবাসী ১৩২৬ বৈশাখ*

স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ

বাহিরের সংবাদ ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় চতুর্দিকে প্রসারিত। বিবিধ ধাক্কা, আঘাত তাহাদের উপর পতিত হইতেছে এবং সংবাদ ভিতরে প্রেরিত হইতেছে। আকাশের ঢেউ দ্বারা আহত হইয়া চক্ষু যে বার্তা প্রেরণ করে তাহা আলো বলিয়া মনে করি। বায়ুর ঢেউ কর্ণে আঘাত করিয়া সে সংবাদ প্রেরণ করে তাহা শব্দ বলিয়া উপলব্ধি হয়। বাহিরের আঘাতের মাত্রা মৃদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অনুরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। মৃদুস্পর্শ সুখকর, কিন্তু ইষ্টকাঘাত কোনোরূপেই সুখজনক নহে।

টেলিগ্রাফের তার দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পৌঁছিয়া থাকে এবং এইরূপে দূরদেশে সংকেত প্রেরিত হয়। তার কাটিয়া দিলে সংবাদ বন্ধ হয়। একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিভিন্ন কলে বিবিধ সংকেত করিয়া থাকে—কাঁটা নড়ায়, ঘণ্টা বাজায় অথবা আলো জ্বালায়। বিবিধ ইন্দ্রিয় স্নায়ুসূত্র দিয়া যে উত্তেজনা প্রবাহ প্রেরিত করে তাহা কখনও শব্দ, কখনও আলো এবং কখনও বা স্পর্শ বলিয়া অনুভব করি। উত্তেজনা-প্রবাহ যদি মাসংপেশিতে পতিত হয় তখন পেশি সংকুচিত হয়। তার কাটিলে যেরূপ খবর বন্ধ হয়, স্নায়ুসূত্র কাটিলে সেইরূপ বাহিরের সংবাদ আর ভিতরে পৌঁছে না।

স্বতঃস্পন্দন ও ভিতরের শক্তি

বাহিরের আঘাতজনিত সাড়া কথা বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আর এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। সেই স্বতঃস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন ইহারই একটি উদাহরণ। ইহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। উদ্ভিদজগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। বনচাঁড়ালের ছোটো দুইটি পাতা আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। ভিতরের শক্তিজাত স্বতঃস্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে,

ইহা বাহিরের শক্তি দ্বারা বিচলিত হয় না; বাহিরের শক্তিকে বরং প্রতিরোধ করে। সুতরাং দেখা যায়, দুই প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব উত্তেজিত হয়—বাহিরের শক্তি এবং ভিতরের শক্তি। সচরাচর ভিতরের শক্তি বাহিরের শক্তিকে প্রতিরোধ করে।

ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কীরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে?

আঘাতের মাত্রা অনুসারেই উত্তেজনা-প্রবাহ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ্য। আলো যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয় তখন দৃশ্য, অদৃশ্যে মিলিয়া যায়। তখনও চক্ষু আলোক দ্বারা আহত হইতেছে সত্য, কিন্তু অতি ক্ষীণ উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুসূত্র দিয়া অধিক দূর যাইতে না পারিয়া নিদ্রিত অনুভূতি-শক্তিকে জাগাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়অগ্রাহ্য কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে? ক্ষণিকের জন্য একদিন যাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তো আর দেখিতে পাইতেছি না। কি করিয়া তবে দৃষ্টি প্রখর হইবে, অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে?

অন্যদিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি শক্তি বেদনায় মুহ্যমান, সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরূপে প্রশমিত হইবে? হে ভীরু, যদিও তুমি একদিন মরিবে তথাপি অকাল শঙ্কা হেতু শত শত বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছ। যদিও বহির্জগতের আঘাত তুমি নিবারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তর্জগতের তুমিই একমাত্র অধিপতি। যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে, কোনোদিন কি সেই পথ তোমার আজ্ঞায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে রুদ্ধ হইবে?

কখনও কখনও উক্তরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিংবা শুনি নাই, চিত্তসংযম করিয়া তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয়, ইচ্ছানুক্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাসবলে অনুভূতি শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন স্নায়ুসূত্র দিয়াই বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছে, তখন স্নায়ুসূত্রের কি পরিবর্তনে অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বার একেবারে খুলিয়া যায়? অন্য উপায়ও হয়তো আছে, যাহাতে খোলা দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

বাহিরের শক্তির প্রতিরোধ

এরূপ একটা ঘটনা কুমায়ুন-অবস্থানকালে দেখিয়াছিলাম। তরাই হইতে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়া দেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। অল্প দিনেই শতাধিক লোক ব্যাঘ্র কবলিত হইল। সরকার হইতে বাঘ মারিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। গ্রামবাসীরা তখন নিরুপায় হইয়া কালু সিংহের শরণাপন্ন হইল। সে কোনো কালে শিকার করিত, কিন্তু অস্ত্র-আইনের নিষেধহেতু বহুকাল যাবৎ তাহার পুরাতন এক-নলা বন্দুক ব্যবহার করে নাই। বাঘ দিনের বেলায় মাঠে মহিষ বধ করিয়াছিল; সেই মহিষের আর্তনাদ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম। রাত্রে সে স্থানে বাঘ ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় নিকটের ঝোপের আড়ালে কালু সিং প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ যমস্বরূপ বাঘ দেখা দিল; মাঝখানে তিন হাত মাত্র ব্যবধান। ভয়ে কালু সিংহের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, কোনোরূপেই বন্দুক স্থির করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। কালু সিংহের

নিকট পরে শুনিলাম—'তখন আমি নিজেকে ধমক দিয়া বলিলাম; একি, কালু সিং? স্ত্রী, বহিন বাল-বাচ্চাদের জান বাঁচাইবার জন্য তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, আর তুমি ঝোপের আড়ালে শুইয়া আছ? অমনি ভিতর দিয়া আগুনের মতো কি একটা ছুটিয়া গেল; তাহাতে শরীর লোহার মতো শক্ত হইল। তখন বাঘের সামনে দাঁড়াইলাম। বাঘ আমাকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দিল, সেই সঙ্গেই আমার বন্দুকের আওয়াজ হইল, আর বাঘ মরিল।'

স্নায়ুর ভিতর দিয়া কি একটা ছুটিয়া যায়, যাহাতে শরীর লোহার মতন কঠিন হয়। তখন সেই লৌহ-বর্ম ভেদ করিয়া বাহিরের কোনো ভয় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। স্নায়ুসূত্রে কি পরিবর্তন ঘটে যাহা দ্বারা এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয়? স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনা প্রবাহ সম্পূর্ণ অদৃশ্য; তাহার প্রকৃতি কি, তাহা কি নিয়মে চালিত হয়, তাহার কিছুই জানা নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, দ্বারা এই তথ্য নির্ণীত হইবে মনে করিয়া বিশ বৎসর যাবৎ এই সন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম।

বৃক্ষে স্নায়ুসূত্র

সর্বাগ্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ফেফার, হ্যাবারল্যান্ড প্রমুখ ইউরোপিয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদে কোনো স্নায়ুসূত্র নাই; তবে লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটিলে দুরস্থিত পাতা কেন পড়িয়া যায়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, চিমটি কাটিলে উদ্ভিদে জল-প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাতা পতিত হইয়া থাকে। এই নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমত, চিমটি না কাটিয়া অন্যরূপে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করা যাইতে পারে, যে সব উপায়ে জল-প্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় না। আরও দেখা যায়, প্রাণীর স্নায়ুতে যে সব বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ-স্নায়ুতেও তাহা বর্তমান। নলের ভিতরে জল-প্রবাহের বেগ শীত কিংবা উষ্ণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু স্নায়ুর উত্তেজনার বেগ ৯ ডিগ্রি উত্তাপে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভিদে তাহাই হইয়া থাকে। অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র অসাড় হইয়া যায়; তখন উত্তেজনা-প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে—আমার এই সিদ্ধান্ত এখন সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

আণবিক সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রথমে দেখা যাউক, কি উপায়ে স্নায়ুর উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয়। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইলে পরে দেখা যাইবে, কিরূপে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হইতে পারে। স্নায়ুসূত্র অসংখ্য অণু-গঠিত; প্রত্যেক অণুই স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক নিশ্চলভাবে স্বীয় স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আঘাত পাইলে হেলিতে দুলিতে থাকে; এই হেলা-দোলাই উত্তেজিত অবস্থা। একটি অণু যখন স্পন্দিত হয়, পার্শ্বের অন্য অণুও প্রথম অণুর আঘাতে স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ ধারাবাহিক রূপে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রেরিত হয়। অণুর আঘাতজনিত কম্পন কিরূপে দূরে

প্রেরিত হয় তাহার একটা ছবি কল্পনা করিতে পারি। মনে কর, টেবিলের উপর এক সারি পুস্তক সোজাভাবে সাজানো আছে। ডান দিকের বইখানাকে বাম দিকে ধাক্কা দিলে প্রথম নম্বরের পুস্তক দ্বিতীয় নম্বরের পুস্তকের উপর পড়িয়া তৃতীয় পুস্তককে ধাক্কা দিবে এবং এইরূপে আঘাতের ধাক্কা এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে।

বইগুলি প্রথমে সোজা ছিল এবং প্রথম পুস্তকখানাকে উলটাইয়া ফেলিতে কিয়ৎপরিমাণ শক্তি আবশ্যক; মনে কর তাহার মাত্রা পাঁচ। ধাক্কার জোর যদি পাঁচ না হইয়া তিন হয় তাহা হইলে বইখানা উলটাইয়া পড়িবে না। সুতরাং পার্শ্বের বইগুলিও নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে। এই কারণে বহিরিন্দ্রিয়ের ওপর ধাক্কা যখন অতি ক্ষীণ হয় তখন উত্তেজনা দূরে পৌঁছিতে পারে না এবং এই জন্য বাহিরের আঘাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে করো, বইগুলিকে সোজা অবস্থায় না রাখিয়া বাম দিকে একটু হেলানো অবস্থায় রাখা গেল। এবার স্বল্প ধাক্কাতেই বইখানা উলটাইয়া পড়িবে এবং ধাক্কাটা একদিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিবে। পূর্বে ধাক্কার জোর পাঁচ না হইয়া তিন হইলে আঘাত দূরে পৌঁছিত না, এখন তাহা সহজেই পৌঁছিবে। বইগুলিকে উলটাদিকে হেলাইলে পাঁচ নম্বরের ধাক্কা প্রথম পুস্তকখানাকে উলটাইতে পারিবে না। ধাক্কা এবার দূরে পৌঁছিবে না; গন্তব্য পথ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, স্নায়ুসূত্রের অণুগুলিকেও দুই প্রকারে সাজানো যাইতে পারে। 'সমুখ' সন্নিবেশে ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য শক্তি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবে। আর 'বিমুখ' সন্নিবেশে বাহিরের ভীষণ আঘাতজনিত উত্তেজনার ধাক্কা ভিতরে পৌঁছিতে পারে না।

পরীক্ষা

উত্তেজনা-প্রবাহ সংযত করিবার সমস্যা কীরূপে পূরণ করিতে সমর্থ হইব তাহা স্থূলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছি তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে কী উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' অথবা 'বিমুখ' হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ প্রবাহ একদিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক শলাকাগুলি ঘুরিয়া একমুখী হইয়া যায়; বিদ্যুৎ-প্রবাহ অন্য দিকে প্রেরণ করিলে শলাকাগুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী হয়। বিদ্যুৎ বাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎস্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণু-সন্নিবেশে বিদ্যুৎস্রোতের দিক অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে।

স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম যে, লজ্জাবতী তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোনওদিনও টের পায় নাই এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল? ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম। এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও, লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক

কোনোদিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে 'সমুখ' আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুন' প্রয়োগ করিলাম। এবার ব্যাঙ ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম অমনি বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুসারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই হ্রাস বৃদ্ধি আণবিক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনায় প্রবাহ আড়ষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায়, এই আণবিক সন্নিবেশ এবং তজ্জনিত উত্তেজনা প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তি প্রয়োগে নিয়মিত করা যাইতে পারে। ইহা কোনো আকস্মিক কিংবা দৈব ঘটনা নহে, কিন্তু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে কার্য-কারণের সম্বন্ধ অকাট্য।

বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্ত পেশি যেরূপ সংকুচিত হয়, ভিতরের ইচ্ছায় হস্ত সেইরূপ সংকুচিত হয়। উলটা রকমের হুকুমে হাত শ্লথ হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ বর্ধিত অথবা সংযত হইতে পারিবে। তবে এই দুই প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহু দিনের অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ। শিশু প্রথম-প্রথম হাঁটিতে পারে না; কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলাফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। অন্যপ্রকারে সে বাহিরের সর্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তর রাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।

ভিতর ও বাহির

ভিতরের শক্তি তো স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন্ স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? শুষ্ক তৃণ জল-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু জীব কেবল বাহিরের প্রবাহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে। কোন্ স্তরে তবে এই বুঝিবার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-বিন্দু কখনও বাহিরের শক্তি গ্রহণ করে, কখনও ভিতরের শক্তি দিয়া প্রতিহার করে। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতাই তো ইচ্ছা-শক্তি।

আর ভিতরের শক্তিই বা কীরূপে উদ্ভূত হইয়াছে? বাহিরের ও ভিতরের শক্তি

কি একেবারেই বিভিন্ন? পূর্বে বলিয়াছি যে, বনচাঁড়ালের পাতা দুইটি ভিতরের শক্তিবলে আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। কিন্তু গাছটিকে দুই দিন অন্ধকারে রাখিযা দেখিলাম যে, পাতা দুইটি একেবারেই নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভিতরের শক্তি যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা এখন ফুরাইয়া গিযাছে। এইক্ষণে পাতা দুইটির উপর ক্ষণিক কালের জন্য আলো নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, পাতা নড়িয়া সাড়া দিতেছে; কিন্তু আলো বন্ধ করিলেই পাতার স্পন্দন থামিয়া যায়। ইহার পব অধিক কাল আলোক নিক্ষেপ করিলে এক অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। এবার আলো বন্ধ করিবার পরেও পাতা দুইটি বহুক্ষণ ধরিয়া যেন স্বেচ্ছায় নড়িতে থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে? দেখা যায়, আলোরূপে যাহা বাহিরের শক্তি ছিল, গাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং বাহির হইতে সঞ্চিত শক্তি এখন ভিতরের শক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই; সামান্য বিভিন্নতা এই যে, যাহা পরদার ও-পারে ছিল তাহা এ-পারে আসিয়াছে; যাহা পর ছিল তাহা আপন হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, এইরূপ স্বতঃস্পন্দিত অবস্থায় পাতাটি বাহিরের আঘাতে বিচলিত হয় না। সে এখন বাহিরের শক্তি-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ভিতরের শক্তি দিয়া বাহিরের শক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন ভিতরের সঞ্চয় ফুরাইবে কেবল তখনই গ্রহণ করিবে এবং পরে স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিবে। জীবনের কোন্ স্তরে তবে ভিতরের শক্তি ও স্বেচ্ছা উদ্ভূত হইয়াছে?

জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীব লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহমায়া মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেমের দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দিনেও বাহিরেব আঘাত ফলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ; অনেকে তোমারই নির্দেশে জ্ঞান-সন্ধানার্থে জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যাণহেতু রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন, জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্য ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যাহা দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

** বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ ১৩২৭ চৈত্র ১৯*

হাজির!

হঠাৎ চিৎকার করিয়া কেহ উত্তর দিল—'হাজির!' কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি অতি করুণ ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তরে শুনিলাম—'কি আজ্ঞা প্রভু?' কে তোমার প্রভু, কাহার হুকুমে এরূপ উদ্দীপ্ত হইলে?

কি আশ্চর্য! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি আলোড়িত হইল। সুপ্তস্মৃতি আজ জাগরিত—যাহা অশব্দ, আজ তাহা শব্দায়মান; যাহা বুদ্ধির অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্থযুক্ত হইল।

এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই দুই-এর মধ্যে যে সর্বদা কথা চলিতেছে তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুমতি তো আমি, সুমতি তবে কে?

এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনওদিনও লিখিতে পারি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞাতে 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম; পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র'। পূর্বে জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানিতাম না। কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি—ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, 'যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সে সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব?' ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যে সব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশি বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং বিলাতের সংবর্ধনাসভায় নিমন্ত্রিত হইলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম রাম্‌সে বহু সাধুবাদ করিলেন; পরে বলিলেন, 'কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান যুগ আরম্ভ হইল; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসংগত নহে।' সেদিন বোধ হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কারণ স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিবে। এখন সেদিন আসিয়াছে; যাহা কুমতি বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন

দেখিতেছি তাহাই সুমতি। তখনকার শুভলগ্ন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। একদিনের পর আর একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল।

এমনসময় যে হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম-প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষণ শ্রেয়, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল—'কল কি মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে?'

কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল। সে সব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিককালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের হস্তে এই সব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিব, মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রয়্যাল সোসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন স্যান্ডারসন্ বলিলেন, 'জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিষ্ফল হইয়াছে; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকারচর্চা হইয়াছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।' তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম, নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যান হইল তাহাই সত্য। ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই দুর্মতির ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সব দিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম। আশা ও নিরাশার অতীত এইভাবে বিশ বৎসর কাটিল।

এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম, 'বিদেশ যাও।' বিদেশযাত্রা! সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিনস্বর শুনিলাম, 'আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল! লাভালাভ বলিবার তুমি কে?' আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। কাহার হুকুমে এরূপ হইল? একি স্বপ্ন? বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন। যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহা সর্বত্র গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে যাহা কুমতি

মনে করিয়াছিলাম, পুনরায় দেখিতে পাইলাম—তাহাই সুমতি।

সুতরাং কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি জানি না। কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট তাহাও মন বোঝে না। সুদিনের বৃহৎ সফলতা ভুলিয়া দুর্দিনের বিফলতার কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সবর্ত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, কেবল দুই-এক জনের অহেতুক স্নেহ আমাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহারা অন্ধকার যবনিকার পরপারে। অস্ফুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌঁছিয়া থাকে?

জীবনের যখন পূর্ণশক্তি, তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধন্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমাব পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে—'আসামি হাজির!'

প্রবাসী ১৩২৮ বৈশাখ

অন্যান্য রচনা

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন

[গত এক বৎসরের মধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। গতমাসে দার্জিলিং-এর গভনমেন্ট হাউসে লর্ড লিটনের নিমন্ত্রণে যে সভা আহূত হয় তাহাতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের পেশিমণ্ডল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। গত ১৪ অগ্রহায়ণ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিনের অষ্টম বার্ষিক উৎসব সভায় তিনি উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ও রস সঞ্চালন সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ইংরেজি মর্ডান রিভিয়ুতে প্রকাশিত বক্তৃতা ও আচার্য বসুর অন্যান্য প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইল।]

বত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি অদৃশ্য বৈদ্যুতিকরশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। হার্জ (Hertz) আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অতি বৃহদাকার বলিয়া, সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা প্রেরিত আকাশ-ঊর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়তো অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া থাকে। অদৃশ্য আলো উপলব্ধি করিবার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কল তৎকালে ছিল না। আমা কর্তৃক গ্যালিনা রিসিভর উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা হইল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমি সর্বসমক্ষে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিদ্যুৎ ঊর্মি গভর্নরের বিশাল গৃহ এবং আবও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাভাবে তোলপাড় করিয়াছিল। তাহা একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওযাজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল।

জীব ও অজীব

তারহীন কল লইয়া পরীক্ষা করিতে-করিতে দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গি হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপ বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

উদ্ভিদের সাড়া

ইহার পরে আমি উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারার মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। আহত হইলে প্রাণী দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে; তাহার হৃদয়যন্ত্র সর্বদা স্পন্দিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাণী, ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্যদ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারে। অপর পক্ষে বৃক্ষাদির সঙ্কোচন বা প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাতে কোনো স্পন্দন নাই, তাহারা স্নায়ুহীন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। দুইটি জীবন-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, অথচ তাহাদের জীবনে কোথাও ঐক্যের চিহ্ন পবিলক্ষিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহুদিন যাবৎ উদ্ভিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে দিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষ চেতনার সাড়া দিল, সেই দিনই তাহার অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ জীবন যাত্রা প্রণালী অবগত হওয়া সম্ভব হইল। ক্রমে-ক্রমে এই সাড়াকে লেখায় পরিণত করিবার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে হইযাছে, সেই লেখা পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এই নূতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের জীবন একই প্রকার। মানুষের যেমন হৃৎস্পন্দন আছে, বৃক্ষলতাদিরও ঠিক সেইরূপ হৃৎস্পন্দন আছে। প্রাণী যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদও সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উত্তেজক ঔষধ বা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই একই প্রকার। ইহা হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজ্জীবন সম্পর্কিত এই নূতন গবেষণার ফলে ঔষধ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকার্যে সাফল্যলাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্ধনের ধারা অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এই ধারার রহস্যও অনাবৃত হইয়াছে।

সাধনা

এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। এক দিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বর্ষ একাগ্রতার সহিত সাধনা করিয়াই ইহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আট বৎসর পূর্বে যখন আমি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কার্যে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল ও দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন করিতে সমর্থ হইবে কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোনো কার্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম— এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য সেই তথাকথিত কলঙ্ক কালিমা মুছাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অন্তর্দৃষ্টি

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণের দক্ষতা ও অনুসন্ধান করিবার কৌশল জানা আবশ্যক। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানের কোনোই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের

ফলে ভারত জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্যশীল করে ও সত্যেব অনুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞানমন্দিব।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রাণ যন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তদৃষ্টি মাঝে-মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য; কারণ অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে বিপথগামী করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয় না, তখনও আমাদিগকে অদর্শনীয়েব অনুসরণ করিতে হয়। কারণ যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্য। সেই অদৃশ্যরাজ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফের (Crescograph) আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জিনিসই তাহার আসল মাপ হইতে দশ কোটি গুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে দৃষ্টির বহির্ভূত জীবনেব মূল গতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণ রূপ মনের অধীন করিতে হইবে। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য হইয়া যায়। দেহের উপব মনের প্রভাব অপরিসীম এবং মনের বল দ্বারা যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞানমন্দিরে ২০০টি বিষয়, এই কারণে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে।

বৃক্ষে রস সঞ্চালন

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গপ্রতঙ্গে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুই শত বর্ষের অধিক কাল অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু কোনো সুমীমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপবে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহু দিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস সঞ্চালন কি জড় শক্তির প্রভাবে হয় না জীবনশক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য স্ট্রাসবুর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোনও ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবনশক্তি দ্বারা ওইরূপ রস সঞ্চালন হইতে পাবে না। জড় বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোনো নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দেশক। রসের দ্রুত-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া ঊর্ধ্বে উঠে এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা ঢলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষীভূত হয় না। আমি অপ্টিক্যাল লিভার (Optical lever) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডেব একদিক একটি সূত্র দ্বারা পাতার সহিত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সহিত

একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপ পাতার অতি সামান্য উত্থান পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই পাঁচহাজার গুণ পরিবর্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে স্ট্রাসবুর্গারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। *

নাড়ীর স্পন্দন প্রতিফলিত আলোকরশ্মির সাহায্যে বড় করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কব্জির নিকটস্থ নাড়িটি বাহিরেই অবস্থিত, সুতরাং নাড়ীর স্পন্দন সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে হৃদযন্ত্র সতেজ হয় ও তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রেকর্ডারে (Recorder) ঊর্ধ্বরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের সময় অধোরেখা দীর্ঘতর হয় এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই নাড়ী মাংসপেশিতে নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ নির্ণয় করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রস চাপ কি বর্ধিত কিংবা অবসন্ন হয়? এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের দরুন যে সঙ্কোচ প্রসারণ হয় অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পেশির মধ্যে বৃক্ষ হৃদয় নিমজ্জিত। সুতরাং এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে?

উদ্ভিদের হৃদয় সন্ধান

তবে বৃক্ষের হৃদয় কোথায়? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ শলাকা দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। নিস্পন্দিত পেশির সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিঃস্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদযন্ত্রের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হইলে ওই স্পন্দনের অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। বৃক্ষের হৃদয়ের অধিষ্ঠান স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে-ধাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে মুহূর্তে ওই শলাকা স্পন্দমান স্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ওই সাড়া গ্যালভ্যানোগ্রাফ (Galvanoigraph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণকালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিয়া লয় এবং সঙ্কোচের সময় উহা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হৃদয়যন্ত্র নিম্নশ্রেণির জীবের হৃদয়যন্ত্রেরই অনুরূপ।

হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করার যন্ত্র

ইহার পর অন্য সমস্যা মনে উদিত হইল। বিদ্যুৎ শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের হৃদয়-স্পন্দন কি কোনোদিন আমাদের অনুভূতি গ্রাহ্য হইবে? যখন স্পন্দিত রসপ্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষণিকের জন্য প্রসারিত করে; ঢেউটি চলিয়া গেলে বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব আকার ধারণ করে। এই অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য স্পন্দন মনুষ্য-প্রত্যক্ষ গোচর করিবার জন্য কল্পনারও অতীত অনুভব যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই অনুভব যন্ত্রে দুইটি দন্ত আছে—একটি স্থির, আর একটি চালনশীল। বৃক্ষটি এই দণ্ড

* এই স্থানে আচার্য বসু একটি বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়া সর্বসাধারণ সমক্ষে দেখাইলেন যে, বৃক্ষের চেতনা এবং রসসঞ্চালনের ক্ষমতা ক্রমে-ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।

দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত করিলে, প্রসারণ তরঙ্গ, চালনযোগ্য দণ্ডখানিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তবে ইহা চোখে দেখা যায় না। এই সঙ্কোচন প্রসারণ এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও কম। সুতরাং আমার ম্যাগনেটিক অ্যামপ্লিফায়ার (Magnetic Amplifier) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এক কোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের চুম্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় পতিত হয়। বৃক্ষটির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে-সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজক বা ক্লান্তিজনক ঔষধ প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের গতি বৃদ্ধি অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনী শক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কম্পিত আলোকরেখা দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে এইরূপ সর্বপ্রথমে প্রচারিত করিল।

অভাব ও দৈন্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে। যেমন আর্থিক দুরবস্থা ইউরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে—ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকানিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়—দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত, এই সুযোগে বাহির হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুঠিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, যে অকূল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ধরিত্রী মাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননী ও সেইরূপ অসমর্থ জীবনের ভার বহন করিতে বিমুখ। **দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।** তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

বীরধর্ম

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব—নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল এবং যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেই-ই তাহার জয়লব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দান দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। **ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ ইহাই আমাদের চিরাসাধনা হউক।**

প্রবাসী ১৩৩২ পৌষ

উদ্ভিদের প্রাণযন্ত্র *

পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্বে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উদ্ভিদ-জীবনের অনুসন্ধানের ফলে প্রাণী জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুই-এর জীবন-ক্রিয়ার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো প্রাণীকে আঘাত করিলে সে শিহরণ দ্বারা আঘাতের অনুভূতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গে ক্রমাগত আঘাত করিলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। প্রাণীর চেতনেন্দ্রিয় আছে, বাহিরের আঘাতের ফলে উত্তেজনার স্পন্দন ইহাদের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আন্দোলিত করে। উদ্ভিদের এইরূপ কোনো সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল। প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে। রক্ত সঞ্চালন করিবার জন্য জীবদেহের মধ্যে এই যন্ত্র অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে। উদ্ভিদের এইরূপ কোনো যন্ত্র আছে এরূপ কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। সুতরাং সকলে মনে করিতেছে যে, যদিও এই দুইটি জীবন-প্রবাহ পাশাপাশি বহিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে কুত্রাপি কোনো ঐক্য নাই। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—এইসব ভ্রান্ত মতই এতদিন জ্ঞানের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছিল।

উদ্ভিদ-জীবনীতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রতিপদেই প্রবল বিঘ্ন, কারণ উদ্ভিদের জটিল জীবনী ক্রিয়ার পরিচয় জানিতে হইলে ইহার প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক। যখন অণুবীক্ষণের দৃষ্টি ব্যর্থ হয় তখন আমাদিগকে অদৃশ্যের পথ অনুসরণ করিতে হয় এবং সেইজন্য এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করা আবশ্যক যাহার সাহায্যে আলোকউর্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর করা ও তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নয়। আমার বিজ্ঞান মন্দিরে স্বয়ংলেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই যন্ত্র সাহায্যে ক্ষুদ্রতম জীবন স্পন্দন এক কোটি হইতে পাঁচ কোটি গুণ বর্দ্ধিতরূপে দৃষ্ট হয়। সাধারণ অণুবীক্ষণের সাহায্যেই একটা নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের সহায়তায় ভবিষ্যতে বহুবিধ অত্যাশ্চর্য সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমার আবিষ্কৃত এই যন্ত্র সমূহ প্রাণী জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যাবতীয় প্রাণ-যন্ত্রের ক্রিয়া একই নিয়মে চালিত হইতেছে।

ইউরোপে বিজ্ঞান-অভিযান

আমার আবিষ্কৃত যন্ত্র সমূহের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিজ্ঞান মন্দিবে গবেষণা প্রসূত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ জীবনীরাজ্যের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হইয়াছে। ইহার

---

* এই প্রবন্ধ ইংরেজি মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সাম্বাৎসরিক উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতা অনুবাদ। আচার্য বসু মহাশয়ের বিশেষ নির্দেশক্রমে লিখিত। ৩০ নভেম্বর, ১৯২৬।

ফলে আমি ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞানানুশীলন কেন্দ্র সমূহ হইতে বক্তৃতা দেওয়ার ও আমার অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন করাইবার জন্য আমন্ত্রিত হই। বিদেশে এই সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া অতীব দুরূহ হইয়াছিল। অন্যের হস্তে এই সমস্ত যন্ত্র দেওয়া যায় না, কারণ সামান্য অসাবধানতার দরুন যন্ত্রগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেই অনেক স্থলে আমাকেই উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। ইংল্যান্ডে আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও সোসাইটি অব আর্টসের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করি। তৎপরে রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে নানাবিধ ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদাঘ বাসরে "বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতের দানের গুরুত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করি। আমার বক্তৃতার বিষয়গুলি যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখাইবার ফলে সর্বত্রই বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করি তাহার সম্পূর্ণ অংশ তৎক্ষণাৎ বেতার সাহায্যে জগতের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকালেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত কাগজে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার গবেষণা প্রসূত তথ্যসমূহ শুধু জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর নহে সাধারণেরও চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রমাণও পাইয়াছি। শীঘ্রই আমার উদ্ভিদতত্ত্বের আবিষ্কার সমূহ সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ ভাষায় লিখিত হইয়া আমেরিকা ও ইউরোপে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসর বেলজিয়ামের সম্রাট ভারত ভ্রমণ কালে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাকার্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। তিনি সেই সময়েই আমাকে বেলজিয়ামে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারই উদ্যোগে বেলজিয়ামের ফন্‌দেশিও ইউনিভারসেতায়ারে (Foundation Universatataire) আমার প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বক্তৃতা সভায় সপারিষদ সম্রাট ও বেলজিয়মের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে আমার পরীক্ষাকার্য সাফল্যমণ্ডিত হয় এই জন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব হইতেই নানা প্রকার পরীক্ষাপোযোগী উদ্ভিদ জন্মানো হইয়াছিল।

প্যারিসের সোর্বোন ((Sorboune) এবং ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়মে আমার বক্তৃতা হয়। এখানেও বিজ্ঞ চিকিৎসকবর্গ ও বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদগণ আমার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিন ভাষাভাষী দেশসমূহে আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ জাগিয়াছে, তাহার ফলে বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশক গথিয়ার ভিলার্স (Gauthier Vallars) আমার রচিত পুস্তকগুলির ফরাসি সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন।

অতঃপর আমি জেনিভার বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীতে যোগদান করি। জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে আমার একটি বিশেষ ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই বক্তৃতা সভায় অধ্যাপক লরেঞ্জ (Lorenz), আইনস্টাইন প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। এই সময়েই জগৎ-বিজ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ভারত সচিবকে লিখিয়াছেন যে, আমার ত্রিশ বর্ষব্যাপী সাধনার

ফল, তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই যুগান্তকারী মৌলিক গবেষণা সমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙক্ষা জাগরিত করিয়াছে যে, নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠতর হউক।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বিদ্যামন্দিরের পক্ষ হইতে মসিঁয়ে লুসার (M. Luchair) বলেন যে, সকল প্রকার প্রাণক্রিয়া যে একই ধরনের তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, মনীষীদের চিন্তা প্রণালীর ভিতর ঐক্য রহিয়াছে এবং মানুষের প্রতিভাপ্রগতি কোনোরূপ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে ও কোনো প্রকার বাধা নিষেধ মানব মনের অগ্রসরশীল গতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যে ভারতবর্ষকে তাঁহারা এতদিন কেবল কল্পনাপ্রবণ বলিয়া মনে করিতেন এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, সেই সকল কল্পনাই বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার করাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস যে, আন্তর্জাতিক বিদ্বজ্জন সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের মনীষীবর্গের যে ভাবের আদান-প্রদানের আয়োজন হইতেছে তাহার ফলে মানবসভ্যতার শৈশব লীলা-নিকেতন এশিয়ার বহুদিনের পুঞ্জীভূত চিন্তরাশি বিশ্বজগতের নিকট উন্মুক্ত হইবে।

সুবিজ্ঞ সমালোচকবর্গের নিকট হইতে এইপ্রকার উচ্চ প্রশংসা আশ্চর্য বলিতে হইবে কারণ পাশ্চাত্য দেশে এতদিনের প্রচলিত মত এই যে, "ভারতবর্ষ শুধু ঐন্দ্রজালিক ও তান্ত্রিকদের সাধনাক্ষেত্র।" এইরূপ অসম্ভব ও ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে। এবং এক্ষণে ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতা সর্ববাদীসম্মত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর বিপুল প্রয়াস, জীবন বিজ্ঞানের রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত ভারতীয় কারিগরের সুপরিকল্পিত ও সুনির্মিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার এবং প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কিত যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহ জগৎ সভায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে নির্দিষ্ট করিয়াছে।

জীবন-মৃত্যু রেখা

মৃত্যুর লক্ষণ কি এবং জীবন-মৃত্যু দ্বন্দ্বের সন্ধিস্থল সঠিক ধরা যায় কিনা আমি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমি এমন কয়েকটি সঠিক উপায় নির্ণয় করিয়াছি যাহা দ্বারা মরণোন্মুখ উদ্ভিদ তাহার মৃত্যুরেখা নিজেই অঙ্কিত করিতে পারে। চারা গাছকে প্রথমে ঈষদুষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখা হইল। জলের উষ্ণতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা হইল। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠিল। গাছটি আর উত্তাপ সহ্য করিতে পারিল না, কারণ ৬০ ডিগ্রি উষ্ণতা গাছটির পক্ষে মারাত্মক। ফলে সাধারণ প্রাণীর মৃত্যুকালীন বিক্ষেপের মতন গাছটিরও ভীষণ বিক্ষেপ আরম্ভ হইল। জীবন-মৃত্যু, সংগ্রামের এই সন্ধিক্ষণে গাছ হইতে একটি প্রবল বিদ্যুৎতরঙ্গ বাহির হইয়া আসিল।

অনুসন্ধানরত হইয়া আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি তাহা অতীব বিস্ময়কর। একটি চারাগাছকে উষ্ণজলে ডুবাইয়া রাখিলাম তাহার প্লাবনশীলতা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিল ও জল ক্রমে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত হইলে তাহার জীবনী লক্ষণ একেবারে লোপ হইল এবং চারাগাছটি জলে ডুবিয়া গেল।

বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী আছে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। আমাব গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃক্ষের বেশ স্নায়ুমণ্ডলী আছে এবং বৃক্ষে চেতনার স্পন্দন যে ভাবে সঞ্চালক-স্পন্দনে পরিণত হয় তাহা হইতেই বেশ ধরা যায় যে বৃক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী অতীব জটিল। পবিমাণ ওজন করিবার কোনো যন্ত্র না থাকায় অতীতে বহু ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

জলের নল বা স্নায়ু

সকলেই অবগত আছেন যে বাহিরের বিষ বা উত্তেজক দ্রব্য নলের মধ্য দিয়া প্রবাহমান জলের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। নলটির উপর ক্লোরফর্ম প্রদান করিলেও উহার সংজ্ঞা লোপ হইবে না বা জলপ্রবাহ বন্ধ হইবে না এবং ইহার চতুর্দিকে বিষাক্ত ঔষধের প্রলেপ দিলেও উহার কার্যকরী শক্তি লোপ পাইবে না। কিন্তু প্রাণীদেহে এই সমস্ত ঔষধপ্রয়োগে স্থায়িভাবে বা সাময়িকভাবে প্রাণক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আমার গবেষণা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, প্রাণীদেহের স্নায়ুমণ্ডলী যে উপায়ে উত্তেজনা বহন করে উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীও ঠিক সেইভাবে কার্য করে।

বদ্ধ পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-পত্র

কোন পতঙ্গকে আলোকের সম্মুখে বাঁধিয়া রাখিলে সে যেমন একবার উপরে উঠিতে চেষ্টা করে আবার নীচের দিকে উড়িয়া আসে এবং বারংবার দক্ষিণে ও বামে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আলোকের দিকেই আসে উদ্ভিদ পত্রও আলোকের সম্মুখে ঠিক ওইরূপ করে।

রক্তসঞ্চালন ও উদ্ভিদ রসসঞ্চালন

উদ্ভিদদেহে কি উপায়ে রসসঞ্চালন হয় এই সমস্যা বহুকাল যাবৎ অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। এই রস সঞ্চালন জড় না চৈতন্যের ক্রিয়া? ট্রার্সবার্গার একটি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে বিষক্রিয়ার ফলে বৃক্ষের রসসঞ্চালনে কোনোরূপ বিঘ্ন হয় না। ইহার ফলে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিষয়টি ঠিক ভাবে বুঝাইতে সমর্থ হন নাই। জীবনীশক্তিবর্দ্ধক কয়েটি পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ওই সকল পদার্থ প্রয়োগে বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিতে পারা যায় এবং কতকগুলি বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে সজীব বৃক্ষের প্রাণহানি ঘটে। ইহা হইতে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, একটি স্পন্দনশীল তন্ত্রী সাহায্যে বৃক্ষের রসসঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। **এই তন্ত্রটিই বৃক্ষদেহে যুগপৎ হৃদযন্ত্র ও নাড়ীর ক্রিয়া সম্পাদন করে।**

মহীলতা (কেঁচো) প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে। উহার সাহায্যেই উহাদের দেহে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীদেরও একটি বিলম্বিত হৃদযন্ত্র আছে। আমি পরীক্ষা করিয়া ধরিতে পারিয়াছি যে উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে জড় ক্রিয়া নহে ইহা চৈতন্য ক্রিয়া এবং প্রাণিদেহে রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির সহিত উদ্ভিদ দেহেব

রসসঞ্চালন ক্রিয়ার কোনো পার্থক্য নাই। প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

(১) হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।

(২) বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদযন্ত্রের পরিবর্তন হয়।

(ক) কর্পূর প্রয়োগে হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

(খ) পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদ্‌ক্রিয়ার হ্রাস হয়।

(গ) স্ট্রিক্‌নিন অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয় এবং বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌ক্রিয়া অতি মাত্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে হৃদক্রিয়া একেবারে লোপ পায় এবং রক্ত ও রসসঞ্চালন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক শলাকা দ্বারা উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্রের অধিষ্ঠান স্থল নির্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ প্রযোগে রসসঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেই সমস্ত পদার্থ প্রয়োগে বৈদ্যুতিক স্পন্দনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সে সকল পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের ঐক্য প্রমাণিত হয় এক্ষণে সেই সমস্ত পরীক্ষার কথা বর্ণনা করিব।

ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌নেটিক ফাইটোগ্রাফ্‌

ইতিপূর্বে উদ্ভিদরস কীভাবে সঞ্চালিত হয় তাহা ঠিক করিবার এবং ওই রসাধারার অধিরোহণ বেগ মাপিবার কোনো উপায় ছিল না। আমার মনে হইল যে, একটি বিলম্বিত বৃক্ষপত্রকে প্রসারিত হস্তের মতন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে কারণ এই পত্রের উত্থান-পতন দৃষ্টে বৃক্ষে রস-সঞ্চালন হইতেছে বলিয়া বোঝা যায়। জলাভাবে যখন বৃক্ষের রস-সংগ্রহ শক্তি কমিয়া যায় তখন পত্রটি ঝুঁকিয়া পড়ে আবার রসসংগ্রহ শক্তি বৃদ্ধি পাইলে উহা সোজা হইয়া উঠে। এই উত্থান-পতন এত ধীবে-ধীরে হয় যে হঠাৎ দেখা যায় না। আমার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক লেখনী দ্বারা এই উত্থান-পতন খুব বড় করিয়া দেখা যায়। ওই লেখনী অদূরে বিলম্বিত পরদার উপর আলোক বিন্দুপাত করিয়া পত্রের আন্দোলন জ্ঞাপন করে। পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে উদ্ভিদের হস্তখানি (বিলম্বিত পত্রটি) যে ঝুঁকিয়া পড়ে, পরদার উপর তাহার আলোক রেখাপাত হয়, আবার উত্তেজক (কফি) প্রয়োগে যে অবসাদগ্রস্ত বৃক্ষে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখাপাত হয়। এই ভাবেই মৌন প্রাণ সুস্পষ্ট সঙ্কেতে স্বীয় অস্তিত্বের ও জীবনযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কার্ডিওগ্রাম ও স্ফিগমোগ্রাম্‌

প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং ঔষধ প্রয়োগে ওই ক্রিয়ার পরিবর্তন কার্ডিওগ্রাম যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিছুদিন পরীক্ষা করিবার পব আমি দেখিতে পাই যে, এই যন্ত্র লিখিত কলের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ভুল থাকিয়া যায়। কারণ লেখনী ও লিপিধারকের পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ হওয়ার ফলে লিখনকার্য বিঘ্ন ঘটে। তাহা ছাড়া উহাতে হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণের স্থিতিকাল ঠিক ঠিক মাপা যায় না। এই জন্য আমি রেজোনেন্ট রেকর্ডার (Resonant Rccorder) নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। উক্ত যন্ত্র সাহায্যে এক

সেকেন্ডের এক শতভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের কতবার সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয় তাহা ধরা যায়।

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্ (Sphygmoraph) নামক যন্ত্র সাহায্যে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারাও পরোক্ষভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় আবার ক্রিয়া হ্রাস হইলে রক্তচাপও হ্রাস হয়। মণিবন্ধের নিকটস্থ শিরাটির স্পন্দন সহজেই ধরা যায় কিন্তু যেখানে শিরাটি স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেখানে ইহার স্পন্দন উপলব্ধি করা অসম্ভব।

অপ্টিক্যাল স্ফিগ্‌মোগ্রাফ

বৃক্ষের নাড়ী পরীক্ষা কার্য স্বভাবতঃই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার জন্যই যদি বৃক্ষে রসসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে সর্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ দ্বারা ওই যন্ত্রের সঙ্কোচন প্রসারণের পরিমাণ মাপা সম্ভব নহে। পরন্তু বৃক্ষের প্রাণময় কোষসমূহ উহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই অদৃশ্য অব্যক্তকে কি উপায়ে ব্যক্ত করা যায়?

আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। উদ্ভিদরস যখন কাণ্ড আশ্রয় করিয়া উপরে উঠিতে থাকে সেই সময় বৃক্ষের কীরূপ হৃদ্‌স্পন্দন হয় আমি সর্বপ্রথমে তাহাই ধরিতে চেষ্টিত হইলাম। স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের কাণ্ড খুব সামান্যভাবে স্ফীত হয়। স্পন্দন তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার পরেই আবার কাণ্ড পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবর্ধক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষের রসসঞ্চালন বেগ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ কাণ্ড স্ফীত হইবে এবং বিপরীত ঔষধ প্রয়োগে বিপরীত ফল দৃষ্ট হইবে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম সঙ্কোচন-প্রসারণ পরিমাপের নিমিত্ত আমাকে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। প্ল্যান্ট ফিলার (Plant Fecler) বা অপ্টিটিক্যাল্ স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্ (Optical Sphygmograh) নামক যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি তাহার সহিত সচল ও অচল দুইটি শলাকা যুক্ত রহিয়াছে। বৃক্ষের কাণ্ডটি এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয়। সচল শলাকাটির অগ্রভাগ ঈষৎ নাড়িলে যাহাতে সেই স্পন্দন পাঁচ কোটি গুণ বড় করিয়া দেখা যায় এবং তাহার রেখাপাত হয় আমি এইরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছি। মৃত বৃক্ষকে এই শলাকাদ্বয়ের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে আলোক-রেখা নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে—কারণ মৃত বৃক্ষের হৃদ্‌স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দন আলোক রেখার কম্পন দেখিয়া বোঝা যায়। জীবিত বৃক্ষের নাড়ীর স্পন্দনের হার প্রতি সেকেন্ডে একবার। অবসাদ-প্রদায়ক ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষে রসচাপের হ্রাস পায়; ফলে আলোক রেখা বাম দিকে (মৃত্যুর দিকে) আবর্তিত হয়; আবার উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে আলোক রেখা দক্ষিণ দিকে (জীবনের দিকে) আবর্তিত হয়। এই সঞ্চরমান আলোকরশ্মিই সর্বপ্রথম উদ্ভিদ জীবনের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস ও অবসাদ ব্যক্ত করিল।

উপক্ষার (Alkaloids) ও নাড়ী-স্পন্দন

প্রাণী ও উদ্ভিদের নাড়ী স্পন্দনে ওষধি ও উপক্ষারের প্রভাব একই প্রকার। যে সমস্ত ঔষধ প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে ঠিক সেই সমস্ত ঔষধই উদ্ভিদের রসসঞ্চালন

শক্তি বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে অবসাদজনক ঔষধ প্রয়োগে উভয়ের দেহেই অবসাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সর্প বিষের ফল

প্রাণীদেহে অতি সামান্য মাত্রায় গোখুরা সর্পের বিষ প্রয়োগ করিলে মারাত্মক লক্ষণ দেখা যায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উদ্ভিদ দেহেও সর্প বিষের ক্রিয়া ওইরূপ। ভারতবর্ষে প্রায় সহস্র বর্ষ যাবৎ প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্প বিষ হইতে প্রস্তুত সূচিকাভরণ ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে. আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, অতি সামান্য পরিমাণ সর্প বিষ উদ্ভিদের হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম

প্রাণযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা, অদৃশ্য জগৎকে দৃশ্যমান করা, মৌন জগতের ব্যাকুলতা শ্রবণ করিতে সমর্থ হওয়া—এই সমস্ত অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করা কি অত্যাশ্চর্যজনক নহে?

মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম অতিশয় করুণ—বৃক্ষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামও সেইরূপ করুণ। আমার যন্ত্র সাহায্যে উদ্ভিদ জগতের এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম লোকচক্ষুর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। বিষ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষ কিরূপ দ্রুতগতিতে মৃত্যু-রেখার দিকে ধাবিত হয় আবার উত্তেজক ঔষধ প্রদান করিলে মরণোন্মুখ উদ্ভিদের প্রাণ কীরূপে আবার আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহা চক্ষুর সমক্ষে প্রতিফলিত হয়।

অবিচলিত চিত্তে জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ এরূপ শক্তি অর্জন করিতে পারে যাহা দ্বারা সে প্রাণযন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহাকে অবসাদগ্রস্ত বা উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয়।

প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ

বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী

মানুষের অঙ্গভঙ্গি হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকাল বেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তি হেতু তাহা পরিবর্তিত হয়। সুখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্তনজনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গভঙ্গি বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা ফণিনী মুহূর্তেই সংহাররূপিণী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন-দিন পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সংস্থিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনেব এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুক্ত হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকালবেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে সূর্যমুখী গাছটি পূর্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে প্রত্যেক পাতার উপর যেন সূর্যরশ্মি পূর্ণরূপে পতিত হয়। ইহার জন্য কোনো পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিংবা বামদিকে পাক খাইয়া সূর্যকিরণ পূর্ণ মাত্রায় আহবণ করে। বৈকালবেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিম গগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল? বাহিরের সহিত ভিতরের একী অদ্ভুত সম্বন্ধ! সূর্য তো প্রায় পাঁচকোটি ক্রোশ দূরে, তবে কি রাখিবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল?

উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, সূর্যমুখীর এই ব্যবহার 'হিলিও-ট্রোপিজম্' জনিত। হিলিও-ট্রোপিজমের বাংলা অনুবাদ, সূর্যের দিকে মুখ হওয়া। সূর্যমুখী কেন সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হয়? কারণ 'সূর্যের দিকে মুখ' হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোনো বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন কোনো দুর্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে সেই মন্ত্রটি সংস্কৃত, লাটিন কিংবা গ্রিক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাঙ্গালায় কিম্বা অন্য আধুনিক ভাষায় হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। এইজন্যই গ্রিক হিলিও-ট্রোপিজম্ মন্ত্রে সূর্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল।

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এইসব অঙ্গভঙ্গী অদৃশ্য জীব বিন্দুর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত হয়। জীববিন্দুর পরিবর্তন অনুবীক্ষণ

যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহু চেষ্টার পর বিদ্যুৎ বলে এই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই বিষয়ে দুই একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসানো একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধ্র দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক রেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসানো লতাটি যদি জানালার নিকটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনবায় নূতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং কোনগুলি বামদিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থূল পেশি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখন ডানদিকে কিংবা কখনও বামদিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, পাতার গোড়ায় একটি মাত্র পেশি আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশির আকুঞ্চন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে লজ্জাবতীর পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশি আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশির দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর একটির দ্বারা নীচের দিকে নামে, অন্য একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশির দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, পালক দ্বারা উপরেব পেশিটুকুতে সুড়সুড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই ঊর্ধ্বগতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশিকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বামদিকে বা ডানদিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে ওইরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্যের আলো এইরূপে পেশির নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায়। তবে সূর্যের আলোক তো সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্র মূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড় ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোট ডাঁটা সংযুক্ত এবং সেই ছোট ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাতা থাকে। আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরেই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া তো সেই দূরের স্থূল পেশির আকুঞ্চন প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোট পাতাগুলি অনুভব জনিত উত্তেজনায় কি সঙ্কেত কোনো পথ দিয়া দূরে পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে চারিটি ছোট ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্যন্ত চারিটি স্নায়ুসূত্রে প্রসারিত। তাহা দ্বারাই খবরাখবর পৌঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতাগুলিকে কোনো রূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সূত্র দিয়া পত্রমূলের একনম্বর পেশিতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বাম দিকে পাক খাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ওইরূপে উত্তেজিত করিলে ডান দিকে পাক খায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড় পাতাটি নীচের

দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বলগা টানিয়া সঙ্কেত পাঠায়?

কেবল তাহাই নহে। কোনো নির্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য একটি বলগা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশাহীন তবে এক দিকের টান! অন্তত দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক দাঁড়ের নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে, কেবল তখনই দুইটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং সে সোজাপথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্য একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন সোজাসুজি আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমান ভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে জীবনে কিংবা মরণে!

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব-দিগ বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে, কখনও ঊর্ধ্বে, কখনও বা আধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার জন্য অন্তত চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতী পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশিতে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ না চারিটি ডাঁটার পত্র-সমষ্টি সমান ভাবে আলোকমুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বলগার টানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিংবা বামে, ঊর্ধ্বে কিংবা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে? দিবাকর নিজেকে, কোটি-কোটি অংশে বিভক্ত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্যদেবের শত-শত মূর্তি মেঝেব উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বলগা তাহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি-জীব বিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরুপণ করিয়া থাকেন। জীবন ও জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমাব তেজোরশ্মিকে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন!

প্রবাসী, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

কচুরিপানা

কচুরিপানার (Water Hyacinth) উৎপাতে আমাদের বাংলা দেশের কৃষিকার্যের যে কী প্রকার অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জন্মিয়া ধীরে-ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহার দ্বারা যে কৃষিকার্যের বিঘ্ন হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। এখন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কৃষিযোগ্য ভূমিই এই পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গেরও স্থানে স্থানে ইহার উৎপাত অনুভূত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের ভূমি উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেখানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না; চাষের হাঙ্গামাও সেখানে খুব কম। তাই সেখানকার জমিতে সোনা ফলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কচুরিপানার উৎপাত যে প্রকারে বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের উর্বরতা যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না।

কচুরিপানার উৎপাত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে তাহা নহে, আমেরিকাতেও ইহার উৎপাত কম নয়। সেখানে আজও এই উৎপাত নিবারণ করা যায় নাই। ইহা শুনিয়া হয়তো কেহ কেহ বলিলেন—তবে আর কী, যাহাদের এত টাকা, এত আয়োজন, তাহারা যখন পানা নষ্ট করিতে পারিল না, তখন আমাদের চেষ্টা বৃথা। আমরা এই প্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, আমেরিকা পারিল না বা অপর কোনো দেশ পারিল না বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা ফলবতী হইবেই। এখানে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে,—অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই আধিপত্য ছিল, তখন আমাদেরই পূর্ব পুরুষেরা উদ্ভিদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া অরণ্য ভূমিকে কৃষিক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন অরণ্য মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া এইক্ষণে উদ্ভিদেরই এক বংশধর মাথা চাড়া দিয়া আজ আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের হাতে অস্ত্রের তো অভাব নাই। উদ্ভিদের সহিত মানুষের এইপ্রকার সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। কোনো প্রাণী বা কোনো উদ্ভিদ নিজের বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে দখল করিয়া বসুক ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই কোন জীব যাহাতে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে তাহার জন্য প্রকৃতিতে অনেক ব্যবস্থা আছে। প্রথমত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় অনেক জীব মারা যায়। তাহার পরে এক জাতীয় জীব আর এক জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, মানুষের সহিত পশুর এবং প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের নিয়তই সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে যে জীব যতই অধিকার পাইবার যোগ্য তাহা আপনা হইতেই পায়। যদি কোনো কারণে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্রুত বংশ বিস্তারের কোনো বাধা না থাকে, তবে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়

উৎপাত। অস্ট্রেলিয়াতে খরগোস ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানে এক জোড়া খরগোশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র জন্তুর বংশবিস্তারে অস্ট্রেলিযাতে এখন এত খরগোশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহাদের উৎপাতে কৃষিকার্যের ক্ষতির আশঙ্কা হইতেছে। কোনো এক খেয়ালি লোক ইংলন্ড হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর ছিল। অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই পোকাদের বংশধরগুলি এখন আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে ভয়ানক বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে মূল্যবান পাইন গাছ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাকেই বলে উৎপাত। আমাদের দেশে কচুরিপানাও কতকটা এই বকমেরই উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের শৈশব উপাখ্যানের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্র সেই প্রকাণ্ড রাক্ষসটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ রাক্ষসটার প্রাণপুরুষ ছিল চৌদ্দ হাত জলের তলায় স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরে লুকানো। আমাদের ও অন্য দেশের রাজপুরুষেরা কচুরিপানা বিনাশের জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজপুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতোই বৃথা হইয়া যাইতেছে। কারণ ইহারা কেহই জানেন না পানা রাক্ষসীর প্রাণপুরুষটা কোথায় লুকানো আছে। এইজন্য লক্ষ্য স্থির না করিয়া লক্ষ্য ভেদের চেষ্টার ন্যায় ইহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। কচুরিপানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া, কী প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং কোন অবস্থা তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল, এই সকল তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই সকল তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাই পানা বিনাশের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেগুলি অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ প্রায়ই বিজ্ঞানকে যাদুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন কোনো প্রাকৃতিকে উৎপাতে ভীত হইয়া পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই, মন্ত্রবলে উৎপাতের শান্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকেরা সুযোগ ছাড়ে না। তাহারা বৈজ্ঞানিক সাজিয়া নানা আড়ম্বরে জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধ করে। লোকে ভাবে ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী। কোনো অজ্ঞাত ব্যাপারের মূল কথা জানিয়া কার্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভড়ং দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি অনুসন্ধানের বাহ্য শাখা-প্রশাখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করেন। কত অবাস্তব ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে তাহার ইয়ত্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞানিক এই সকল অবান্তর ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মূলতত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র। গাছের রস কী প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা এ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যার একটি প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া ছিল। পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অবিরাম চেষ্টার পর এখন রস প্রবাহের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবান্তর ব্যাপারগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং পরে সেই লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া আবিষ্কারের মূলসূত্র।

কচুরিপানার গাছটি কীরূপ এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। গঙ্গার তীরে

সিজ্‌বেড়িয়া নামক স্থানের একটি খালে নিবিড় পানা আছে। গাছগুলি কখন কখন দুই হাত পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং স্থানে স্থানে সেগুলি এমন নিবিড় ভাবে জলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে পানার উপর দিয়া মানুষও হাটিয়া চলিতে পারে। একটি বিচ্ছিন্ন কচুরিপানার গাছ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন পাতা সমেত গাছটি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ। এক একটি গাছে কখনও কখনও দেড় শতেরও অধিক শিকড় থাকে। কেবল ইহাই নয়, এই পানাগুলি আবার জলের তলায় লতাইয়া চলে এবং ইহাতে তাহাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচুরি বংশ বিস্তারের ইহাই একমাত্র উপায় নয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। কচুরিপানার পাতার ডাঁটাগুলিও অদ্ভুত,—সে গুলি ফাঁপা ধরনের,—তাই জলে ভাসে।

যাহা প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের মন সর্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ অনেক। ইহাতে আসল কথা চাপা পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বাঁধা নিয়মে কচুরিপানা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে আসলকে ঠেলিয়া ঝুটাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন। পানার চকচকে পাতা ও ফুলগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তাঁহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে পাতা ও ফুল নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু গাছ মরে নাই। গাছগুলি যে লম্বা শিকড় চালাইয়া জলের তলা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহা ইহাদের নজরে পড়ে নাই। এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পুষ্করিণী হইতে পানা উঠাইয়া ফেলিলে দেখা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে-ধীরে তাহা আবার পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে দুই-চারিটা শিকড় জলের তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নূতন পাতার উৎপত্তি করে। জলের ভিতরকার শিকড় নষ্ট করিতে না পারিলে এই শত্রুর বিনাশ নাই। যাঁহারা পানা নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায়ে অবলম্বন করেন, তাহাদিগকে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। কচুরিপানার একটি ক্ষুদ্র শিকড় হাজার হাজার নূতন গাছের সৃষ্টি করিয়া দশবিঘা স্থানকে কয়েক মাসের মধ্যে আচ্ছন্ন করিতে পারে।

এখন কচুরিপানা বিনাশের উপায় কী, তাহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি উপায়ের কথা মনে হয়,—

(১) পানার গায়ে ছত্রক জাতীয় (Fungal Parasites) পরাসক্ত জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।

(২) উত্তপ্ত জলীয়বাষ্প প্রয়োগ করা।

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা।

(৪) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্ট করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। বিষস্য বিষমৌষধম্ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। পানা মারিবার জন্য যে ছত্রকের আমদানি করা হইবে, তাহা ধান, পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা বলা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। সাপ মারিবার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিস্ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আমদানি করা হইয়াছিল। ইহাতে সাপের উপদ্রব কমে নাই, কিন্তু বেজিদের উৎপাতে লোকের হাঁস

বা অপর পাখি পোষা দায় হইয়াছে। কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের শান্তি করিতে গিয়া আর এক নূতন উপদ্রবকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। পানা মারিবার জন্য ছত্রকের আমদানি করিলে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকা বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে। আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তা ছাড়া ল্যাঙলে আকাশযান উদ্ভাবন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকাতে ঝুটা বিজ্ঞানের আড়ম্বরে আসল বিজ্ঞান চাপা পড়িতে বসিয়াছে। ইউনাইটেড স্টেট্‌সে কচুরিপানা নষ্ট করিবার জন্য জলীয়বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গায়ে লাগানো হইয়াছে। পানা নষ্ট করার এই পদ্ধতির প্রশংসা খবরের কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে। বহু ব্যয়ে বর্মাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনো স্থানেই সুফল পাওয়া যায় নাই। গরম জলীয়-বাষ্প নলের মুখ হইতে বাহির হইয়া কেবল পাতাগুলোকে ছিঁড়িয়া এবং বিবর্ণ করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই। আশা ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, তাহারা আর জলীয-বাষ্প দিয়া পানা নষ্ট করিবার পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অদম্য; সাধারণ উপায়ে গরম জলীয়বাষ্প দ্বারা পানা মরিল না দেখিয়া তাঁহারা কলকারখানা বসাইয়া যতদূর সম্ভব চাপ প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জলীয়বাষ্প পানাগাছের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ইহারও ফল পূর্ববৎ হইল, পানা মরিল না। আমাদের দেশেও পানা মারার এই অভিনয় অনুকৃত হইযাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রকার একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্বে কত উষ্ণতায় পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না।

জখম হইলে গাছের পাতা ও ডাল প্রভৃতির অবস্থান্তর ঘটে। দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এগুলি সত্যই মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর লক্ষণ লইয়া বসুবিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কোন্ গাছ জীবিত অবস্থা ছাড়িয়া ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যুর কোঠায় পা দিল, তাহাও বৈদ্যুতিক উপায়ে সেখানে নিরূপিত হইয়াছে। কচুরিপানা মৃত্যুলেখ যন্ত্রের (Death Recorder) আধারস্থ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া জলের উষ্ণতা ধীরে-ধীরে বর্ধিত করা হইয়াছিল। যখন জলের উষ্ণতা সেন্টিগ্রেডের ৬০ অংশ (অর্থাৎ ফারেনহাইটের ১৪০ অংশ) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে পানার মৃত্যুরেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কচুরিপানা ১৪০ অংশ উত্তাপ দ্বারাই মরিয়া থাকে, তাহা পানা নাশকারী সরকারি কর্মচারীরা জানিতেন না। তাঁহারা যে জলীয়বাষ্প দিয়া পানা নাশ করিতে গিয়া অজস্র অর্থ নাশ করিয়াছেন তাহা উষ্ণতার অভাবে হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প দ্বারা জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই। কাজেই উপরকার পাতাগুলি ঝলসাইয়া গেলেও পানা মরে নাই। মৃত্যুকালে যেমন প্রাণীদের সর্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায়, উদ্ভিদের মৃত্যু সময়েও ঠিক সেইপ্রকার আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন অনেক বিষপদার্থ আমাদের জানা আছে। বিষ মিশ্রিত জল পিচকারির মতো কোনো যন্ত্র দ্বারা পানার গায়ে ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া যায় নাই। নিবিড় পাতার

আবরণ ভেদ করিয়া বিষজল গাছের সর্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে নাই। সিক্ত করিলেও বিষ শিকড়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বিষ প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয়বাষ্প পানার পাতাই ঝলসাইয়াছিল, ইহাতে পাতা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের তলার শিকড় মরে নাই,—কাজেই গাছও মরে নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষজল ছিটাইয়া দিলে তাহাতে উহার শিকড় মরিবে কি? সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ডগায় বিষ লাগাইলে তাহা গোড়ায় গিয়া পৌঁছিবে, ইহা অনুমান করিয়া কর্তৃপক্ষেরা বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "বসুবিজ্ঞান মন্দিরে" এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কী প্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া রস প্রবাহ চলাচল করে তাহা ওই সকল গবেষণার ফলে স্পষ্ট জানা গিয়াছে। এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের প্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার রসপ্রবাহের সহিত নীচু হইতে উপর দিকে চলে,—বিষ উপর হইতে নিচু দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা কখনও ঘটে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বিষ দিয়া পানা মারিতে হইলে বিষজল পানার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই মোটা কথাটি না জানার জন্য যে সময় ও অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয়। পূর্বে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা আমরা অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া বলি নাই। পরীক্ষাতে উক্তিগুলির সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। শিকড়ে বিষজল প্রয়োগ করিলে তাহা রসপ্রবাহের সহিত উপরকার সর্বাঙ্গে ছড়ায়।

তাই গাছটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের দিক হইতে মরিতে আরম্ভ করে। বিষ প্রয়োগে কেবল যে কচুরিপানারই এই প্রকারে মৃত্যু ঘটে তাই নয়। একটি সতেজ চন্দ্রমল্লিকার গাছের মূলে বিষ প্রয়োগ করিলে রসের সহিত গোড়ার বিষ উপরের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গাছটিকে মারিয়া ফেলে।

গাছের গোড়ায় বিষ প্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় লাগাইলে কি হয়, এখন দেখা যাক। আগায় বিষজল ছিটাইয়াই কচুরিপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লোহা বা অপর ধাতব বস্তুর আগা গরম করিলে ক্রমে তাহার গোড়া গরম হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া বিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হয় না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কচুরিপানার একটি ডাঁটা সমেত পাতাকে বিষজলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল বিষ নীচের দিকে নামে নাই—যে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল কেবল তাহাই মরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। কেবল কচুরিপানাতেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নহে, চন্দ্রমল্লিকার একটা ডাঁটাকে ঠিক ওই প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া অবিকল ওই ফলই পাওয়া গিয়াছিল।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে, কচুরিপানার বিনাশকে লোকে যে একটা মহাসমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল এখন তাহা মনে করার হেতু নাই। পাতা, ফুল বা ফল নষ্ট করিলে ইহা মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে—সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই এখনকার কর্তব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের

গভর্নমেন্ট সাবধান হইতে পারিবেন। আশা করি, সাধারণের অর্থ আর মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যয়িত হইবে না।

কি করিয়া পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ করা উচিত ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এসম্বন্ধে এই মত যে কচুরিপানা জল হইতে সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করাই আমাদের এখনকার কর্তব্য। ইহাতে খরচপত্র আছে জানি, কিন্তু এই খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্পই হইবার কথা। তা ছাড়া এই শ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হইবে না। দেশের টাকা প্রজাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হইবে। কচুরিপানা নষ্ট হইলে কৃষিকার্যে যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় এই ব্যয় অতি সামান্য। একই সময়ে সকলের সমবেত চেষ্টায় এক একটি স্থান একবারে পানা বর্জিত করিতে হইবে। নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিষ্কৃত স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরিপানা যে কি সর্বনাশ করিতেছে কৃষিজীবীরা তাহা বুঝিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়া একত্র পানানাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য আইন জারির প্রার্থনা করিতেছেন। আইন মাত্রেই কঠিন ও নির্মম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হয়, তাহার জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে। সকলে একত্র খাটিয়া পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি এই ভাবটি মনে বদ্ধমূল করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করা যায়। যাহা হউক, রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শান্তি হইবে।

'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতেছিল। সেই কার্য বন্ধ রাখিয়া আমরা কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কার্যে যোগ দিব। কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে এই উদ্ভিদের জীবনের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা কী প্রকারে বংশবিস্তার করে তাহা আরও ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে কচুরিপানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আমাদের কোনো লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিতে পারা যায় কিনা। এই প্রকারে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে; তাহা হইলে পানা তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়া যাইবে। যাহারা এই সকল অনুসন্ধানের কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের সত্যই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কিনা তাহা সর্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে চলিবে না। সুবিবেচনা করিয়া হাতেকলমে কাজ করিবার দক্ষতা ইহাদের থাকা চাই। তাহা ছাড়া যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে তাঁহাদের গবেষণার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞেরা ইহাতে তাঁহাদের কার্য কোন্ পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কার্যের সমালোচনা করিবারও সুযোগ পাইবেন। সম্প্রতি একজন সহকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্পনা করিতেছেন, কচুরিপানাকে কাগজ প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে কোনো উদ্ভিজ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাগজ প্রস্তুতের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়।

এই প্রক্রিয়ার খরচা উঠাইয়া সেই উপাদানে এখনকার মতো সস্তায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে কিনা, ইহা সর্বাগ্রে দেখা কর্তব্য। তাহা না করিলে সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আর একটি জনরব শুনিয়াছিলাম, কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি আর কতগুলি উদ্ভিজ সামগ্রীকে লাভজনক কার্যে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আজকাল আর তাহার কথা শুনিতে পাই না।

যাহা হউক, কচুরিপানা আমাদিগকে যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে তাহা সামান্য নয়। ঘোর বিপদের সময়েই লোকে একত্র হয় এবং একত্র হইয়া বিপদ নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখন তাহারা প্রত্যক্ষ করে। এই মনুষ্যত্বই বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে খর্ব করে এবং শেষে জয়ী হয়। অতীত যুগে এই মানুষই বহু বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া এই পৃথিবীকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়াছিল। আজ আবার সেই মানুষকেই আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মপটু ও মিতব্যয়ী হইয়া এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমস্ত মানবের অকল্যাণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তাহাতে অকল্যাণ দূর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার বল সঞ্চিত হইবে।

(বসুবিজ্ঞান মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ভ্রমণ বিষয়ক রচনা

লুপ্ত নগরী

ইটালির দক্ষিণ প্রদেশ অতি রমণীয়,—সমস্ত প্রদেশটি যেন একটি উদ্যান। এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সচরাচর দেখা যায় না।

রোমানরা এই প্রদেশে সমুদ্রের উপকূলে সমৃদ্ধিশালী নগর নির্মাণ করিয়া অবকাশের সময় সে স্থানে আমোদপ্রমোদ করিতে আগমন করিত। এইসব নগরের মধ্যে হেরাক্লিয়াম এবং পম্পেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ভিসুভিয়স্ পর্বত ইহাদের অতি সন্নিহিত; এই পর্বত হইতে কোন বিপদ ঘটিতে পারে, লোকে এরূপ আশঙ্কা করে নাই। তাহারা নির্ভয়ে তাহার চারিপার্শ্বে সুন্দর ফুলফলপূর্ণ বাগান ও সুশোভন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়স্ অগ্নিবৃষ্টি করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই দুইটি নগরী পৃথিবী হইতে মুছিয়া লইল!

৭৯ খ্রিঃ অব্দে ২৩ আগস্ট তারিখে প্রথম ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হয়, ভূমিকম্প সাধারণ ঘটনা বলিয়া অধিবাসীরা কিছু মনে করে নাই। পূর্ববৎ সব কার্যই চলিতে লাগিল।

রাত্রে নাট্যশালাতে গীতবাদ্য হইতেছে,—অতি প্রকাণ্ড আম্পিথিয়েটারে সিংহ ও মানুষে লড়াই হইবে। দর্শকে আমোদভবন পূর্ণ, সকলেই আমোদে মত্ত! এমন সময়ে অকস্মাৎ ভিসুভিয়সের শিখর হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্তে আকাশ অগ্নিময় হইয়া গেল! বজ্রধ্বনিতে পৃথিবী পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতে লাগিল। ভিসুভিয়সের গহ্বর হইতে অগণ্য জ্বলন্ত প্রস্তর চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তারপর উত্তপ্ত কর্দমবৃষ্টি, তারপর ভস্মবৃষ্টি।

নগরবাসীরা হঠাৎ বজ্রধ্বনি ও অগ্নিপাতে ভীত হইয়া যে যেখানে পারিল পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় পুত্র, কোথায় কন্যা, কোথায় স্ত্রী সকলে ভীতস্বরে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বাহিরে অন্ধকার, তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া রাস্তায় বাহির হইল, কিন্তু হায়! যে আলোকের সাহায্যে তাঁহারা পলায়ন করিবে ভাবিয়াছিল, সে আলোক ভস্মপাতে নিবিয়া গেল। তখন লোক স্রোতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা পথ ভুলিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল যখন ভিসুভিয়সের অগ্নিশিখায় মুহূর্তের জন্য দিক আলোকিত হইতেছিল, তখন সকলে পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল, যাহাদের লইয়া একত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহারা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কাতর আহ্বানে কেহ আর প্রিয়জনের উত্তর পাইল না।

ক্রমে লোকেরা ক্লান্ত ও হতাশ্বাস হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল—তখনও ভস্ম পতনের বিরাম নাই। স্তরে স্তরে ভগ্নস্তূপ উন্নত হইয়া পলাতকদিগের আপাদমস্তক প্রোথিত করিল।

পলাতকদের তো এই ভীষণ পরিণাম। কেবল কয়েকজন পলায়ন করিতে চেষ্টা করে নাই,—নগরের রোমান প্রহরীরা নগর রক্ষাতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ পায় নাই। সুতরাং স্বস্থানে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর তাহাদের প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল দেহ পাওয়া গিয়াছে।

শত শত বৎসর পূর্বে এই নগর দুইটির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। খনন করিতে করিতে দৈবাৎ প্রোথিত গৃহের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। তখন হইতে ইটালিয় গভর্নমেন্ট নিয়মিতরূপে খনন করিয়া ভস্ম ও কর্দমের স্তূপ পরিষ্কার করিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্বের নগর এখন মনুষ্যগোচর হইয়াছে।

নেপলস্ হইতে আমরা পম্পেই দেখিতে যাই, কী আশ্চর্য! দুই সহস্র বৎসর ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তবু মনে হয় না, ইহা এত পুরাতন।

এই যে রাস্তা দিয়া চলিতেছি এই রাস্তায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্ট রহিয়াছে। বৃষ্টি হইলে রাস্তায় জল জমিত, জুতা যাহাতে না ভিজিয়া যাইতে পাবে, সেজন্য রাস্তার মাঝে মাঝে পাথর বসানো ছিল, এখনও সেই পাথরগুলি যথাস্থানে রহিয়াছে, রাস্তার পাশ দিয়া জলের পাইপেব নলগুলি এখনও দেখা যাইতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি, ভস্মচাপে অনেক জীবন্তই সমাহিত হইয়াছিল। তাহাদের দেহ ভস্মে আবৃত হইয়া এতকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত ছিল। একটি গৃহে অনেকগুলি মৃতদেহ দেখিলাম। তাহা দেখিয়া সেই দুর্দিনের ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। এই যে পুরুষটি দেখিতেছ, সে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, হাত তুলিয়া ভস্মপাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার নিকটেই একটি কুকুর যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

নগরের একস্থানে দেখিলাম, রন্ধন-গৃহ হইতে পাচক বাহির হইতে পারে নাই, সে সেস্থানেই রহিয়াছে—উনানে রন্ধনের বস্তু রহিয়াছে, কেবল একটু পুড়িয়া গিয়াছে। রুটিখানি পর্যন্ত যেমন তেমনি রহিয়াছে। অন্যস্থানে একটি স্ত্রীলোক হস্তে অলঙ্কারের বাক্স লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ছাদ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুলের ছাত্র সঙ্গীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া প্রাচীরে কি লিখিয়াছিল, সে লেখা এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে। রাস্তায় "আমার জন্য ভোট দাও" এরূপ প্রার্থনা আছে। একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলাম, সম্মুখে বাহির-বাড়ি, তারপর বৈঠকখানার, আহারের গৃহ, শয়ন গৃহ, পূজার গৃহ, রন্ধন গৃহ। বৈঠকখানার প্রাচীরে নানাপ্রকার চিত্র, আজ পর্যন্ত সে চিত্রের বর্ণ ম্লান হয় নাই। ভাণ্ডার গৃহে জালায় শস্য রক্ষিত হইত সে জালাগুলি তেমনিই আছে!

ঘরের প্রদীপ আমাদের দেশের মাটির প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপদানগুলিও সেইরূপ। বাড়ির পশ্চাতে বাগান।

সে কালের থিয়েটার দেখিতে গেলাম, বসিবার বেঞ্চগুলি পাথরের। স্ত্রীলোকের বসিবার জন্য স্থান স্বতন্ত্র ও প্রবেশদ্বার স্বতন্ত্র; থিয়েটারের অনতিদূরেই সৈন্যগার। চারিজন সৈন্য কি অপরাধে কারাগারে বন্দি ছিল। দেওয়াল সংলগ্ন লৌহশৃঙ্খলে তাহাদের পদ আবদ্ধ ছিল, সেই হতভাগ্যদের কঙ্কাল সেইরূপে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

তারপর রোমানদের স্নানাগারগুলি দেখিতে গেলাম। তাহাদের স্নান করিবার বিশেষ আড়ম্বর ছিল, কখনও কখনও তাহারা দিনের মধ্যে সাতবার পর্যন্ত স্নান করিত। অনেকে সমস্ত দিন এখানে কাটাইত। স্নানাগারের সর্বপ্রথমে একটি বৈঠকখানা গৃহ, এই গৃহে শহরের যে স্থানে যে আমোদ প্রমোদ হইত; তাহার বিজ্ঞাপন থাকিত। স্নানাগারে স্নানের বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম। এক ঘরে মার্বেলের কৃত্রিম জলাশয়ে শীতল জল পূর্ণ থাকিত, অন্য ঘরে উষ্ণবাষ্প-

স্নানের বন্দোবস্ত। স্নানাগারের নিকটেই ব্যায়াম-গৃহ। এই সকল দেখিয়া আমরা সেকালের এক ডাক্তারের গৃহ দেখিতে গেলাম। এই গৃহে অস্ত্রচিকিৎসার বিবিধ অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে; সেইসব অস্ত্র এখনকার অস্ত্র হইতে কোন অংশে হীন নহে।

তারপর যেখানে বাজার বসিত সে স্থান দেখিতে গেলাম। এখানে দোকানির দাঁড়িপাল্লা, নানা রকমের অলঙ্কার। বেশভূষার দ্রব্যাদি, পাশা খেলার সরঞ্জাম, এমনকী থিয়েটারের টিকিট পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। নগরের অনেক অংশ এখনও মাটির নীচে, প্রত্যহ খনন করিতে করিতে নূতন গৃহ বাহির হইতেছে। যেস্থানে খনন হইতেছে আমরা সেস্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। মজুরেরা ভস্মস্তূপ অতি সাবধানে খনন করিয়া দূরে ফেলিতেছে, ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হইতেছে, প্রথমে প্রাচীরের একটু চিহ্ন দেখা যায়, তারপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত গৃহ বাহির হইতে থাকে। একে একে গৃহস্থালীর দ্রব্য, বাসনপত্র, অলঙ্কার, এমনকি গৃহস্বামীকে পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। একস্থানে গৃহস্বামী কুড়ালী দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহার কঙ্কালের সম্মুখে কুড়ালী পাওয়া গিয়াছে।

আমরা সমস্তদিন পর্যটন করিয়া এই লুপ্ত নগরী দেখিলাম। সন্ধ্যা হইলে ক্ষণিক কাল একটি উচ্চস্থানে বসিয়া নগরটি শেষবার দেখিয়া লইলাম। অদূরে ভিসুভিয়সের শিখর হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। আমাদের সম্মুখে সমস্ত নগরীটি প্রসারিত। এই স্থান হইতে সমস্ত পথগুলি দেখা যাইতেছিল। রাস্তার দুধারে গৃহশ্রেণি, অট্টালিকা ও মন্দির দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু রাজপথে লোক সমাগম নাই। ছেলেবেলা গল্পে এক রাজার দেশের কথা শুনিয়াছিলাম। সে রাজ্যে অশ্বশালায় অশ্ব, হাতীশালে হাতী, রাজগৃহে রাজপুত্র ও রাজকন্যা রহিয়াছে, কিন্তু সকলেই মৃত। তখন সেই গল্পের কথা মনে হইল। মনে হইতে লাগিল, যাহা দেখিতেছি, সবই যেন কল্পনা। এরূপ নিশ্চল, এরূপ জীবনহীন, এরূপ মনুষ্যহীন দেশ কেবল গল্পেই শুনা যায়। কিন্তু হঠাৎ এই পম্পেইর একটি দৃশ্যের কথা মনে হইল। একটি গৃহ ক্রমে ক্রমে ভস্মে ঢাকিয়া যাইতেছিল সেই গৃহে একটি নারী দুহাতে তাহার শিশুটিকে উচ্চে ধরিতে গিয়াছিল। ভস্মস্তূপ ক্রমে-ক্রমে উন্নত হইয়া দুঃখিনী মাতাকে নিমজ্জিত করিতেছিল কিন্তু সেই অগ্নির প্রসার হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইবে। জ্বলন্ত ভস্মস্তূপ তিল-তিল করিয়া দগ্ধ করিয়াও জননীকে একেবারে অবসন্ন করিতে পারে নাই; কি যেন এক মহাশক্তি, দুঃসহ যন্ত্রণা দমন করিয়া রাখিয়াছিল। মাতার হস্তদুইটি মৃত্যু-যন্ত্রণাতে অবশ হইয়া পড়ে নাই। দুই সহস্র বৎসর পরে সেই উদ্ধোত্থিত করপুটে সন্তানটিকে পাওয়া গিয়াছে। সেই মাতার স্নেহস্পর্শে যেন অতীত বর্তমানের সহিত মিলিয়া গেল। একই দুঃখে, একই স্নেহে, একই মমতায় সেকাল ও একাল, পূর্ব ও পশ্চিম যেন বান্ধা পড়িল। তখন পম্পেইর মৃত রাজা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, এবং রাজপথ আমার চক্ষে অকস্মাৎ লোকজনে পূর্ণ হইল।

আগ্নেয়গিরি দর্শন

আমরা রোম নগর দর্শন করিয়া ইটালির পশ্চিম উপকূলে স্থিত নেপল্‌স্ শহরে উপস্থিত হইলাম। নেপল্‌স্ সমুদ্রতীরে স্থিত। এরূপ সুন্দর শহর ইউরোপে আর নাই। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার সম্মুখেই সমুদ্র। ঘোর নীল জলরাশির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পাল ভরে যাইতেছে। অনতিদূরে কেপ্রি দ্বীপ।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রোমের ধনী লোকেরা ইহার নিকটবর্তী স্থানে সুন্দর-সুন্দর উদ্যান ও প্রমোদ ভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা নেপল্‌সের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিতেছে।

নেপল্‌স্ শহর এখনও নানাবিধ আমোদপ্রমোদ এবং জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কিন্তু অদূরেই ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি এই সুখের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইতেছে। আমরা একদিন প্রত্যূষে ভিসুভিয়স দেখিতে রওনা হইলাম। ভিসুভিয়স নেপল্‌স্ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত; চারি হাজার ফিট উচ্চ।

আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া আগ্নেয়গিরির পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; এস্থানের দৃশ্য অতি ভয়ানক। আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত প্রস্তরের ঢেউ আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়াছে। এখন সেই ঢেউগুলি জমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে পাথরগুলি হইতে এখনও ধূম উঠিতেছে। পূর্বে এস্থান হইতে উপরে উঠিতে অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে যাইতে হইত, বন্ধুর পথ ও আগ্নেয়গিরির ভস্মের উপর দিয়া যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং প্রায় একটি দিন লাগিত। এখন একপ্রকার নূতন ফিউনিকিউলার বা তারের রেল হওয়াতে আধ ঘণ্টার মধ্যে উপরে উঠা যায়।

এক এক গাড়িতে বারোজন লোক বসিতে পারে; এইরূপ একখানা গাড়ি উপরে যায় আর একখানা নীচে আসে। পাহাড়ের গা দিয়া সোজাসুজি উপরে উঠিতে ভয় হয়, তার ছিঁড়িয়া গেলে কি ভয়ানক অবস্থা হয় বুঝিতে পারো। এই গাড়ি যেখানে থামে, সেখান হইতে অগ্নিকুণ্ড পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়, সে প্রায় ৫/৭ মিনিটের পথ।

একে তো ভস্মের উপর পা দিয়া স্থির রাখা দুষ্কর, তাহাতে আবার আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, সেদিন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল, আমাদের দাঁড়াইয়া থাকাই দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। বাতাস এরূপ ঠান্ডা, যে হাত, পা ও মুখ একেবারে অবশ হইয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়া সুখের পরিবর্তে আমার কষ্টই বোধ হইতে লাগিল! একদিকে আমার সঙ্গী অন্যদিকে আমাদের পথপ্রদর্শক সজোরে আমার হাত ধরিয়া উপরে না লইয়া গেলে, আমার অগ্নিকুণ্ড দেখাই হইত না। অনেক দেশ দেখিয়াছি, অনেক পাহাড়ে উঠিয়াছি এবং অনেক ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিবার ক্লেশ চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ইতালিয় গভর্নমেন্টের আদেশে এখানে কয়েকজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত আছে, তাহাদের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড দেখিতে যাইবার আদেশ। পথপ্রদর্শকদিগকে সঙ্গে না লইয়া কেহ উঠিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে কয়েক বৎসর পূর্বে দুইজন

আমেরিকান ভ্রমণকারী কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গহ্বর দেখিতে গিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আমরা অতি কষ্টে উঠিয়া দেখিলাম, উপরে গহ্বর হইতে গন্ধকের ধূম উঠিতেছে, এক স্থান দিয়া গলিত গন্ধক স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমরা যখন দেখিতে যাই, তখন আগ্নেয়গিরি নিস্তেজ ছিল, তথাপি গন্ধকের ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল।

আঠারোশত বৎসর পূর্বে এই নিদ্রিত গিরি একবার অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টিতে সাতটি নগর পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লন্ডনের গল্প

এখন লন্ডনের কথা না জানে এমন লোক অতি অল্পই আছে। পূর্বে যেখানে যাইতে একমাস লাগিত, এখন সেস্থানে ১৬ দিনে যাওয়া যায়। এখন আর বিলাতকে বেশিদূর বলিয়া মনে হয় না,—জাহাজ এবং রেল হওয়াতে অত দূরবর্তী স্থানও আমাদের সন্নিকট হইয়াছে।

জাহাজে চড়িয়াই ইংরাজের শৃঙ্খলা ও কার্যকুশলতার শত পরিচয় পাইয়াছিলাম। একটি ছোটখাটো রাজপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত জাহাজ শতশত প্রাণী বক্ষে করিয়া, দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়া অতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, দেখিলে শতমুখে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। সাতশত লোক জাহাজে বাস করিতেছে, অথচ ঠিকসময়ে স্নান আহারাদি সমুদয় চলিতেছে। জাহাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঠুরী, এক একটিতে তিন চারি জনের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত আছে। তিন-চারি শত লোকের একসঙ্গে আহার করিবার গৃহ, বৈঠকখানা (Drawing room) প্রভৃতি সুন্দর মখমলে সাজানো। টবের মধ্যে ফুলগাছ এইসব গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সাত শত লোকের আহার্য ও আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই জাহাজে থাকে। চারি পাঁচ দিন অন্তর কোন বন্দরে জাহাজ আসিলে, কেবল ইঞ্জিনের কয়লা ও আহারের জন্য খাদ্যসামগ্রী লওয়া হয়।

ইংরাজরা জাহাজে নানা প্রকার খেলা ও আমোদে সময় কাটান। সেখানেও ক্রিকেট খেলা, তীর ছোঁড়া, কইটস্ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। কখনও কখনও মাশুলের উপর বোতল রাখিয়া, বন্দুক ছুঁড়িয়া তাহা ভাঙিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল খেলাতে আবার জাহাজের কর্মচারীদের সহিত জাহাজের আরোহীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। রাত্রে নানাপ্রকার ঐকতানিক বাদ্য সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাচ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জাহাজের গতি লইয়াও আন্দোলনের বিরাম নাই। প্রতিদিন জাহাজ কতটা অগ্রসর হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্বে যাঁহারা যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চাঁদা করিয়া প্রাইজ দেওয়া হয়।

ইংরাজ জাতির কাজের সময় যেমন একাগ্রতা, খেলার মধ্যে সেইরূপ একাগ্রতা ও উৎসাহ। তাঁহারা যেখানেই যান যাহাই করুন শারীরিক ব্যায়াম ও আমোদপ্রমোদ কখনই পরিত্যাগ করেন না।

জাহাজ হইতে নামিয়া স্টেশনের মতো এখানে গোলমাল চিৎকার কিছুই নাই। এখানেও নিঃশব্দে কলের মতো কাজ চলিতেছে। আমরা জিনিসপত্র নামাইলাম, একজন মুটে আসিয়া সেগুলি একটা টানা গাড়িতে চাপাইয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং যে গাড়ীখানি সম্মুখে ছিল তাহাতে চাপাইয়া দিয়া নিজের পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থান নির্দেশ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। ভাড়াটে গাড়িগুলি সারি সারি রহিয়াছে, যেখানা আগে, তাহারই আগে ভাড়া হইতেছে, এ স্থানেও কোনো গোলমাল নাই।

লন্ডন শহরে সমুদয় কার্যেই এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলাম, রাস্তায় অসংখ্য গাড়িঘোড়া, লোকজন, বাইসিকল, ছোট ছেলেদের পিরাম্বুলেটার, এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। প্রথমে এত জনতা দেখিয়া গাড়িতে উঠিতে আমার ভয় হইত। সর্বদাই মনে হইত কোনো দুর্ঘটনা না হয়। কিন্তু সকলেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন বলিয়া, দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটে। গাড়ি চালাইবার যে নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার কাহারও সাধ্য নাই, রাস্তায় জনতা তোমরা কল্পনা করিতে পার না। এত গাড়িঘোড়া যাতায়াত করে, যে সময় সময় চৌরাস্তার মোড় ভিন্ন অন্য স্থান দিয়া রাস্তার অপর পারে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমি কতবার এইরূপ রাস্তা পার হইতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছি।

চৌরাস্তার মোড়ে পার হইবার বেশ সুবিধা। সে স্থানে সর্বদাই একজন পুলিশ থাকে। পাঁচ ছয় জন লোক একত্র হইবামাত্র সে তাহার এক হাত তুলিয়া অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে নির্দেশ করিয়া থাকে। অমনি যত গাড়িঘোড়া মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া যায়। উভয় পার্শ্বেই লোক সরিয়া গেলে, পুলিসের লোক হাত নামাইবামাত্র গাড়িঘোড়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে। আমি পুলিশের লোকের এই অঙ্গুলি নির্দেশের শক্তি দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম। কথা নাই, বার্তা নাই, অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখিবামাত্র শত-শত গাড়ি থামিয়া যাইতেছে, স্বয়ং মহারানির গাড়ি পর্যন্ত এই সংকেতের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। সাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কত অম্নিবাস ও ট্রামগাড়ি আছে, তথাপি লন্ডনের রাস্তায় লোকজনের ভীড় কমে না। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রেলের রাস্তা করা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে রেলের গাড়ি চলে, তাহাতেও অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, ইহা হইতেই লণ্ডনের জনতার কতক পরিচয় পাইবে।

লন্ডন শহরের জাকজমক দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়। মনে হয় ইংরেজ জাতি সমস্ত পৃথিবী হইতে ধন আহরণ করিয়া এই রাজনগরে সঞ্চয় করিয়া রাখিযাছেন।

ইংরাজকে বেনে বণিকের জাত অথবা দোকানির জাত বলে, একথা সত্য; কারণ এমন সুসজ্জিত দোকানশ্রেণি আর কোথাও দেখা যায় না। সব দোকানেই আয়নার দরজা, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সমুদয় দেখা যায়। এই সকল দোকান দেখিয়া জিনিস কিনিতে যাহার লোভ না হয় সে মানুষ নহে। প্রতি রাস্তায় কত গহনার দোকান, কত পরিচ্ছদের দোকান, কত মনোহারী জিনিসের দোকান, ঔষধের দোকান, ফুলের দোকান, তাহার সংখ্যা নাই। তাহা ছাড়া চা খাইবাব জন্য এবং আহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেলও আছে। ফলফুলের দোকানের শোভা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করিতে পারি না। মাছের দোকানগুলিতেও একটুকু গন্ধ নাই,—নানাপ্রকার মাছ সুন্দর মার্বেল পাথরের উপর বরফে রক্ষিত।

ইংরাজ জাতি যে সৌন্দর্যের সেবক তাহা সকল কার্যেই দেখিতে পাইলাম। গৃহপালিত

পশুপক্ষী প্রভৃতির প্রতি ইহাদের অত্যন্ত যত্ন। কঙ্কালসার জন্তু সে দেশে আমি কখনও দেখি নাই, ঘোড়া, গরু, গাধা, ভেড়া প্রভৃতি সব জন্তু দেখিতে সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট। পশুপক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুরা সেখানে সন্তানবৎ প্রতিপালিত হয়। আমাদের ইডেন গার্ডেনের ন্যায় লন্ডনের অনেকগুলি উদ্যান আছে। তাহাতে কত সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষী প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্নে বালক বালিকারা সেই সকল উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া, ইহাদিগকে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেয়। উদ্যানস্থ সরোবরে ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসাইয়া বালক-বালিকারা নানাপ্রকার খেলা করিয়া থাকে।

দুই প্রহরের সময় এই সকল বাগানে এক অপরূপ দৃশ্য হয়। তখন বালক-বালিকাদের সহিত অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সম্মিলন হইয়া থাকে। একদিকে যেমন ঠেলাগাড়িতে ক্ষুদ্র শিশুরা বেড়াইতে আসে, অপর দিকে তেমনই অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও ঠেলাগাড়িতে এইসময় বায়ু সেবন করিতে বাহির হয়।

লন্ডনে দেখিবার ও শিখিবার অনেক জিনিস আছে,—কত প্রকার মিউজিয়ম, কত প্রকার পাঠাগার ও লাইব্রেরি, কত প্রকার চিত্রলীলা, গানবাদ্যের জন্য কত প্রকার হল, বড় বড় লোকের কত স্মৃতিচিহ্ন, জাতীয় জীবন উপযোগী কতপ্রকার পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ গৃহ। এক একটি স্থান দেখিতে একদিন করিয়া যায়। এই সকল স্থানের বর্ণনা করা সম্ভব নহে, তবে "ব্রিটিশ মিউজিয়াম", "ন্যাশনাল গ্যালারি", ও "ওয়েস্টমিনিস্টার এবি", এই তিনটি স্থানের নাম না করিয়া লণ্ডনের কথা শেষ করা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম নামক পুস্তকাগারে পৃথিবীর অতি পুবাতন ও বহুমূল্য পুস্তক সকল রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া নানা ভাষার প্রধান পুস্তক এমনকী, বঙ্গভাষায় প্রধান পুস্তকও এখানে পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল গ্যালারি বা জাতীয় চিত্রশালাতে বহু ব্যয়ে ইংরাজ চিত্রকরদিগের চিত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

ওয়েস্টমিনিস্টার এবি—এখানে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যত রাজা ও যত বীরগণ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত আছে।

ওয়েস্ট মিনিস্টার এবি

তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়সে বড়, তাহারা হয়তো কবি লংফেলোর জীবনসঙ্গীত নিম্নের লাইন কয়টি পড়িয়াছ—

Lives of great man all remind us.
We can make our lives sublime;
And departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.

আমার ওয়েস্টমিনিস্টার এবি দেখিয়া স্মরণ হইল, আজ এক বৎসর হইল এ স্থানটি দেখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রশস্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্য আজও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এই প্রকাণ্ড

সমাধিমন্দির দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে দেশের মহত্বের এরূপ সম্মান, সে দেশে মহৎ চরিত্র গঠিত হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এই সীমাবদ্ধ স্থানটির মধ্যে ইংলন্ডের সমস্ত রাজাদের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভ, মহাকবি, লেখক, বহুমনীষী সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রীবাগ্মী; ধর্মবীর এক কথায় গত আট নয় শতাব্দীর বিখ্যাত ইংল্যান্ডবাসীদের দেহাবশেষ এই মহা সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে। ইংরেজ বালকদিগের অল্পবয়স হইতে এই সকল স্মৃতি চিহ্ন দেখিয়া, হৃদয়ে মহত্বের অনুকরণ স্পৃহা হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশবাসী হইয়াও এই স্থান দর্শন করিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি ইংরেজ হইতাম, তবে এ স্থান দর্শন করিয়া, জন্মভূমির জন্য আমারও অনুরাগ বৃদ্ধি হইত তাহার সন্দেহ নাই, মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহাদের কীর্তি অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশবাসীর হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে।

আমাদের দেশেও কি মহৎলোক জন্মগ্রহণ করেন নাই? করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মহত্ব আমরা প্রকৃতপক্ষে পূজা বা অনুকরণ করিতে শিখি নাই।

আমাদের দোষেই তাহারা মৃত। কিন্তু এই ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে শতশত অমরগণ এখনও বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রিয় দেশবাসীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতেছেন।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ইহার শতশত প্রমাণ পাওয়া যায়। যে উইল্‌বারফোর্স বিদেশবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার লুপ্ত জীবন ব্রাইটি, ব্রড্‌ল ও ব্রসেটের জীবনে পুনর্জীবিত দেখা যায়।

এখন আমরা যে ওয়েস্টমিনিস্টার দেখি পূর্বে ইহা একটি অসামান্য মন্দির মাত্র ছিল। ইতিহাসে কথিত আছে, যে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব রাজা এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসারের সময় পুরাতন মন্দিরের স্থানে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এড্‌ওয়ার্ড যখন নর্মান্ডি দেশে নির্বাসিত ছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পুরাতন রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, রোমে সেন্টপিটারের মন্দিরে তীর্থ করিতে যাইবেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আসিলে, প্রধান পুরোহিত পোপ তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তৎপরিবর্তে ইংলন্ডে সেন্টপিটারের নামে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। প্রবাদ এই যে, এড্‌ওয়ার্ড স্বপ্নে সেন্টপিটারের নিকট হইতে এই স্থানে মন্দিরের নির্মাণের আদেশ পান। সে যাহা হউক ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুরাতন মন্দিরটির নিকট নূতন একটি মন্দির নির্মাণ করিলেন। তারপর ইংলন্ডে নানাবিধ অন্তর্বিপ্লব হওয়াতে কোনো রাজাই ইহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় হেন্‌রির সময় রাজ্যে কতকটা শান্তি স্থাপন হওয়াতে, তিনি এই মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হন।

সেইসময় হইতে ভিন্ন-ভিন্ন প্রণালীর স্থপতি কার্যের সমাবেশ দেখা যায়। সেই সকল কারুকার্যের বর্ণনা অসম্ভব। স্থানে-স্থানে এইরূপ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সে সকল দর্শন করিয়া হৃদয় মহানভাবে পূর্ণ হয়, এবং মনে হয় প্রতিযুগের শিল্পীগণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে যেন মূর্তিমতী করিয়া এই স্থানকে পরমেশ্বরের অর্চনার উপযোগী করিযাছেন।

ইংলন্ডে কত কত উপাসনা মন্দির আছে, কিন্তু তথাপি বহুদূর হইতে লোকে এই পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেছেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় এই মন্দিরের সংসৃষ্টে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এখনও তাহা চলিতেছে। পূর্বে এই মন্দিরে

রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতরা বাস করিতেন, এখন সেই সকল স্থান শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কারণ এলিজাবেথের সময় হইতে প্রটেস্টান্টদের উপর ইহার সম্পূর্ণ ভাব অর্পিত হয়, এখন তাঁহারাই এবি সংলগ্ন গৃহে বাস করেন। কেবল যে, মহাপুরুষের সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া এবি প্রসিদ্ধ তাহা নহে। পৃথিবীব কোনো মন্দিরেই এরূপ পার্থিব ও অপার্থিব ভাবের সমাবেশ দেখা যায় না। বহুশতাব্দী পূর্বে এ স্থান রাজনৈতিক ও ধর্মসম্প্রদায়ের তুমুল আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল। আবার এই পার্থিব মন্দিরের আশ্রয়ে কত পলায়নপর রাজকুমার এবং যোদ্ধা লুক্কায়িত থাকিতেন। এই স্থানে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়েকজন রাজার বিবাহও এই স্থানেই হইয়াছে, আবার এই স্থানেই তাঁহাদের অনন্ত নিদ্রা-ক্ষেত্র।

আমরা প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বর্তমান উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলাম; ইহারও চতুর্দিকে স্মৃতিস্তম্ভ, মধ্যস্থলে পুরোহিতের জন্য উচ্চ বেদী; তারপর তিন-চারিশত লোকের বসিবার উপযুক্ত আসন, পশ্চাতে সঙ্গীতের জন্য প্রকাণ্ড অর্গাণ যন্ত্র ও গায়কদের বসিবার স্থান। ইহার অদূরে ক্যানিং—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইংরেজ-সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্যকারী ইংরেজদের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া আমরা কবিদিগের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। ইংরাজিতে এই স্থানকে Poets Corridor বলে। এ স্থানেই নাকি এবি দর্শকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যাপন করেন, তাহা আশ্চর্য নহে। কারণ অন্যান্য বীরদিগের কীর্তি স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিপ্লব পূর্ণ হয়, কিন্তু কবিদিগের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। এখানে চসার হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন পর্যন্ত প্রধান কবিদিগের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। এ স্থান হইতে আমরা সপ্তম হেনরির মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহা এবির সর্বোকৃষ্ট মন্দির, ইহা নির্মাণ করিয়া সপ্তম হেনরি ইংলন্ডে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এখানে রাজ্যাভিষেকের অতি পুরাতন আসন রক্ষিত আছে, এখনও সেই আসন ব্যবহৃত হয়। কিয়দ্দূরে রাজা জনের লিখিত মেগ্নাকার্টা (magnacharta) দেখিলাম।

এ স্থানে অন্যান্য যে সকল স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেখিয়া মনে হইল ইংল্যান্ড হইতে বহুদূরে, বিদেশে, বিপদে অতি সামান্য সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিবার সময় কেন ওয়েলিংটন ও নেল্‌সনের কথা স্মরণ করে। এই স্থানে তাঁহাদের যে ছিন্ন-পতাকা রক্ষিত হইয়াছে, সেই পতাকার গৌরব তাহারা বিপদেও রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়। এইরূপ নামহীন, খ্যাতিহীন অজ্ঞাত সামান্য সৈনিকের রক্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে ব্যক্ত হইতেছে। ইহার মূলে জাতীয় গৌরবের স্মৃতি ও এই ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে সেই জাতীয় মহিমার স্মৃতি জাজ্বল্যমান!

পার্লামেন্ট দর্শন

টেমস্ নদী ইংল্যান্ডের রাজধানীর গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত। শহরের নিকট তাহার দুই পার্শ্বই বাঁধান, দুইদিকে সুন্দর পাকা রাস্তাতে গাড়ি ঘোড়া লোকজন যাতায়াত করিতেছে, এদিকে লন্ডনের দুর্গ প্রভৃতি নানা সুসজ্জিত হর্ম্য বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে হাসপাতাল ও কলকারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ রহিয়াছে। নদীর দুইপার্শ্বে—গমনাগমনের জন্য বহু সংখ্যক সেতু নির্মিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অল্প পয়সাতে যাতায়াতের উপযোগী জাহাজেরও অভাব নাই।

লন্ডন শহর হইতে দূরে টেম্‌স্ নদীতে তীরের শোভা অপূর্ব, নানা বৃক্ষলতা ও গ্রাম্য ছবি তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সকল দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অদূরবর্তী পার্লামেন্ট মহাসভাগৃহ যে কারুকার্য সম্বন্ধে সর্বোকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। শিল্প-নৈপুণ্যে ইহা শুধু লন্ডনের কেন, ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান ভুক্ত।

অনেকদূর হইতে এই গৃহের ঘড়ি থাকিবার উচ্চ চূড়াটি ও অন্যান্য চূড়াগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডে যাইবার পূর্বে এই গৃহ এবং সভার কার্য দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; কিন্তু আমাদের পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে সভার কার্য স্থগিত হয়। সুতরাং আমি উক্ত সভার কার্য দেখিবার আশা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আমাদের ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব হইল, তাহাতেই সভার নূতন সেসনের কার্য আরম্ভ হইল, আমি প্রবেশের পাশ সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

দর্শকদের সভাগৃহে প্রবেশের জন্য পাশ সংগ্রহ করা আবশ্যক। প্রত্যেক সভ্যের তিনখানা পাশ দিবার অধিকার আছে। পুরুষ দর্শকদের বসিবার স্থানটি প্রশস্ত থাকাতে, তাঁহাদের পাশ সংগ্রহ করিতে অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রী-দর্শকদের স্থানটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাই—তাহাদের পাশের জন্য সভ্যদের মধ্যে সুরতি খেলা (ballot) হয়। যে যে সভ্যের ভাগ্যে নাম উঠে, তাঁহারাই কেবল পাশ দিতে পারেন। এইজন্য কখনও কখনও পাশ—প্রার্থিনীকে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে সার জন লাবক (Sir John Lubbock) মহাশয়ের নিকট হইতে আমি দুইখানা পাশ পাইয়াছিলাম।

পূর্বেই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পার্লামেন্টের সভ্য সোয়ান সাহেবের পত্নী আমাকে উক্ত সভাতে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি নিজের গাড়িতে আমাকে লইয়া গেলেন। মহাসভা গৃহটি একটি প্রাসাদ বিশেষ, কোথা হইতে কোথা প্রবেশ করিলাম, বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ি খিলান দরজার নীচ দিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিয়া, অবশেষে এক ক্ষুদ্র দরজার নিকট থামিল। আমরা নামিয়া একটা কল (lift) দ্বারা ত্রিতলে উঠিলাম সেখানে পাশ দেখাইয়া স্ত্রীলোকদের নির্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। সে স্থানটি দেখিয়া লখনউ নবাবদের প্রাসাদের অন্তঃপুরের কথা মনে পড়িল। ঠিক তেমনি ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর;

যাহারা সম্মুখে বসেন, তাঁহারাই কেবল সেই ছিদ্র দিয়া নীচের সমুদয় কার্য দেখিতে পান, পিছনের আসন হইতে দেখিবার সুবিধা নাই, হলের এক পার্শ্বে রক্ষণশীল, অন্যপার্শ্বে উন্নতিশীল সভ্যদের বসিবার স্থান। পশ্চাতের দিকে সভাপতির (speaker) বসিবার উচ্চস্থান। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের পার্শ্বে কাগজ-পত্র লইয়া কর্মচারীগণ উপবিষ্ট। উপরে দর্শকের ও খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বসিবার গ্যালারি।

সভ্যেরা সকল সময় সভাগৃহে উপস্থিত থাকেন না, যাঁহারা আলোচনা (debate) করেন, তাঁহারা এবং যে বিষয়ে যাঁহাদের বক্তব্য আছে, সে সভ্যেরাই সাধারণত উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য সভ্যেরা সর্বদাই ভিতর বাহিবে যাওয়া আসা কবেন। যাঁহারা গৃহে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা শ্রবণ করেন, বেচারা সভাপতিকে কিন্তু সমস্ত সময় সেখানে বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রত্যেক সভ্যই নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া, কথা বলিবার মতো অতি সহজভাবে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে কেবল দরকারি ও জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে হয়—তাহা না হইলে সেখানে চলে না। আমি যেদিন যাই, সেদিন কলকারখানা সম্বন্ধীয় আইন লইয়া আলোচনা চলিতেছিল (Factory Bill)। দেখিলাম, বক্তা প্রকাণ্ড একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া বক্তৃতা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কাগজ হইতে দৃষ্টান্ত তুলিতেছেন। শুনিলাম, বক্তা শ্রবজীবীদের প্রতিনির্ধি। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে পার্লামেন্টের সভ্য হইয়া, গরীবদের দুঃখ নিবারণে সর্বদা চেষ্টা করেন। বক্তৃতার বিষয় এই, যে গভর্নমেন্ট আপত্তি না করাতে কলকারখানার স্বত্ত্বাধিকারীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায়, অল্পব্যয়ে সামান্য রকমের গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকেন, সে সকল গৃহ চাপা পড়িয়া বৎসর অনেক লোক মারা যায়। অতএব এবিষয়ে গভর্নমেন্টের একটা আইন থাকা উচিত।

বক্তা কোন্-কোন্ বৎসর কত লোক মারা পড়িয়াছে, কত লোক পঙ্গু হইয়াছে, এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। বিপক্ষীয় সভ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন, যে গভর্নমেন্টের এবিষয়ে হাত দিবার আবশ্যক নাই।

বৎসরে সাত-আটটি লোক হয়তো মারা পড়িতেছে তাহার জন্য এত আন্দোলন। আমরা হইলে ভ্রুক্ষেপ করিতাম না, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

এখানকার আলোচনা প্রণালী অতি সুন্দর। বক্তা স্বপক্ষে বলিয়া যাইতেছেন, এমনসময় বিপক্ষীয় সভ্যের কিছু বলিবার আবশ্যক হইলে, তিনি উঠিয়া দাঁড়ান, বক্তা অমনি বসিয়া পড়েন। বিপক্ষীয় সভ্যের বক্তব্য শেষ হইলে; পূর্ব বক্তা উঠিয়া তাহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া (অথবা স্বপক্ষীয় কেহ সেই যুক্তি খণ্ডন করিলে পর) আবার নিজ বক্তব্য বলিতে থাকেন।

এবিষয়ের বাদানুবাদ শেষপর্যন্ত শুনিতে আমার যেরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম, সভ্যেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কীরূপে অক্লান্তভাবে বাদানুবাদ করিয়া করিয়া সময় কাটান।

আমাকে সমুদয় প্রাসাদটি দেখিতে হইবে, তাই সঙ্গিনীর ইঙ্গিতে অযথা বাধ্য হইয়া সে স্থান ছাড়িলাম। বাহিরে আসিলে সোয়ান সাহেব আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিলেন। তিনি এতগুলি ঘরের মধ্যে দিয়া লইয়া গেলেন, যে আমার আশ্চর্যবোধ হইতে লাগিল, আমি নিজে নিশ্চয়ই পথ ভুলিতাম।

অবশেষে অনেক ঘুরিয়া আমরা মহাসভার "লবি" (Lobby) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পার্লামেন্ট সভার সমুদয় গৃহের মধ্যস্থিত গুম্বুজাকার স্থানটিকে 'লবি' বলে। এই মধ্যস্থিত স্থান হইতে 'লর্ডদের' সভাগৃহে, 'কমন' বা সাধারণের সভাগৃহে এবং অন্যান্য সমুদয় গৃহে যাওয়া যায়। এখানে অনেক সভ্যের দর্শন পাইলাম, কেহ বা গল্প পরিহাস্য করিতেছেন, কেহ কেহ হাঁটিতে হাঁটিতে নানাপ্রকার তর্ক করিতেছেন—মন্ত্রণাসভা হইতে এখানেই অধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহার নিকট 'পোল' (Poll) দিবার ঘর। কোনো আলোচ্য বিষয় লইয়া যখন মতভেদ হয়, তখন সভ্যেবা এখানে আসিয়া নিজ নিজ 'ভোট' দেন।

'লবি' পার হইয়া লর্ডদের সভাগৃহে গেলাম। পথে পুরাতন রাজাদের সময়কার নানারকম ছবি দেখিলাম।

লর্ডদের গৃহটি সাধারণদের গৃহ অপেক্ষা ভালোরূপে সজ্জিত; বসিবার আসনগুলি লাল মখ্‌মলে মণ্ডিত; সিংহাসন একধারে রক্ষিত। অনেকদিন এই আসন ব্যবহার হয় না।

সাধারণ সভ্যেরা তাহাদের সজ্জাহীন সামান্য গৃহই অধিক পছন্দ করেন। তাঁহারা বলেন, ওইরূপ গৃহেই বেশ কার্য সম্পন্ন করা যায়।

এই স্থানের মধ্যে 'ওয়েস্টমিনিস্টার হল' (West minister Hall) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে মোকদ্দমায় গভর্নমেন্ট বাদী, এখানে তাহার বিচার হয়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বিচার চলিতেছিল।

এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল, বিখ্যাত বাগ্মী 'বার্ক' (Burke) এবং 'সেরিডেন' (Sheridan) ভারতবাসীদের পক্ষ হইয়া এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ধরিয়াছিলেন। প্রাসাদটি দেখিয়া আমরা নীচে আহারের স্থানে গেলাম। ইংরাজ জাতির আহারের বন্দোবস্ত সব স্থানেই আছে; সভ্যেরা এখানে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই কিনিতে পান। আমরা এখানে 'কফি' পান করিয়া টেমস্‌ নদীতীরস্থ মহাসভা গৃহের সুন্দর বারান্দায় বেড়াইতে গেলাম। গ্রীষ্মকালে অনেক সভ্য বন্ধুবান্ধবসহ এই স্থানে গল্প-সল্প ও আহারাদি করিয়া থাকেন। এখন এই বারান্দাটি সভ্যদের বন্ধু সমাগমে পূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

যে পার্লামেন্টের মন্ত্রণা দ্বারা পৃথিবীর অনেক স্থানের ভাগ্য নির্দিষ্ট হইতেছে, যে পার্লামেন্ট ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও সৌভাগ্যের কারণ, সেই পার্লামেন্ট দেখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

চিতোর দর্শন

এখানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে সর্বত্রই একটা ক্লেশ হয়। প্রায় প্রত্যেকে বড় বড় স্থানেই দেখা যায়, মুসলমান রাজারা হিন্দুদের প্রাচীন কীর্তি সকল শেষ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কাশীতে গেলে দেখিবে, পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ভাঙিয়া একজন মুসলমান রাজা সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে কোথাও বা

হিন্দুদের দেবমন্দির ভাঙিয়া সেই প্রস্তর দিয়া শহরের দরজা নির্মিত হইয়াছে। গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ শহরে একবার দেখা গেল যে একটি রাস্তার যে পাথরখানি তোলা যায়, তারাই এক একটি হিন্দুদের দেবমূর্তি। কোথাও মুসলমান রাজা পাথর উলটাইয়া দেবমূর্তিগুলি নীচের দিকে রাখিয়া এই রাস্তাটি বাঁধাইয়াছিলেন। এইরূপ সর্বত্রই হিন্দু কীর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রাণ একপ্রকার ক্লেশ হয়; এবং বর্তমান রাজারা যে কত ভালো তাহা বারবার মনে হয়। তাঁহারা কেমন যত্ন করিয়া হিন্দুব ও মুসলমানদিগের প্রাচীন কীর্তি সকল রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ যত স্থান দেখিয়া আমাদের মনে ক্লেশ হইয়াছে, তাহাব মধ্যে চিতোর সর্বপ্রধান। চিতোর দেখিয়া আমরা চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতে যে চিতোরবাসী রাজপুতদিগের বীরত্বেব কথা শুনিয়া আসিতেছি, যে চিতোরের গুণকাহিনি কতই পড়িয়াছি, যে চিতোরের নাম যেন কর্ণে লাগিয়াই রহিয়াছে, সেই চিতোর যখন দেখিলাম, তখন চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলাম, "হায়রে, এই কি সেই চিতোর!" বোধ হইল যেন কোন ঘুমের দেশে আসিলাম! যেন পাহাড় পর্বত, বাড়িঘর, গাছপালা, মানুষ পশু সকলেই ঘুমাইতেছে, সকলেই যেন মরিয়া আছে।

তোমবা মধ্য ভারতবর্ষের ম্যাপে চিতোর নগর দেখো। সমুদয় নগরটি একটি পাহাড়ের ওপরে দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গে বাস করিয়া রাজপুত বীরগণ দিল্লির সম্রাটদিগকেও কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। সেসব অদ্ভুত কথা এখানে বলিবার অবসর নাই। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু অধিক, তাহারা টড্ সাহেবের প্রণীত "রাজস্থান" নামক গ্রন্থের অনুবাদ পাইলে, তাহাতে চিতোরের রাজপুতদিগের বীরত্বের বিবরণ পড়িয়া দেখিও।

চিতোরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুরম্য রাজপুরী বিদ্যমান; উদ্যানে বৃক্ষসকল ফলফুলে ভরিয়া রহিয়াছে; রাজপুরীর সম্মুখে সুন্দর দেবমন্দির, তাঁহার গায়ে বিচিত্র শিল্পকার্য, মধ্যে মহাদেবের মূর্তি, সন্নিকটে একটি সুন্দর জলাশয়, তাহার পার্শ্বে প্রকাণ্ড আম্র-কানন স্থানটিকে ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সকলেই মৃত। রাজবাড়ি, দেবমন্দিব, আম্রকানন সমুদয় জনশূন্য। নগরে রাস্তাঘাট গৃহাদি সমুদয়ই বর্তমান, কিন্তু জনপ্রাণীর দেখা নাই; যেন কে মরণ-কাঠি ছোঁয়াইয়া শহরটিকে মারিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যহীন হইলেও রাজপুত বীরপুরুষ ও রমণীদিগের কীর্তি চিতোরকে জাগ্রত রাখিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একস্থানে এত বীরকীর্তি একত্রিত দেখা যায় না।

চিতোর-দুর্গে উঠিবার পূর্বে চিতোরের পাহাড়ের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। এই মাঠেই মুসলমান রাজারা তাবু গাড়িয়া চিতোর অবরোধ করিতেন। এখনও এই মাঠে যুদ্ধে হত মুসলমান সৈনিকদিগের সমাধি সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। চিতোর নগর ৫০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর স্থিত। ওপরে উঠিবার একটি ভিন্ন পথ নাই; এইজন্যই মুসলমান রাজারা এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সহজে অধিকার করিতে পারিতেন না।

রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের সূর্যবংশীয় রানারা চিতোরকে তাঁহাদের প্রধান গৌরবস্থল মনে করিতেন। চিতোর শত্রু-হস্তে পড়িলে যতদিন তাহা পুনরায় অধিকার করিতে না পারিতেন ততদিন গভীর দুঃখ ও ক্লেশে কালযাপন করিতেন। রানা প্রতাপ সিংহ চিতোর হারাইয়া কিরূপ দুঃখে কালযাপন করিতেন, তাহার বিবরণ তোমরা হয়তো পাঠ করিয়াছ। প্রতাপ সিংহ যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া, পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং স্বর্ণ পাত্রের পরিবর্তে

বৃক্ষপত্রে আহার করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ আজিও সেই নিয়মের অনুকরণ করিয়া বিছানার নীচে একগাছি তৃণ এবং স্বর্ণ থালার নীচে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন; একথাটাও তোমরা জানো।

আমরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজপ্রাসাদগুলি দেখিলাম, যে হ্রদের সম্মুখে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রাসাদ, সে হ্রদ এখন শুষ্কপ্রায়, হ্রদের মধ্যে পদ্মিনীর বিশ্রামভবন, তাহার চতুর্দিকে এখনও অল্প অল্প জল আছে। এই পদ্মিনীর উপাখ্যান হয়তো তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। তাহা এই,—দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম চিতোর অবরোধ করেন, অনেকবার অকৃতকার্য হইয়া পরিশেষে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে চিতোর অধিকার করেন। এই ভীষণ সমরে রানা লক্ষণ সিংহ বংশ রক্ষার নিমিত্ত একমাত্র পুত্র রাখিয়া এগারোটি পুত্রের সহিত রণে প্রাণদান করেন। দুর্গের পূর্বদিকে কুম্ভ রানা ও রানা সংগ্রাম সিংহের প্রাসাদ; ইহা যে নানাপ্রকার শিল্পকার্যে শোভিত ছিল তাহা এখনও বোঝা যায়।

রানা সংগ্রামসিংহের সহিত বাবরের যুদ্ধ হয়, বাবর কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত হন, কিন্তু শেষে রানা সঙ্গের জনৈক সৈন্যাধক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়লাভ করেন।

নগরের মধ্যস্থলে রানা কুম্ভের জয়স্তম্ভ এখনও আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান বহিয়াছে। রানা কুম্ভ ১৪৩৯ খিস্টাব্দে মালবদেশের রাজা মহম্মদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই নব তল স্তম্ভটি ১২০ ফিট উচ্চ; এই কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। স্তম্ভের গাত্রে বহুবিধ সুন্দর প্রস্তর খোদিত রহিয়াছে। কুম্ভ রানার পত্নী মীরাবাঈ-এর নাম এদেশে বিখ্যাত। মীরা অতিশয় ভক্তিমতী ও ধর্মপরায়ণা নারী ছিলেন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় দ্বারকাপুরী দেখিবার ইচ্ছ প্রকাশ করিলে তাঁহার জন্য এই স্তম্ভ নির্মিত হয়, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকাতে, কেহ কেহ ইহাকে মীরাবাঈ-এর স্তম্ভও বলিয়া থাকেন।

আমরা চিতোবের বহুবিধ পুরাতন মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া অবশেষে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলাম, যেখানে আসিয়া আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। এই স্থানে পর্বতের গাত্রে এক ক্ষুদ্র মন্দির; পর্বতের গাত্র হইতে নিরন্তর স্ফটিকধারা সমান জলধারা বহির্গত হইয়া মন্দিরস্থিত মহাদেবের মস্তকে পড়িতেছে। এই প্রস্রবনের জল দ্বারা সম্মুখের একটি বাঁধান পুষ্করিণী সর্বদা পূর্ণ হইতেছে। ইহার দক্ষিণে একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখিলাম। রাজবাটী হইতে সুড়ঙ্গটি আসিয়াছে। চিতোরের স্বাধীনতার দিনে রাজকন্যাগণ এই পথ দিয়া এখানে আসিয়া পূজা ও স্নান সমাপন করিতেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই ঃ—১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। দুর্গস্থ রাজপুতগণ শেষপর্যন্ত প্রাণ দিয়া দুর্গরক্ষা করিবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন, একদিকে যেমন মুসলমানগণ বারবার দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে রাজপুতেরাও রাত্রের মধ্যেই তাহা পুনরায় সংস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন, বহুকাল এইরূপ চলিল। পরিশেষে রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ জয়মল্ল ও পুত আকবর কর্তৃক নিহত হইলেন, তখন নেতাশূন্য হইয়া আর অধিককাল দুর্গ রক্ষা করিতে পারা যাইবে না জানিয়া, দুর্গস্থিত সমস্ত নরনারী শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিল। তখন আট হাজার রাজপুত বীর

হরিদ্রাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া জন্মের মত আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রদলের ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে পতিত হইলেন, ও অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজপুত নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া একজন বাঙালি কবি যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি করিয়া দিলাম।

"জ্বলজ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক-জ্বলুক চিতার আগুন, জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী হলেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।
জ্বলজ্বল চিতা, দ্বিগুণ-দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জ্বলুক-জ্বলুক, চিতার আগুন, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী।
দেখ্‌রে জগৎ, মেলিয়া নয়ন, দেখ্‌রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।"

আমরা যে মন্দিরের নিকট বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখেই এই মহা চিতা স্থান। এই দারুণ ঘটনার পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আকবর শাহ্ যখন চিতোরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজপুর বীরগণের বীরত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ মোহিত হইল। তিনি দেখিলেন, চিতোরে বাধা দিতে আর কেহ নাই। পুরুষেরা সকলে রণক্ষেত্রে মরিয়াছে ও রমণীরা চিতানলে দগ্ধ হইয়াছে। শুনা যায়, এই ঘটনাতে আকবরের প্রাণে এত ক্লেশ হইয়াছিল, যে তিনি দিল্লিতে ফিরিয়া আসিয়া জয়মল্লের ও পুতের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি গড়াইয়া নিজের প্রাসাদ সমীপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

লখনউ ভ্রমণ

অযোধ্যার নাম কে না জানে? রামায়ণ যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে অযোধ্যার নাম জন্মের মতো গাঁথিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন অযোধ্যা বা আউড্ প্রদেশে অযোধ্যা নামে একটি পুরাতন নগর পড়িয়া আছে। সেটি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। সেখানে গেলে সেখানকার পাণ্ডারা রাম-সীতার অনেক চিহ্ন দেখায়। বলে, এখানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, ওই ঘরে সীতাদেবী রন্ধন করিতেন ইত্যাদি। সে সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক যে অযোধ্যা নগরের নাম হইতে অযোধ্যা প্রদেশের নাম হইয়াছে, অনেকদিন হইল সে অযোধ্যা নগর নিবিয়া গিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্তে লখনউ নগরের বিষয় কিছু বলিতেছি। লখনউ শহর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। গোমতী গঙ্গারই শাখা; খালের মত শহরটির একপাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, এই স্থানের শানসভার লক্ষ্মণের উপর দেন, লক্ষ্মণের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম লক্ষ্মণপুর হয়, পরে তাহা হইতে লখনউ হয়। হিন্দু রাজাদের সময়ে লখনউ তত বিখ্যাত ছিল না। মুসলমান রাজাদের রাজত্ব সময়েই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে অযোধ্যা তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইলে, বাহাদুর শাহ নাম-মাত্র দিল্লির সম্রাট ছিলেন। ইহারই সময়ে সদৎ খাঁ নামক একজন পারস্য-দেশীয় বণিক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া অযোধ্যার শাসনভারপ্রাপ্ত হন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। অনেক রক্তপাতের পর মহম্মদশাহ নামে একব্যক্তি সম্রাট হয়। এই সময়ে সদৎ আলি খাঁ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনভাবে নবাব উপাধি গ্রহণ করিয়া, অযোধ্যাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই অযোধ্যার প্রথম নবাব। সদৎ আলি খাঁর বংশের লোকেরা ইংরাজদিগের অধিকার সময় পর্যন্ত একশত বৎসর নিরুপদ্রবে অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। ক্রমে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ বাঁধিয়া ইংরাজরা প্রসিদ্ধ বক্সারের যুদ্ধে লখনউ-এর তখনকার নবাব সুজাউদৌলাকে পরাস্ত করেন। কিন্তু তখনও দিল্লির সহিত অযোধ্যার নামমাত্র সম্বন্ধ ছিল। ক্রমে-ক্রমে সেই সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ইংরাজরা অযোধ্যার নবাবকে আপনাদের করদ রাজরূপে পরিণত করেন। অবশেষে নবাবেরা করপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে এবং অন্যান্য কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব ওয়াজেদ আলি-শা লর্ড ক্যানিং কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন; এবং অযোধ্যাকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ গভর্নমেন্টের রাজ্যভুক্ত করা হয়। ওয়াজেদ আলি খাঁ অত্যন্ত সৌখিন ও সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি লখনউ ঠুংরি নামে এক বিখ্যাত নূতন সুরের সৃষ্টি কর্তা। ইংরাজেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজে বন্দি করিয়া রাখেন। সে সময়ে তাঁহার প্রজারা শোক করিয়া নিম্নলিখিত গানটি বাঁধিয়াছিল।

"নিমক হারামে মুলুক ডবায়,
হজরত প্রাযে হে লণ্ডন কো।
ওয়াজেদালসী যুগ -যুগ জীয়ে,
যিস্‌নে বনয়ি লখনউ নগরী।
মহলমে-মহলমে বেগম রোয়ে,
গলি-গলি রোয়ে পাথুরিয়া।"

ওয়াজেদ আলি-শা মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাতীরে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বাস করিতেন। বন্দি অবস্থায়ও তাঁহার আড়ম্বরপ্রিয়তা ও সখের হ্রাস হয় নাই। প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরে পায়রাদিগের বাসস্থান নির্মিত ছিল। পায়রার খেলা দেখিতে ওয়াজেদ আলি-শা বড় ভালোবাসিতেন। হাজার-হাজার পায়রা ঝাঁকে-ঝাঁকে নবাবের অট্টালিকার উপরে উড়িত। তাঁহার সুন্দর উদ্যানটিও একটি দেখিবার স্থান ছিল। তখনও আলিপুরে পশুশালা হয় নাই। নবাবের বাগানের জন্তু সংখ্যা আলীপুরের পশুশালা হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেও সেখানে হাঁস ও অন্যান্য পাখির সংখ্যা অনেক অধিক ও নানা প্রকারের ছিল। লখনউ-এর নবাবের বাড়ি, ঘর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার আদিস্থান লখনউ দেখিবার

ইচ্ছা অনেকদিন হইতে মনে ছিল। লখনউ-এর বাগান, রাজবাড়ী, প্রভৃতি সমুদয় নবাবদের বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়। লখনউ শহরে অনেকগুলি উদ্যান আছে; তাহার মধ্যে কাইসারবাগ নামক উদ্যানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ওয়াজেদ আলি-শা এই উদ্যানটিকে ইন্দ্রভবন তুল্য কবিয়া তাহাতে বাস করিতেন। এখন আর ইহার তেমন শোভা নাই। পূর্বে যেখানে বেগমদিগের বাসস্থান ছিল এখন তাহা সৈনিকদের জেল হইয়াছে ও উদ্যানের মধ্যে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লখনউ-এর পুরাতন রাজভবন 'ছত্রমুঞ্জিলে' এখন সরকারি কাছারি হয়।

'মচ্ছিবাওয়ান' ও 'ইমামবাড়া' লখনউ-এর দুইটি প্রধান দেখিবার উপযুক্ত স্থান। 'মচ্ছিবাওয়ান' একটি মসজিদ। প্রবাদ এই যে এখানে লক্ষ্মণের বাসস্থান ছিল বলিয়া, হিন্দুরা ইহাকে পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য করিতেন, এজন্য হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব এখানে এই মসজিদই নির্মাণ করেন। ইহাতে ৫২টি মাছের ছবি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এখানে একটি কুপ আছে তাহা প্রায় দ্বিতল গৃহের সমান উচ্চ। 'ইমামবাড়া' আসকউদ্দৌলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পিতা সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 'রুমিদরজা' নামক প্রকাণ্ড ফটক কনস্টান্টিনোপল নগরের প্রকাণ্ড ফটকের অনুকরণে নির্মিত। ইহার নিকটে হোসেনাবাদ নামক একটি মসজিদ। আদিল শা নামে এক নবাব ছিলেন, তিনি নিজ সমাধির জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এখানে নৃত্যগীতাদি আমোদ হইত। উপরে বেগমদিগের বসিবার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। এত বড় প্রকাণ্ড গৃহ আমরা আর দেখি নাই। আমাদের কলিকাতা টাউন হল হইতেও অনেক বড়। এখন ইহা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। লা মার্টিনিয়ার কলেজের গৃহ লখনউ-এর আর একটি দর্শনীয় স্থান। মার্টিনিয়ার সাহেব নবাবের সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। প্রথমে এই অট্টালিকা নবাবের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হইয়াছিল, পরে ইহাতে মার্টিনিয়ার সাহেবের সমাধি হয়। মার্টিনিয়ারের সমাধির ওপরে ছয়তালা গৃহ দুর্গের ন্যায় উঠিয়াছে, দুই পার্শ্বে কলেজ গৃহ। অট্টালিকাটি ইটালিয়ান ধরনে নির্মিত।

এই সকল অট্টালিকা ব্যতীত সিপাহীবিদ্রোহের ভগ্নাবশেষ বেলিগার্ড বা পুরাতন রেসিডেন্সী একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটি একটি উচ্চ ভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে স্যার হেনরী লরেন্স সাহেব লখনউবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্যার হেনরী লরেন্সের নাম এদেশে বিখ্যাত। তিনি যেমন বীর তেমনিই কর্তব্যপরায়ণ ও তেমনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। বেলিগার্ডের ভগ্ন গৃহগুলি ঠিক সেইরূপভাবেই রক্ষিত হইতেছে। কামানের গোলা যেখানে যেখানে লাগিয়াছিল, সেখানে সেখানে বড় বড় ছিদ্র আজিও রহিয়াছে। যে গৃহে কামানের গোলা লাগিয়া লরেন্সের মৃত্যু হইয়াছিল, যেখানে অস্ত্র-শস্ত্র রাখা হইয়াছিল, আহতদিগের জন্য যেখানে হাসপাতাল হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলাম। মৃত্তিকার নিম্নে একটি ঘরে শিশু ও রমণীদিগকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেখানেও কামানের গোলা প্রবেশ করিয়া কয়েকজনকে বিনষ্ট করে। সেই ঘরে এখনও স্থানে-স্থানে রক্তের দাগ দেখা যায়। ইহার

নিকটেই যুদ্ধে হত বীরগণের সমাধিস্থান। নীল, আউটরাম, প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। ইংরাজদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া স্যার হেনরি লরেন্সের প্রাণ যায়। তাঁহার সমাধির উপরে শুদ্ধ এই কথা লিখিত আছে "ইনি স্বীয় কর্তব্যপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই সকল দেখিতে-দেখিতে মনে গভীর বিষাদের আবির্ভাব হইল, আমরা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

মাদ্রাজ ভ্রমণ

ম্যাপে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, বঙ্গদেশ হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কতদূরে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ প্রায় সমুদয়ই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, তিন দিকে সমুদ্র। উত্তরে-দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ। এই সীমার অন্তর্গত দেশগুলিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কহে। প্রধান নগর মাদ্রাজ শহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মাদ্রাজ যাইবার দুইটি পথ আছে, স্থলপথে যাইতে হইলে, হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়িতে উঠিয়া পুনা পর্যন্ত যাইয়া, সেখান হইতে পুনরায় রেলগাড়িতে মাদ্রাজ যাইতে হয়। ইহাতে পথ কষ্ট অধিক, এবং যাইতে প্রায় ছয়দিন লাগে, সমুদ্রপথে বিশেষ কোন কষ্ট নাই, কলিকাতায় জাহাজ উঠিয়া চারিদিনের দিন মাদ্রাজ পৌঁছান যায়। যাঁহাদের পূর্বে সমুদ্র দেখা হয় নাই, তাঁহারা এই সুযোগে সমুদ্র দেখিয়া লইতে পারেন। বাল্যকালে সমুদ্রের বর্ণনা পড়িয়া ও শুনিয়া সমুদ্র দেখিবার ইচ্ছা আমার মনে খুব প্রবল ছিল। সুতরাং সমুদ্রপথেই মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম।

জাহাজ চড়িয়া ক্রমে যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী হইলাম, তখনকার আনন্দ বর্ণনা করিতে পারি না। নদীর জল যেখানে সমুদ্রের গাঢ় নীল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সেস্থানে স্পষ্ট দুইটি বিভিন্ন জলস্রোত দেখা যায়,—একদিকে নদীর কর্দমময় জল, অপরদিকে সমুদ্রের পরিষ্কার গাঢ় নীল জল, গঙ্গাসাগর ছাড়াইলেই জাহাজের লোকদের তীরের সহিত শেষ দেখা,—তারপরই অকুল সমুদ্র! পার নাই, কিনারা নাই—যেদিকে চাই কেবল তরঙ্গ ময় জলরাশি! ঝড় না থাকিলে সমুদ্রযাত্রা বড় সুখকর। রাত্রিতে সমুদ্রের জলে আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যাইত। জাহাজের সংঘর্ষণে জলে যেন শত-শত আলো জ্বলিয়া উঠিত। সমুদ্রে একপ্রকার জীবাণু আছে, তাহারা জাহাজের আঘাতে জোনাকির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, তিনদিন, দিনরাত্রি চলিয়া রাত্রিতে জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছিল। রাত্রিতে বন্দরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই, এজন্য বন্দরের বাহিরে নঙ্গর ফেলিয়া রহিল, আমরা সেই রাত্রেই কেবিনের গবাক্ষ দিয়া মাদ্রাজের আলোকস্তম্ভ দেখিলাম। মাদ্রাজ উপকূলস্থ জলমগ্ন বালুকা দ্বীপের উপর পতিত হইয়া অনেক জাহাজ বিনষ্ট হয় বলিয়া এই আলোকস্তম্ভটি নির্মিত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল, আমরা তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠিয়া দেখিলাম, নূতন দেশে আসিয়াছি। ক্ষুদ্র নৌকার সারি পিপীলিকার ন্যায় জাহাজখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকাগুলি নূতন ধরনের, লোকগুলির চেহারাও বেশ নূতন ধরনের। ছবিতে ইহাদের বেশ ও নৌকার আকৃতি দেখিতে পাইবে। যে নৌকাগুলিকে ৮/১০ জন মাঝি

দেখিতেছ, সেগুলি আরোহীদের জন্য, আর পাশাপাশি তিন চারিটা তালগাছ বাঁধা ছোট ছোট নৌকাগুলি জাহাজে খাদ্যাদি আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষুদ্র নৌকাতে চড়িয়াই জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, এই নৌকার নাম "কাটামারান"। কিরূপে এই কাটামারানে চড়িয়া জেলেরা দিনরাত্রি সমুদ্রে কাটায় ভাবিলে আশ্চর্যবোধ হয়। অভ্যাসবশত ইহাদের মনে কোন ভয় নাই। আর এ নৌকার ডুবিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, নৌকাগুলি ভাসিবেই। আমি অনেকবার লোকজনসহ নৌকা উলটাতে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

আমরা একখানা বড় নৌকা করিয়া তীরে পৌঁছিলাম, এখন বন্দর নির্মিত হওয়াতে তীরে ওঠা সহজ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে তত সহজ ছিল না। এক একবার ঢেউ আসিয়া নৌকা ঠেলিয়া তীরে না লইয়া গেলে, মাঝিদের সাধ্য নাই যে, নৌকা তীরে লইয়া যায়। তাহার পরেও মাঝিদের কাঁধে চড়িয়া শুষ্ক স্থানে নামিতে হয়। এখনও যাহারা বন্দরের টেক্স দিতে না চান, তাঁহারা ওই প্রণালীতে তীরে উঠিতে পারেন। তীরে উঠিয়া প্রথমেই মাদ্রাজীদের ভাষা কানে ঠেকিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চারটি ভাষা প্রচলিত, উত্তর-পূর্ব দিকে তেলেগু ভাষা, দক্ষিণ-পূর্বে তামিল ভাষা, উত্তর-পশ্চিম 'কেনেরিস' এবং দক্ষিণে-পশ্চিমে 'মালায়ালাম'। এই সকল ভাষাকে দ্রাবিড়ী ভাষা বলে। নিজ মাদ্রাজে তামিল ভাষা ব্যবহৃত হয়। কেনেরিস ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাগুলি আমাদের কানে বড় কর্কশ বোধ হয়। ইহাদের ভাষা না জানিলেও বিদেশিদের কলিকাতায় আসিলে, যেমন অসুবিধা হয়, মাদ্রাজে তেমন হয় না, কারণ সকলেই প্রায় কাজ চালান ধরনের একটু ইংরেজি জানে।

তীরে উঠিয়া প্রথম দৃশ্য, মাদ্রাজের দুর্গ "ফোর্ট সেন্ট জর্জ"। ছবিতে এই দুর্গ ও দুর্গের মধ্যস্থিত নিশানস্তম্ভ দেখিতে পাইবে।

ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের সময় (১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে) এই দুর্গ নির্মিত হয়। প্রথম যখন ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার জন্য রত্নগিরির রাজার নিকট হইতে সামান্য ভূমিখণ্ড গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের আত্মরক্ষার সামান্য উপায় ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠিল তখন, (১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে) তাহারা মাদ্রাজস্থ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন, তাহার পর ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা একবার মাদ্রাজ অধিকার করেন। পরে ইংরাজেরা ফরাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান দুর্গ নির্মিত হয়। ভাবিলে অবাক হইতে হয়, একটি ক্ষুদ্র শহর হইতে কত বড় একটা প্রেসিডেন্সি গঠিত হইয়াছে। সমুদ্র তীরে দুই মাইল জুড়িয়া সেনেট হাউস, হাইকোর্ট, হোটেল, গভর্নমেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে। শহরে উঠিয়া দুর্গ ছাড়াইলেই ব্ল্যাকটাউন বা কাল শহর। এখানে শহরের যত দোকানপাট,—অনেকটা কলিকাতার চাঁদনি এবং বড়বাজারের ন্যায়। এই স্থানে অনেক মাদ্রাজি ও ফিরিঙ্গি বাস করে। শহরের এই অংশকে কেন এই কুৎসিত নাম দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে-মাঝে এক একটি ইংরাজ পল্লি—আবার এক একটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র—এইরূপ ২৭ বর্গমাইল স্থানে শহরটি বিস্তৃত। শহরের মধ্য দিয়া "কুয়াম" নামে খালের ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে, শহরের মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে অনেকবার নদীর উপরস্থ সেতু পার হইতে হয়।

শহরের মধ্যে দেখিবার স্থান "পিপল্‌স্ পার্ক" বা জনসাধারণের উদ্যান, মিউজিয়াম এবং বোটানিকেল গার্ডেন, তাহাও কলিকাতার তুলনায় বেশি কিছু নহে। যাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া শহর ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তাঁহারা শহরের ধূলা ও রৌদ্র ভোগ করিয়া মাদ্রাজের যথেষ্ট নিন্দা করেন, কিন্তু যাঁহারা অধিকদিন মাদ্রাজে থাকিয়া মাদ্রাজের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য শোভা এবং অপরাহ্নে সমুদ্রতীরের শোভা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মাদ্রাজ তত খারাপ বোধ হয় না। সমুদ্রতীরে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ন্যায় বাদ্যস্থান আছে, এখানে অপরাহ্নে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বেড়াইতে আসেন। সমুদ্রতীরে বালুকা রাশির মধ্যে নামিয়া শামুক ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণি অনুসারে বিভক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে শামুক কুড়ানো এক নেশা হইয়া দাঁড়ায়। অনেক ইংরাজ বালক-বালিকা এমন কি বড় বড় লোক এই প্রকারে আমোদ লাভ করেন।

মাদ্রাজে স্কুল কলেজেব সংখ্যা কলিকাতার ন্যায় এত অধিক না হইলেও কতকগুলি ভালো ভালো কলেজ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিলার সাহেবের খ্রিস্টান কলেজ, সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জনসাধারণের 'পাচিয়াপা' কলেজই প্রধান। 'পাচিয়াপা' নামে একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক কলেজ নির্মাণার্থ ও কলেজের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কলেজের সংলগ্ন সাধারণের বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য "পাচিয়াপার হল" নামে একটি হল আছে। মাদ্রাজিদের আচার-ব্যবহার ও খাদ্য বাঙালিদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জাতি বিচারের কঠিন নিয়মগুলি এখনও রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এই তিন বর্ণ ব্যতীত 'পারিয়া' নামে আর এক নীচ জাতি আছে তাহারা আমাদের দেশের মুচি হইতেও ঘৃণার পাত্র, এই জাতি এখন দলে-দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের উন্নতি সাধন করিতেছে।

সাধারণত মাদ্রাজিরা চামড়ার জুতো ব্যবহার করে না; হয় শূন্য পদে না হয় কটকি জুতার ন্যায় চটি পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়। পুরুষেরাও স্ত্রী লোকেদের ন্যায় লম্বা চুল রাখে, কানে অলঙ্কার পরে, কাহারও হাতে বালাও দেখিয়াছি। পুরুষেরা যখন স্নানান্তে অনাবৃত পদে কোট পেন্টলুন পরিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যান তখন সেই দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখায়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বঙ্গদেশের ন্যায় স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই; সম্ভান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যান না বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের আবশ্যক মতো বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কফি খাওয়ার নেশা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ হইয়াছিল। সমস্ত দিন ইহাদের বাড়িতে হাঁড়িতে কফি প্রস্তুত থাকে, নিজেরাও বার বার কফি পান করেনই, অতিথি অভ্যাগত আসিলেই তাঁহাদেরও কফি পান করিতে অনুরোধ করেন।

বিস্তৃত শহর বলিয়া বাড়িতে লোকজনের কোলাহল বা গাড়ি ঘোড়ার শব্দ অধিক শুনা যায় না। আমি যখন মাদ্রাজ ছিলাম, তখন রাস্তাতে গ্যাসের আলো ছিল। আজকাল শুনিয়াছি, ইলেকট্রিসিটি দ্বারা ট্রামগাড়ি চালিত হয়, ইহা সত্ত্বেও বাহ্য উন্নতিতে মাদ্রাজ যে বোম্বাই ও কলকাতা অপেক্ষা হীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাদ্রাজ বিষুবরেখার নিকটে বলিয়া এখানে শীত গ্রীষ্মের বৈষম্য নাই। শীত একেবারেই নাই; সমস্ত বৎসর ধরিয়া একই রকম গ্রীষ্ম। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মুসলমানদের প্রভাব বেশি না থাকাতে

হিন্দুকীর্তি সমুদয় অক্ষুন্ন রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যেমন প্রতি শহরে মুসলমানদের নির্মিত হর্ম্মাদি দেখা যায়, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তেমনি হিন্দুদের দেবালয় প্রভৃতির কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। বারান্তরে তোমাদিগকে সেই সব স্থানের কথা জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

কাশ্মীর

এবার পূজার ছুটিতে আমরা কাশ্মীর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কাশ্মীর ভারতের কোনদিকে তাহা ভারতের ম্যাপে দেখো। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভ্রমণবৃত্তান্ত ভালোবাস, তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য আমাদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। ইংলন্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের বালক-বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়িতে ভালোবাসে, তাহার সুফল এই হয় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। উত্তরমেরুদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের মতো কত লোকে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। আফ্রিকার নানা স্থান আবিষ্কারের জন্য লিভিংস্টোন সাহেব কত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কতবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এখনও ন্যানসেন নামক একজন সাহেব গ্রীণল্যান্ডের উত্তরে কি আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হয়। আমাদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া একটা না হইলেও আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকবার মনে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার আগ্রহ জন্মিবে।

পূর্বে কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে অনেক বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, শুনিতাম কাশ্মীর নাকি ভূতলে নন্দন কানন। আমার এই সকল কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল। হিমালয়ের অনেক দর্শনীয় স্থান ইহার পূর্বেই দেখিয়াছিলাম। কুমায়ুনের তুষার নদী দেখিতে গিয়া প্রকৃতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিক সৌন্দর্য যে আব কোথাও আছে তাহা বিশ্বাস হইত না।

রাউলপিণ্ডি পর্যন্ত রেলগাড়িতে যাইতে হয়, তাহার পব টাঙ্গা গাড়িতে চড়িতে হয়। তোমাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমে থাক, তাহারা আবশ্যই এই গাড়ি দেখিয়াছ। তিন-দিন এই টাঙ্গায় চড়িয়া কত পাহাড় পর্বত ও উপত্যকা পার হইলাম। প্রায় ৫ মাইল অন্তর টাঙ্গার ঘোড়া একবার করিয়া বদলানো হয়। এই সকল স্থানে পথিকদের জন্য ধর্মশালা ও খাবার জিনিসের দোকান আছে। এই সকল স্থানে ১০/১৫টা গরুর গাড়ির গরুগুলি বিশ্রাম করিতে-করিতে রোমন্থন করিতেই দেখা যায়। এই নিরীহ পশুগুলি কিরূপে এই সকল গাড়ি ও অসমান পার্বত্য রাস্তা দিয়া এত ভারী বোঝা লইয়া যায়, তাহা ভাবিলে বড় আশ্চর্যবোধ হয়। সকালবেলা ৭/৮টি হইতে ইহারা ধীরে-ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিতে থাকে, দু-প্রহরের সময় বিশ্রাম করিয়া আবার ৩/৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইরূপ কার্য করে। গরুর গাড়ি ছাড়া পথে মধ্যে-মধ্যে উটের সারি চলিতেছে দেখা যায়। পাঠানেরা ২/৩ পরিবার হইয়া

চলে। উটের পিঠে সমুদয় বোঝা চাপাইয়া দেয়। পথশ্রমে ক্লান্ত স্ত্রীলোকেরা মাঝে মাঝে উটের উপরে চড়িয়া যায়। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে ইহারা এক এক স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস, পাতা ও কাপড় দিয়া তাঁবু প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করে এবং উটগুলি চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। টাঙ্গা গাড়িগুলি যেন রাস্তার মালিক, টাঙ্গার বাঁশি বাজিবামাত্র এই উটের সারি গরুরগাড়ি বা এক্কা সকলেই পথ ছাড়িয়া একপাশ গিয়া দাঁড়ায়। টাঙ্গা চলিয়া গেলে পুনরায় মন্থর গমনে চলিতে থাকে। আমরা সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে বিশ্রামের জন্য কোন ডাক বাংলোয় আশ্রয় লইতাম। পরদিন আহারাদির পর আবার যাত্রা করিতাম। পথে যে রমণীয় দৃশ্য দেখিতাম, তাহাতে পথের সকল কষ্ট দূর হইত। এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাইতে বিচিত্র দৃশ্য করিতাম। কোথাও উচ্চ পর্বতের চূড়াগুলি আকাশভেদ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও শস্যপূর্ণশ্যামলক্ষেত্র বেষ্টিত উপত্যকা রহিয়াছে। নদী কোথাও গভীর গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। আবার কোথাও শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। এই রাস্তার প্রত্যেক সুন্দরস্থানের বর্ণনার স্থান হইবে না। পথে পুরাতন শিখদের দুর্গ, কত ভগ্নমন্দির, কত সুন্দর বৃক্ষ দেখিলাম। অবশেষে আমরা ঝিলাম বা বিতস্তা নদীতে নৌকার আশ্রয় লইলাম। সে নৌকা একটা দেখিবার মতো জিনিস, উহাকে ইংরাজিতে House boat বা গৃহনৌকা বলে; ইহাতে ৪/৫টা কুঠুরি।

তাহাতে খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সকল আবশ্যকীয় জিনিস আছে। আবার শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার স্থান ও ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য চিমনি আছে। আমরা বৃষ্টি বা শীত পড়িলে চিমনিতে আগুন জ্বালিয়া তাহার চারিদিকে বসিয়া গল্প করিতাম বা পুস্তকাদি পাঠ করিতাম। এখন সেই নৌকাগুলি যেমন নূতন রকমের ইহাদের চালাইবার ধরনও সেইরূপ। স্রোতের বিপরীতদিকে যাইবার সময় মাঝিরা গুণ-টানিয়া লইয়া যায়। স্রোতের দিকে যাইবার সময় বেশিরভাগ স্রোতেই ভাসাইয়া লয়। কখনও কখনও লগি দিয়া চালায়। এই লগি চালানকে তাহারা বল্লম লাগান বলে। বড় বড় নৌকাতে প্রায়ই দাঁড় ব্যবহার করে না। নৌকার ভিতরে থাকিয়া নৌকা চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারা যায় না। মাঝিরা সন্ধ্যা হইলে আর নৌকা চালায় না। মাঝিরা পরিবার লইয়া নৌকাতেই থাকে এবং পুরুষ এমনি ৫/৬ বৎসরের শিশুরাও নৌকা চালাইতে সাহায্য করে। আমরা নৌকাতে উঠিয়া দ্বিতীয়দিনে উলার নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ পার হইলাম, এই হ্রদটি মাঝিরা খুব ভোর রাত্রিতে পার হইতে আরম্ভ কবে এবং বড় নৌকার পার হইতে ৬/৭ ঘণ্টা লাগে। মাঝিরা বিকালবেলা কোন ক্রমেই এই হ্রদ পার হইতে চায় না। বিকালবেলা এখানে প্রায়ই ঝড় হয় এবং ঝড় হইলে বড়-বড় ঢেউ উঠিতে থাকে। একবার নাকি একজন মুসলমান নবাব মাঝিদের নিষেধ না শুনিয়া বিকালবেলাই হ্রদ পার হইতে চেষ্টা করিয়া কিছুদূর গিয়াই ঝড়ে পড়িয়া বহুসংখ্যক অনুচরসহ জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

কাশ্মীরী মাঝিরা ঝড়কে বড় ভয় করে, একদিন একটু সামান্য বাতাস হওয়াতে বিতস্তা নদীতে অল্প অল্প ঢেউ উঠিতেছিল। মাঝিবা তখনই চিৎকার করিয়া, তাড়াতাড়ি নৌকা বাঁধিয়া ফেলিল এবং সেদিন আর নৌকা চালাইল না। ইহাদের এত ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম, না; কারণ নদীটি শরৎকালে এমন ছোট যে, এপারে বসিয়াও ওপারের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায় এবং তাহাতে এত অল্প জল যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় তবে সকলস্থানে জল সমান নয় বলিয়া বোধ হয় কেহ হাঁটিয়া পার হইতে চেষ্টা করে না।

আমরা উলার হ্রদ পার হইয়া, পুনরায় বিতস্তা নদীতে পড়িলাম, যতক্ষণ এই হ্রদের মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণে মনে হইতেছিল যেন, আমরা সমুদ্র-বক্ষে আছি; বহুদূরে পর্বতমালা দেখা যাইতেছিল, আমরা সমুদ্রের ন্যায় অকুল জলরাশির মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এখনও সেই প্রকাণ্ড হ্রদ ও দূরবর্তী গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

বিতস্তা নদীতে আসিয়াই, মাঝিরা চা খাইবাব জন্য বক্‌সিস চাহিল, হ্রদ পার হইতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয় বলিয়া এবং নির্বিঘ্নে হ্রদ পার হইয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই বোধ হয় এই প্রথা চলিত হইয়াছে।

নদীর দুই পারেই সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং অনেক দূরে মাঝে-মাঝে কৃষকদিগের কুটীর। এক একটা ক্ষেত্রের পর দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণি দেখিলে, বুঝিতাম কৃষকপল্লি নিকটেই। এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত নদীর তীরস্থিত কৃষকের গ্রামগুলি দেখিলে নূতন দেশে নূতন শান্তিময় কাজে আসিয়াছি বলিয়া মনে হইত।

নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সারি। ইহাকে পীলাঞ্জল শ্রেণি কহে। পাহাড়গুলি চিরবরফে ঢাকা রহিয়াছে। কাঞ্চনজঙঘার শিখর সর্বদা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু মেঘের জন্য সকল দিন তাহা দেখিবার সুবিধা ঘটে না। দার্জিলিং থাকিতে যেদিন কাঞ্চনজঙঘার তুষারবৃত শৃঙ্গ দেখিতে পাইতাম, সেদিন কত আনন্দ হইত। কাশ্মীরে দিবানিশি এই বরফে আচ্ছন্ন শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে দিগন্তব্যাপী বরফের স্তূপ। এই বরফ রাশিতে সূর্যকিরণ পড়িলে এক নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। কখনও সোনালি রঙে, কখনও উজ্জ্বল রৌপ্য বর্ণে, আবার কখনও বা গোলাপি আভাতে ঝকঝক করিতে থাকে।

পরদিন আমরা সম্বল নামক স্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। দূর হইতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চেনার গাছ দেখিয়া বুঝিলাম গ্রাম নিকটেই। চেনার গাছগুলি অনেকটা অশ্বত্থগাছের মতো; তাহা হইতেও অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। কাশ্মীর ভিন্ন আর কোথাও এই গাছ জন্মে না। এখানে ইহাকে বৃক্ষরাজ (Royal tree) বলে। বাজার আদেশ ভিন্ন কেহ ইহার ডাল ভাঙিতে পারে না। সম্বলে রাত্রিযাপন করিয়া আমরা পরদিন প্রত্যুষে মানসবল নামক একটি হ্রদ দেখিতে গেলাম। এই হ্রদে প্রবেশ করিবার পথ বড় সঙ্কীর্ণ। আমাদের নৌকা বড় বলিয়া আমরা হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। পাহাড়েব উপরে কয়েকটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র পার হইয়া—মানসবলে পৌঁছিলাম। হ্রদের পারে অল্প জলের মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় ক্ষুদ্র ঘোড়া হাঁসের মতো জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া-ডুবাইয়া কি খাইতেছে দেখিয়া আমাদের বড় হাসি পাইল। পরে জানিলাম ইহারা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ খাইতেছে। মানসবলের তট দিয়া হাঁটিয়া গিয়া আমরা ফকিরের গুহাতে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই গুহার কথা শুনিয়া অবধি ইহা দেখিবার খুব ইচ্ছা ছিল। মহর্ষি যখন কাশ্মীরে বেড়াইতে যান, তখন এই সাধু জীবিত ছিলেন এবং প্রত্যহ এক কোদালি মাটি কাটিয়া নিজের সমাধি প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরা গিয়া শুনিলাম যে, দুই বৎসর হইল সাধুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে গুহাতে কবরস্থ না করিয়া নিকটবর্তী কোনো স্থানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপরে পেয়ারা, আপেল, পিচ প্রভৃতি নানাবিধ গাছ রোপিত হওয়াতে স্থানটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে। আমরা আলোক লইয়া গহ্বরটি দেখিলাম। গুহাটি ২০/২৫ হাত লম্বা। আসিবার সময় সাধুর পুত্র আমাদিগকে অনেক ফল উপহার দিলেন। জেলে ডিঙ্গির মতো

ছোট নৌকায় আমরা মানসখল ত্যাগ করিয়া গৃহনৌকাতে ফিরিলাম। হ্রদের জল এত নির্মল ও স্বচ্ছ যে, হ্রদের নীচে অবস্থিত সবুজবর্ণ শেওলাগুলি পর্যন্তও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই হ্রদের মধ্যে স্থানে-স্থানে পদ্মবন। যখন পদ্মগুলি ফুটে তখন না জানি হ্রদের শোভা আরও বৃদ্ধি পায়। হ্রদের একপার্শ্বে নূরজাহানের প্রমোদ কাননের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম; কাশ্মীরের মধ্যে যে যে স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত, সেই সেই স্থানে নূরজাহান প্রমোদভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও শ্রীনগরে সেইসকল গৃহ সুরক্ষিত আছে।

পরদিন পূর্বাহ্নে সাদিপুর নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে সিন্ধু নামে ক্ষুদ্র নদী বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলনের মধ্যস্থলে জলের মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপে একটি চেনার বৃক্ষ রোপিত আছে। দুই নদীর সঙ্গম-স্থল বলিয়া এস্থান কাশ্মীরবাসীদিগের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। তাহারা এখানে স্নান ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সন্ধ্যার সময় নৌকার ছাতে বসিয়া সুদূরে বহুগৃহে সমাকীর্ণ নগর দেখিতে পাইলাম, বুঝিলাম, উহাই শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। কাশ্মীরের মহারাজ গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে জম্বুতে বাস করেন। শ্রীনগর শহরটি বিতস্তা নদীর দুই পারে তিনমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণত নৌকাতেই উভয় পারে যাতায়াত সম্পন্ন হয়, উভয় পারে অসংখ্য নৌকা। গাড়ির পরিবর্তে শ্রীনগরে নৌকাই ব্যবহৃত হয়। উভয় পারে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৭টি সেতু আছে বটে, কিন্তু নৌকার প্রচলনই অধিক। এক একটি ধনীর নৌকা দেখিবার মত জিনিস। নানাবর্ণে চিত্রিত ও কারুকার্যে মণ্ডিত নৌকার মধ্যে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা বেশভূষা করিয়া বিচিত্র আসনে বসিয়া আছেন, এবং ২০/২৫ জন মাঝি তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া বিদ্যুৎবেগে শত শত নৌকার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, দেখিতে খুব সুন্দর।

আমাদের নৌকা শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যবসায়ীরা নৌকা করিয়া তামা, রূপা ও কাগজের বাসনপত্র ও কাশ্মীরি শাল লইয়া আমাদের নৌকার চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকাতে বসিয়াই আমরা কাশ্মীরের সমুদয় শিল্পদ্রব্য দেখিলাম।

শ্রীনগরের যেদিকে ইংরাজেরা বাস করেন, সেদিকটা খুব পরিষ্কার; চেনার, সফেদা প্রভৃতি গাছ সারি সারি থাকাতে সেই স্থানের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানটির নাম মুন্সীবাগ। শ্রীনগরের নিকটে তাঁবু ফেলিয়া অনেক সাহেব বাস করেন, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ সুন্দর সুন্দর স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা পরদিন ডাল হ্রদ দেখিতে গেলাম। ইহা একটি প্রকাণ্ড হ্রদ, বিতস্তা নদী হইতে ডালহ্রদে যাইবার জন্য খাল কাটানো আছে। অনেকে ডালহ্রদে বেড়াইতে যান; ইহা শ্রীনগরের একটি প্রধান দর্শনীয়স্থান। এই হ্রদের পারে সালিমার বাগ, নাসিম বাগ, নিসাত বাগ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর প্রাচীন উদ্যান রহিয়াছে। সালিমার বাগ নূরজাহানের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল। হ্রদ হইতে সালিমার বাগে প্রবেশ করিবার জলপ্রণালীর দুই পার্শ্বে সারি-সারি উইলো গাছ জলে নুইয়া পড়িয়াছে। সেস্থান দিয়া আমাদের ছোট নৌকা সালিমার বাগে প্রবেশ করিল। লাহোরের সালিমার বাগের আদর্শে এই উদ্যান নির্মিত হয়। সেরূপ সিঁড়ির ধাপের মতন ৭টি ধাপে এই বাগান নির্মিত। প্রমোদগৃহের চারিপার্শ্বে ফোয়ারা পড়িবার বন্দোবস্ত পূর্বের মতনই রহিয়াছে। গৃহে বসিয়াই হ্রদের সৌন্দর্য এবং অদূরে বরফের শোভা সম্ভোগ করা যায়। আমরাও এই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে, পুরাতনকালের কথা স্মরণ করিয়া

সালিমারে শিল্পচাতুর্যের এবং নূরজাহানের রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আর একদিকে পরিমহল নামে মুসলমানদের সময়ের একটি মানমন্দির আছে। তাহার নিকটে চসমাসহি নামে বিখ্যাত নির্ঝরিণী। পূর্বে এই নির্ঝরিণীর জল কেবল শ্রীনগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পান করিতেন; এখন এই জল নল দিয়া শ্রীনগর শহরে লওয়া হইয়াছে, এবং সকলই তাহা পান করিতে পারে।

ডাল হ্রদের আর একদিকে একটি গ্রামে হাজরত বাল্ নামে একটি মসজিদ আছে। এখানে মহম্মদের মাথার চুল রক্ষিত আছে বলিয়া প্রমাদ আছে। নির্দিষ্ট সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। ডাল হ্রদে প্রবেশ করিতেই ডানদিকে 'টাখ্‌ত সলিমিন' নামক ক্ষুদ্র পর্বত। ইহার শিখরে একটি পুরাতন মন্দির আছে, কেহ কেহ বলেন এই মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত; এজন্য ইহার আর এক নাম শঙ্করাচার্য। এই পাহাড়ে উঠিলে শ্রীনগর শহরটি পরিষ্কার দেখা যায়। ডাল হ্রদ হইতে আর একটি ক্ষুদ্র পর্বতে যাওয়া যায়; তাহার নাম হরি পর্বত। এই পর্বতের উপর মহারাজার দুর্গ,—তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্রও এখানে রক্ষিত হয়। ডাল হ্রদের মধ্যেও অনেক পদ্মবন; কয়েকদিন হইল ফুল ফুটিয়া গিয়াছে মনে হইল। ফুলের বোঁটাগুলি তখনও পাতার মধ্যে খাড়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই হ্রদে ভাসমান ক্ষেত্র (Floating gardens) এক অপূর্ব জিনিস; পানা ও শেওলার ওপর মাটি ফেলিয়া এই বাগান প্রস্তুত করা হইয়াছে; ইহাতে তরমুজ, ফুটি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি তরকারি প্রস্তুত হয়, মালি ইচ্ছামত এই ক্ষেত হ্রদের যেস্থানে ইচ্ছা হইয়া যাইতে পারে। এই হ্রদটি এত বড় যে, একদিনে ইহার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা যায় না। শ্রীনগর হইতে আমরা ইসলামাবাদে গেলাম। পথে অবন্তীপুর ও পান্ডর্ত্তণ নামক দুইস্থানে প্রাচীন মন্দির দেখিতে নামিয়াছিলাম। ইসলামাবাদ কাশ্মীরের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান; ঝিলাম নদী এখান হইতেই বড় হইয়াছে; ইহার পর আর নৌকাতে যাওয়া না। আমরা ইসলামাবাদ হইতে ডান্ডিতে ভাওয়ান, মার্ত্তণ্ড, আচ্ছাবল, ভেরানাগ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে গিয়াছিলাম। ভাওয়ান ইসলামাবাদের অতি নিকটে, এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস, এখানে একটি প্রস্রবনের জল বাঁধাইয়া তাহাতে অনেক মাছ রাখা হইয়াছে, অমরনাথ যাত্রীরা এই রাস্তাতে যান এবং এখানে বিশ্রাম করেন। যাত্রীদের জন্য পস্রবনের পাশে একটি ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচ হইতে ক্রমাগত জল বাহির হইতেছে দেখা যায়।

পথে মার্ত্তণ্ড নামে একটি পুরাতন মন্দির দেখিলাম। ইহা সহস্র বৎসর পূর্বে সূর্যের পূজার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, এই মন্দির দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাশ্মীর দেশ সমগ্রই এককালে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল; চতুর্দিকে জলের মধ্যে উচ্চতম শিখরে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। আচ্ছাবল ও ভেরানাগ, এই দুইস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়; এই দুইস্থানেও নূরজাহানের প্রমোদ-গৃহ আছে। আমাদের সময় বেশি না থাকাতে এখান হইতেই আমাদের ফিরিতে হইল নতুবা কাশ্মীরে দর্শনীয় আরও অনেকস্থান আছে। যদি আবার কখনও যাইবার সুবিধা হয়, তবে সেই সব স্থানের বিষয় তোমাদিগকে জানাইব।

ভেনিস

ইটালিতে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন অপরাহ্নে আমাদের রেলগাড়ি জলরাশির মধ্যে সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল।

প্রথমত এই দৃশ্যে একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। পরে কৌতূহল ও বিস্ময়ে সেই ফেনিল জলরাশির সৌন্দর্য অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আমাদের গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিল। অন্যান্য স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি থাকে কিন্তু এখানে গাড়ি চলে না। অন্যান্য শহরের ন্যায় এখানে রাস্তা নাই—একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে, খাল দিয়া যাইতে হয়। নৌকা এদেশের বাহন। এদেশের নৌকাকে 'গণ্ডোলা' বলে। স্টেশনে অনেক গণ্ডোলা যাত্রীদের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। মাঝিরা দেখিতে দেখিতে আমাদের জিনিসপত্র নৌকায় উঠাইয়া লইল। রাত্রিকালে অপরিচিত জলরাশির মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছি ভাবিয়া শঙ্কিত হইলাম। নৌকাখানি কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিঃশব্দে বৃহৎ খাল হইতে ছোট ছোট কতকগুলি খাল অতিক্রম করিয়া হোটেল অভিমুখে চলিল।

এই জলময় নগরটির উৎপত্তির বৃত্তান্ত শুনিলে আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে হইবে। সমুদ্রে প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া পরে বৃহৎ হইয়াছে। ভেনিস শহরটিও সেইরূপ সমুদ্র মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন ভেনিসকে 'এড্রিয়াটিক সাগরের রানি' বলে, কিন্তু পূর্বে ইহার অস্তিত্বই ছিল না।

মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে ওই এড্রিয়াটিক সাগরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমুদ্র মধ্যে ভেনিস শহর নির্মাণ করিয়াছে। মানুষ-মানুষের নিকট জমি কাড়িয়া লয়, কিন্তু মানুষ সমুদ্র হইতে তাহার অংশ কাড়িয়া লইয়া রাজ্য বৃদ্ধি করে, এমন কখনও শুনিয়াছ কি? ভেনিস তাহার দৃষ্টান্ত।

'আল্প' ও 'টাইরল' হইতে ছয়টি স্রোতস্বিনীর জল এস্থানে সাগরের সহিত মিলিত হইত, ক্রমে তাহাদের মৃত্তিকা ও বালুকার স্তূপ জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গঠিত হইতে লাগিল। ভাঁটার সময় দ্বীপগুলি ভাসিয়া উঠিত, আবার জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত। এরূপ স্থানে কেহ ইচ্ছা করিয়া বাস করে না, কিন্তু বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি খুলিয়া যায়। ভেনিস নামে এক জাতীয় লোক পাহাড় হইতে শত্রুর তাড়নায় পলায়ন করিয়া এই জলমগ্ন দ্বীপে আশ্রয় লয়। তাহারা চতুর্দিকে কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া দ্বীপগুলিকে বাসস্থানের উপযুক্ত করিয়া লইল। চারিদিকে জল, সুতরাং শত্রুরা এখানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে-সঙ্গে শহরটিও বাড়িতে লাগিল। এরূপে ক্ষুদ্র স্থানটি বৃহৎ হইয়া উঠিল। তখন সকলে মিলিয়া একজন রাজা মনোনীত করিয়া, বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার করিতে মনোনিবেশ করিল।

রাজা প্রথমে দেশরক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। সেতু দ্বারা দ্বীপগুলি একত্র করা হইল, যাতায়াতের সুবিধাব জন্য খাল কাটানো হইল। সমুদ্রের ঢেউ যাহাতে শহরটিকে ভাসাইয়া

না লইতে পারে, এজন্য বড় বড় বাঁধ প্রস্তুত হইল। ভেনিস অতি শীঘ্রই বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিল

ক্রমে প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করিয়া ভেনিস ইউরোপের সকল জাতির মধ্যে প্রধানস্থান অধিকার করিল। তেরোশত বৎসর অতুল খ্যাতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়া ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ ফরাসিদের হস্তগত হয়। ভেনিসের ইতিহাস পাঠ করিলেও তাহার পুরাতন কীর্তির কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া শহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, ভেনিসে ঘোড়ার গাড়ি নাই, নৌকা ভেনিসবাসীদের প্রধান বাহন। এই নৌকাগুলির বিষয় কিছু লিখিতেছি। এক এক জন মাঝি কালো কাপড় পরিয়া, এক-একখানি দাঁড় হাতে লইয়া, কালো মখমলে মণ্ডিত এই গণ্ডোলাগুলিকে অতি ক্ষিপ্রগতিতে চালাইয়া থাকে। পূর্বে নগরবাসীরা নিজ-নিজ গণ্ডোলা বহুমূল্য আস্তরনে সজ্জিত করিত, কিন্তু কোনো কারণে আটশত বৎসর পূর্বে নিয়ম হইল, যে সকল গণ্ডোলাই কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। সেই অবধি এখন পর্যন্ত গণ্ডোলাগুলি কালো মখমলে মণ্ডিত। কেবলমাত্র বিদেশিরা রাজদূতের গণ্ডোলা রঙ্গিনবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ভেনিসবাসীরা ষড়যন্ত্র করিতে বিশেষ পটু। অন্ধকার রাত্রিতে কালো রঙের নৌকায় নিঃশব্দে যাতায়াত করে, কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। অন্যদিকে বিদেশি রাজদূতের নৌকা বিশেষরূপে সজ্জিত বলিযা, তাহার গতিবিধি সহজেই জানা যায়। মাঝিরা এক এক দাঁড় লইয়া কত দ্রুত গতিতে যাতায়াত করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। বহুসংখ্যক নৌকার মধ্যে অবাধে চলিয়া যায়, কোনো বিপদ ঘটে না।

আমরা 'সেন মার্কো' নামক স্থানে গেলাম। ইহা একটি চতুষ্কোণ উন্মুক্ত স্থান। ইউরোপে এই স্থানটি অতিশয় বিখ্যাত। এই স্থানে সন্ধ্যার সময় সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়; হাজার হাজার লোক সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া চা, কফি পান করেন ও গল্প করেন। ভেনিস শহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে, প্রতিপদে প্রস্তরস্তম্ভে ঐতিহাসিক কীর্তি দেখা যায়। এই স্থানটির চতুর্দিকেই ঐতিহাসিক চিহ্নে পূর্ণ। একদিকে 'কেম্পেনিল' নামক উচ্চস্তম্ভ। উহা আমাদের মনুমেন্ট অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

অনেক সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। নেপোলিয়ান ভেনিস জয় করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই এই দুর্গম সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন।

সেন মার্কোর চারিদিকে দোকান, এই সকল দোকানে নানারকম মনোহারী দ্রব্য সাজানো। তাহার মধ্যে ভিনিসিয় কাচ জগদ্বিখ্যাত। সেই সকল কাচের দ্রব্যের রঙ কিরূপ সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না, যেন রামধনু খেলিতেছে।

এই সকল দোকানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলাম, প্রাঙ্গণ অসংখ্য পারাবতে পূর্ণ হইতেছে; শুনিলাম রাজকোষ হইতে ইহাদিগকে প্রত্যহ দুই ঘটিকার সময় আহার্য দেওয়া হয়।

বহুশত বৎসর পূর্বে কপোতেব সাহায্যে ভেনিসবাসীরা একবার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই অবধি নগরের অধিবাসীগণ ইহাদের সযত্নে প্রতিপালন করেন। আমরা এই স্থান হইতে সন্নিহিত রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম।

এই রাজবাটীতে বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র, পুরাতনকালের অস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জাদি

এবং পুরাতন পুস্তকাদি সযত্নে রক্ষিত। একস্থানে আমরা ছয়শত বৎসরের অতি পুরাতন একখানি ম্যাপ দেখিলাম। সেই ম্যাপের সহিত আধুনিক ম্যাপের অনেক প্রভেদ। কারণ তখন পৃথিবীর বৃত্তান্ত খুব কমই জানা ছিল। ভূগোল বিবরণ লিখিতে তখনকার ছাত্রদের আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না।

রাজপ্রাসাদের দ্বারে প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি, শহরের অন্যান্য স্থানেও সিংহমূর্তি স্থাপিত আছে। কাহারও নামে বে-নামা দরখাস্ত কিম্বা অন্য অভিযোগ আনিতে হইলে, কাগজে লিখিয়া এই সকল সিংহমূর্তির মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলে তাহা রাজদরবারে পৌঁছিত। এই প্রকারে কত নির্দোষ ব্যক্তি বিনা অপরাধে ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিত তাহার সংখ্যা করা যায় না।

যাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ হইয়াছে, হঠাৎ সে একদিন অদৃশ্য হইত। অন্ধকার রাত্রে গুপ্তচর তাহাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিত, পরদিন গুপ্ত-মন্ত্রণা গৃহে তাহার দণ্ড স্থির হইত। রাজার নামে ১০ জন মন্ত্রীই সমুদয় বিচার করিতেন। আমরা সেই ভীষণ মন্ত্রণা-গৃহ দেখিতে গেলাম। এখানে কত হতভাগ্য যাতনা ভোগ করিয়াছে, মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। আমাদের দেশের নবাবি আমলের নিষ্ঠুরতার কথা অনেক শুনা যায়, কিন্তু ইউরোপে ২/১ শত বৎসর পূর্বে বিচারের নামে কত নৃশংস অত্যাচার হইত, তাহা কল্পনা করা যায় না।

মন্ত্রণা-গৃহটি খালের এক পারে। বন্দিগণ খালের অপর পার হইতে একটি সেতুর উপর দিয়া আনিত হইত, যে হতভাগ্য একবার এই সেতু অতিক্রম করিত তাহার মৃত্যু নিশ্চয়!

সেতু পার হইবার সময় সে শেষবার এই পৃথিবী দেখিয়া লইত। এইজন্য এই সেতু Bridge of Sights বলিয়া অভিহিত।

বন্দিরা মন্ত্রণা-গৃহ হইতে নিকটস্থ কারাগারে নীত হইত, সেই কারাগার যেন সাক্ষাৎ যমপুরী!—মাটির নীচে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। প্রাচীর সংলগ্ন শৃঙ্খলে বন্দি আবদ্ধ থাকিত, কেবল মৃত্যুর আঘাতে সেই শৃঙ্খল ভগ্ন হইত।

আমরা এই স্থান হইতে যখন বাহিরে ফিরিয়া আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। অস্ত প্রায় সূর্যের কিরণে আড্রিয়াটিকের জল ঝকমক করিতেছিল। দূরে সারি সারি নৌকার শ্রেণি। লোকে বিচিত্র বেশে দলে দলে ভেনিসিয়ান গণ্ডোলাতে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছে। কোনো কোনো নৌকা গায়কদলে পূর্ণ, তাহাদের কণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

বিবিধ রচনা

নাদির শা-র শাস্তি

ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতভূমি যে প্রকৃতই রত্নগর্ভা তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ধনধান্যের জন্য আমাদের এই মাতৃভূমি বহুকাল হইতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের প্রলোভনের বস্তু হইয়া যায়। গ্রিক দেশীয় রাজা আলেকজান্ডার হইতে এ পর্যন্ত কত জাতির যে এদিকে লোভ পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। পারস্য দেশীয় রাজা নাদির শা ভারতবর্ষ হইতে কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন শুনিলে আশ্চার্যান্বিত হইবে। তিনি প্রথমে একজন দস্যুর নেতা ছিলেন। পরে দল বৃদ্ধি হইলে ছলে ও কৌশলে পারস্যের রাজাকে হত্যা করিয়া, নিজে পারস্যের সিংহাসনে আরোহন করেন। ক্রমে আফগানিস্থান অধিকার করিয়া ভারতের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। তখন মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকাল; মহম্মদ শা এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের নামমাত্র সম্রাট। এই সময়ে নাদির শা সুযোগ বুঝিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। ১৭৩৯ খিস্টাব্দে তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া কর্ণাল নামক স্থানে মোগলদিগকে পরাস্ত করেন। মহম্মদ শা দেখিলেন নাদির শার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব। বিশেষ নূতন রাজ্য অধিকার করা নাদির শার উদ্দেশ্য নহে, ধন সম্পত্তি লাভই তাঁহার ভারতবর্ষ আগমনের প্রধান কারণ। সুতরাং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নাদির শাকে অনেক উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নাদির শা ইহাতে যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়া অর্থ গ্রহণের জন্য দিল্লিতে আগমন করিলেন। মহম্মদ শা অনেক আড়ম্বরের সহিত নাদির শা-র অভ্যর্থনা করিলেন, নিজ প্রাসাদে তাঁহার জন্য স্থান নিরুপণ করিয়া দিলেন। প্রথম সম্ভাষণের সময়েই মহম্মদ শার পাগড়িস্থিত কোহিনুর নামক জগদ্বিখ্যাত হীরকের প্রতি নাদির শা-র দৃষ্টি পড়িলে, তিনি লোভসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহম্মদ শাকে বলিলেন যে, আমাদের দেশের নিয়মানুসারে আপনার সহিত আমার পাগড়ি বদলাইতে হইবে। অগত্যা মহম্মদ শা বাধ্য হইয়া পাগড়ির সহিত কোহিনুর নাদির শা-কে দিলেন। কয়েকদিন এইরূপে দিল্লিতে যাপন করিলে, এক রাত্রিতে জনরব উঠিল, যে নাদির শার মৃত্যু হইয়াছে। দিল্লিবাসীরা তখন আপদ গেল ভাবিয়া, নাদির শা-র জনকয়েক সৈন্যদের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল, তারপর কি হইল সে ঘটনা বর্ণনা করিতে এখনও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে! নাদির শা উন্মত্ত প্রায় হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে শহরের সমুদয় লোককে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বন্ধু, শিশু, যাহাকে নিকটে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল। নাদির শা নিজে রৌসনউদ্দৌলা নামক একটি লাল প্রস্তরের মসজিদের ওপর বসিয়া রক্ত স্রোতপূর্ণ শহরটি দেখিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০০ লোককে হত্যা করা হইল। তখন মহম্মদ শা আর থাকিতে পারিলেন না, অনন্যোপায় হইয়া ওমরাহদের সঙ্গে লইয়া অবনত মস্তকে নাদির শার নিকট নগরবাসীদের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নাদির শা মহম্মদ শার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ‘কেবল আপনার অনুরোধে আজ

ক্ষমা করিতেছি।' সৈন্যগণ নাদির শার আজ্ঞা পাইয়া ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু ৫৮ দিন পর্যন্ত নগরবাসীদের ধনসম্পত্তি লুঠ করিতে লাগিল। নাদির শা নিজে শাজাহান কর্তৃক নির্মিত বহু মূল্য ময়ূর সিংহাসন গ্রহণ করিলেন, এই সিংহাসনের মূল্য এক কোটি টাকা ছিল। তিনি কেবল দিল্লি হইতে অর্থ ও রত্নাদিতে ৭০ কোটি টাকা লইয়া যান, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে আরও কত কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। নাদির শা দেশে ফিরিয়া গিয়া, সৈন্যদিগকে তিন মাসের বেতন উপহার দেন এবং এক বৎসর কাল প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু পাপের ধন প্রায় প্রায়শ্চিত্তেই যায়। এত লোকের প্রাণ সংহার করিয়া ও সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, নাদির শা অধিকদিন সেই অর্থরাশি ভোগ করিতে পারেন নাই। আর এক ব্যক্তি বলবান হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন ও সেই সমুদয় অর্থ কাড়িয়া লয়।

অদ্ভুত কৌশল

কিছুদিন হইল, আমি আমার কোন বন্ধুর নিকটে যোগফল বাহির করিবার একটি নূতন কৌশল শিখিয়াছি। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ তাহা শিখিতে চাও তবে এস! তুমি এই কাগজে পাশাপাশি যাহা ইচ্ছা ৫টি অঙ্ক লিখ। শেষের একটি যেন ৯ কিম্বা ০ না হয়, কি লিখিলে?

৫২৩৪৩? আচ্ছা, এই দেখ, এখন খুলিও না, শেষে খুলিও।

আর ৫টি অঙ্ক উপরের অঙ্কের নীচে লেখ, কি লিখিলে? ২৪৫০৬? আচ্ছা এখন আমি একলাইন লিখি, ৭৫৪৯৩। তুমি আরও এক লাইন লেখ, কি লিখিলে? ৭২৩৫৬। আচ্ছা, আমিও আর একলাইন লিখি, ২৭৬৪৩। এখন যোগ করে, কি হইল?

	৫	২	৩	৪	৩
	২	৪	৫	০	৬
	৭	৫	৪	৯	৩
	৭	২	৩	৫	৬
	২	৭	৬	৪	৩
২	৫	২	৩	৪	১

২৫২৩৪১? ঠিক তো? এখন তোমার হাতে যে কাগজটি মুড়িয়া দিয়াছিলাম, সেখানি খুলিয়া দেখ তো, তাহাতে কি আছে? ও কি অবাক? উহাতেও ২৫২৩৪১ আছে? দেখো কেমন একলাইন দেখিয়াই আমি আগে যোগফল লিখিয়া দিয়াছি। কেমন করে লিখিলাম জানিতে চাও তো শোনো; ইহার কৌশল বলিতেছি। তুমি যখন ৫২৩৪৩ লিখিলে, আমি তখন একখানি কাগজে এই সংখ্যার আগে ২ বসাইয়া ও শেষ অঙ্ক হইতে ২ বিয়োগ করিয়া যাহা হয়, তাহাই লিখিলাম। তারপর তুমি যখন ২৪৫০৬ লিখিলে, আমি তাহার নীচে ৯ থেকে প্রত্যেক সংখ্যা বাদ যাহা হয়, তাহা লিখিলাম। যেমন ৯ থেকে ২ বাদ ৭ থাকে, ৪ বাদ দিলে ৫ থাকে, ৫ বাদ দিলে ৪, ০ বাদ দিলে ৯ ও ৬ বাদ দিলে ৩ থাকে। তুমি যখন আরও এক লাইন লিখিলে তখন ঠিক আগের মতো ৯ হইতে প্রত্যেক সংখ্যা

বাদ দিয়া আমিও শেষ লাইন লিখিলাম। ইহাতেই একটি ঠিক মিলিল, তুমি নিজে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো, ঠিক হয় কিনা! সঙ্কেতটা কিন্তু আর কাহাকে বলিও না।

বিহারীলাল গুপ্ত

হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হওয়া অতিশয় সম্মান ও গৌরবের বিষয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় তিন মাসের জন্য এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; পরে ইনি যে এই পদে স্থায়ী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিহারীবাবু গৌরিভা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র! ইহার মাতা মহাত্মা রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেনের কন্যা। ইনি মাতামহ গৃহে সুপ্রসিদ্ধ সেন পরিবারের কলুটোলাস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতা পুত্রদিগের চরিত্র ও বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন; পুত্রেরা সকলেই বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া লোকে বিহারীবাবুর মাতাকে রত্নগর্ভা বলিত। বিহারীবাবু মাতামহের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রায় ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতুলালয়ে ছিলেন, এবং মাতুলদের সহিত হেয়ার স্কুলে পাঠারম্ভ করেন।

এই সময় ১০/১২ বৎসর বয়সে সহপাঠী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার সৌহার্দ জন্মে। ইঁহাদের সেই বন্ধুত্ব আজ পর্যন্ত রহিয়াছে।

বাল্যাবধি ইঁহাদের দুইজনের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক, বিলাত গিয়া সিভিলিয়ান হইবার প্রবল আকাঙক্ষা জন্মে। এখনকার দিনে বিলাত যাওয়া যেমন সহজ তখন তেমন ছিল না। এখন কত পিতা-মাতা আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলন্ড প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু তখন বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে বিদ্যা শিক্ষার্থ গমন করিবার সংকল্প করা, দুইটি বালকের পক্ষে সামান্য কথা নহে। এই উচ্চ আকাঙক্ষা পোষণ করিয়া ইনি অনুরাগের সহিত পাঠরত হন এবং এন্ট্রেন্স ও এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। পরে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

ইঁহার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার সহযাত্রী ছিলেন, ইঁহারা তিনজনে এক সময়েই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বাল্যকাল হইতে বিহারীবাবু সাহিত্যানুরাগী; এখনও কঠিন পরিশ্রমের পরে অবসর পাইলেই সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন। সিভিলিয়ানদের মধ্যে এ দেশীয় ভাষা অনুশীলনের উৎসাহ বর্ধনার্থ গভর্নমেন্ট পারিতোষক দিয়া থাকেন। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারো হাজার টাকা পারিতোষিক পান।

বন্দির মুক্তি

আমাদের হাঁসের ঘর হইতে মাসাধিক হইল এক একটি করিয়া হাঁস চুরি হইতেছিল। ছুটিতে বাড়ি আসিবামাত্র আমার প্রতি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার ভার পড়িল।

আমি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, চোরের ইহাতে হাত ছিল না। সন্দেহ হইল, যে ইহা শিয়ালের কর্ম। নিকটে খাল, তাহার দুই পার বনজঙ্গল সমাকীর্ণ। খালের পার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে হাঁসের দুই একটি পালক দেখিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে বালুকার মধ্যে শিয়ালের পদচিহ্নও দেখা গেল। নিশ্চিন্ত জানিবার জন্য আর একটু ঘুরিতেছি, সহসা কাকের কোলাহল শুনিতে পাইলাম, "চোর দিয়া চোর ধরার" কথা তখন মনে পড়িল। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে সকল সন্দেহ ভাঙিয়া গেল। শিয়াল কি একটা মুখে করিয়া খাল পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেটা আর কিছু নহে আমাদের আর একটা হাঁস।

কাক জাতির মতন নির্লজ্জ চোর আর নাই। অন্যে চুরি করিলে চোর চোর বলিয়া রব তুলিয়া সকলের আগে পাড়াশুদ্ধ সতর্ক করিতে যেমন প্রস্তুত, চোরামালে ভাগ বসাইতেও তেমন মজবুত। হাঁস লইয়া বাড়ি যাইবার পথে শিয়াল এই কাকমণ্ডলী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বড় বিপদে পড়িল। হয়তো দৌড়িয়া নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছিতে পারিত, কিন্তু কাকের সঙ্গে -সঙ্গে আমার তাড়া খাইয়া বেচারী সেই সদ্যাহত হাঁসটিকে ফেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

আমাদের হাঁস চুরির কারণ এখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। শিয়ালের বাসাতে শাবক থাকিতে পারে এবং তাহাদের আহারের জন্যই এইরূপ চুরি হইতেছে মনে হইল। শাবকগণ কোন গর্তে বাস করিতেছে, তাহা অন্বেষণ করা আবশ্যক।

সেদিন সন্ধ্যাকালে আমি কুকুর সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই দূরে শিয়ালের ডাক শুনিলাম। আমার কাজ নহে। বন্য বিড়াল বা অন্য হিংস্র জন্তু কুকুর ডাক শুনিবামাত্র চলিয়া গেল, চারিদিক ঘুরিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল।

আবার দূরে সেই ডাক। তখন বুঝিলাম সে শিয়াল আমাদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিকটেই হয়তো কোথাও শিয়ালের বাসা আছে, শৃগাল-দম্পতি আমাকে ভুলাইয়া গর্ত হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য পালা করিয়া ওইরূপ ডাকিতেছে। সেদিন অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সুতরাং বাড়ি ফিরিলাম।

এই শিয়ালটাকে পাড়াতে সকলেই চিনিত। তাহার মুখের মাঝখানে একটা সাদা দাগ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'দাগি' নামে ডাকিত। একবার খরগোস চুরি করিতে গিয়া ফাঁদে পড়িয়া তাহার মুখে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। অনেকদিন পরে শুকাইল বটে কিন্তু মুখের মাঝখানে সে দাগটা জন্মের মতন রহিয়া গেল।

এই দাগি শিয়াল ও তাহার শিয়ালী যে আমাদের হাঁস ধ্বংস করিতেছে। সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। চোর ধরিবার জন্য তার পরদিন ছোট-ছোট গাছের মধ্যে খুঁজিতে-

খুঁজিতে দেখিলাম, কতকগুলি মাটি রাশিকৃত হইয়া রহিয়াছে, কে যেন খুঁড়িয়া রাখিয়াছে। সন্দেহ হইল যে নিকটে নিশ্চয়ই গর্ত আছে। যাঁহারা শিয়ালের গর্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে উহারা সুড়ঙ্গের প্রথম মুখটি বুজাইয়া দেয় ও যাতায়াতের জন্য দূরে গুপ্তস্থানে অন্য একটা মুখ রাখে। খুঁজিতে-খুঁজিতে আমি সেই লুক্কায়িত দ্বারটির অনুসন্ধান পাইলাম ও গর্তের মধ্যে শৃগাল শাবক দেখিতে পাইলাম।

কিছু দুরে একটা পুরাতন বৃক্ষ মাটিতে পড়িয়াছিল, আমরা ছেলেবেলায় ওই গাছটির গায়ে সিঁড়ির ধাপ কাটিয়া তাহার ওপর উঠিয়া অনেকবার খেলা করিয়াছি। ওই গাছটির উপর হইতে গর্তের মুখ দেখা যাইত। আমি লুকাইয়া থাকিয়া সেখান হইতে শিয়াল পরিবারের প্রতিদিনের সংবাদ লইতে লাগিলাম। চারটি ছোট-ছোট ছানা, কখনও বাহিরে আসিয়া খেলা করিত, কখনও বা রৌদ্রের উত্তাপ পোহাইত। বাহিরে কোনরকম শব্দ শুনিবামাত্র মুহূর্তে মধ্যে গর্তে প্রবেশ করিত।

শৃগাল তাহাদের জন্য এক একটি হাঁস চুরি করিয়া বাসার নিকট আসিয়া মৃদু স্বরে ডাকিত, সেই শব্দ শুনিয়া বাচ্চাগুলি তাড়াতাড়ি টলিতে-টলিতে, পড়িতে-পড়িতে বাহিরে আসিত এবং সেই হাঁসের উপর লাফাইয়া পড়িয়া হাঁসটাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিত। মাতা দূরে বসিয়া মহানন্দে তাহা দেখিত। এই জঙ্গলে একটা মস্ত ছুঁচো বাস করিত। দুইটা গাছের গুঁড়ির নীচে তাহার গর্ত, গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে চারিদিক দেখিত, শিয়ালের সাড়া পাইলেই গর্তে ঢুকিয়া পড়িত। ভয়ের কারণ না গেলে আর বাহিরে আসিত না।

একদিন শৃগাল-যুগল স্থির করিল, যে এই ছুঁচোটিকে শিকার করিতে হইবে। তাহারা দুজন আস্তে-আস্তে ছুঁচোর গর্তের দিকে অগ্রসর হইল। শিয়ালী লুকাইয়া রহিল, আর 'দাগি', গাছের নিকট দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল; ছুঁচো দাগিকে দেখিয়াই গর্তে প্রবেশ করিল এবং গর্তের মুখ হইতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ আর বাহির হইল না, এদিকে শিয়ালী পশ্চাৎদিক হইতে লুকাইয়া গুঁড়ির নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ছুঁচো তাহা দেখিতে পায় নাই, দাগিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, যেই ছুঁচো গর্তের বাহিরে আসিল তৎক্ষণাৎ শিয়ালী তাঁহাকে মুখে করিয়া এক আছাড় দিয়া আধমরা করিয়া লইয়া বাসার দিকে দৌড়াইল।

শিয়ালী এত সাবধানে তাহাকে মুখে করিয়াছিল, যে রাস্তাতেই ছুঁচোর সংজ্ঞা লাভ হইতে লাগিল। বাসায় আসিয়া শব্দ করিবামাত্র শাবকগুলি হুড়মুড় করিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই আহত জন্তুটির উপর চারিজনে হুঙ্কার করিয়া পড়িল। ছুঁচোর গায়ে তখনও বল ছিল, সে যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতে একটা ঝোপে প্রবেশ করিল। ছানারা তখন কেহ পা ধরিয়া কেহ লেজ টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, তখন শিয়াল মাতা নিজে গিয়া উহাকে টানিয়া বাহির করিয়া ছানাদের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহারা মনের মতন শিকার পাইয়া মহা আনন্দে ভোগ করিল। শিয়ালের বাসার নিকটেই মাঠে অনেক ইঁদুর ছিল। শিয়ালী ছানাদের ইঁদুর ধরা শিখাইবার নিমিত্ত ওই স্থানে লইয়া গেল। শিখিবার প্রধান নিয়ম, অনুকরণ করা ও সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করা। শিয়ালীর কয়েকটা সঙ্কেত ছিল তাহা দিয়া শাবকদের জানাইত যে "এখন চুপ করিয়া অপেক্ষা করো অথবা এস, আমার মতো চল।"

যেদিন বাতাসে একটি পাতা নড়িত না, এমন দিনে শিয়ালী ইঁদুর ধরিতে যাইত, কারণ ঘন ঘাসের নীচে যখন ইঁদুরগুলি হাঁটিয়া বেড়ায় তখন ঘাস নড়িবামাত্র জানা যায় যে নীচে ইঁদুর বেড়াইতেছে। শিয়ালী নিঃশব্দে ছানাদের লইয়া অপেক্ষা করিত, ঘাস নড়িলেই লাফাইয়া কামড়াইয়া ধরিত। ছানারা বারম্বার মাতার অনুকরণ করিয়া যখন প্রথম ইঁদুর ধরিল, তখন আহ্লাদে তাহাদের সর্বশরীর কম্পিত হইত, তখন তাহারা নিজের বাহাদুরী দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত।

এইরূপে ইঁদুর ধরা বিদ্যা আয়ত্ব হইলে কাঠবিড়ালী শিকার শিক্ষা আরম্ভ হইল।

একটা কাঠবিড়ালী নিকটের গাছ হইতে প্রত্যহ কিচিরমিচির করিয়া শিয়ালের ভর্ৎসনা করিত। ছানাগুলি অনেক সময় তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত পারিয়া উঠে নাই। শিয়ালি তাহাদের অকৃতকার্যতা দেখিয়া গাছের নিকট যাইয়া মরার মতো শুইয়া রহিল, কাঠবিড়ালী প্রত্যেক দিনের ন্যায় আজও হইতে যথাবিধি ভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। কিন্তু আজ আর শিয়ালীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। হঠাৎ শিয়ালের এত ধৈর্য গুণ দেখিয়া কাঠবিড়ালী অবাক হইয়া গাছ হইতে অন্য গাছে উঠিল। এবার সে গালি দিতে দিতে মস্তকে গাছের বাকলও ফেলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই শিয়ালকে রাগাইতে পারিল না, অবশেষে সে আর কৌতূহল সামলাইতে না পারিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য শিয়ালের নিকট যাইবামাত্র মুহূর্ত মধ্যে শিয়াল খপ্‌ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এতদিনে ইহাদের উপর আমার মায়া বসিয়াছিল কাজেই ইহাদের উপর অত্যাচার করিতে আমার মন উঠিল না। আমার দ্বারা কিছু হইতেছে না দেখিয়া মামা একদিন নিজেই কুকুর ও বন্দুক সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন। সেদিন তাহার হস্তে "দাগি" পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু তথাপি হাঁস চুরি থামিল না। আমার মামার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি চারদিকে বিষাক্ত মাংস ছাড়াইয়া রাখিলেন, কিন্তু শিয়ালী ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা টের পাইয়া, তাহা স্পর্শও করিল না। অবশেষে আমার মামা নিজেই গর্তের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। আমি জানিতাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই।

পূর্বে দুইটাতে মিলিয়া কুকুরদের ভুলাইত, এখন সে একা তাহা পারিয়া উঠিল না; সুতরাং, শীঘ্র তাহাদের বাসা প্রকাশ হইল! মামা গর্ত খুঁড়িবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিলেন, কুকুরগুলি চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল। শিয়ালী তখনও ছানাগুলিকে রক্ষা করিবার আশা ত্যাগ করে নাই। কত রকমে কুকুরদের সে স্থান ভুলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; ভাবিল কুকুরদের দূরে লইয়া গেলেই বুঝি শিশু রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে গর্তের মধ্যে ৪টি ছানা বাহির হইল। আমি বাধা দিবার আগেই কুড়ালির আঘাতে একটি ও কুকুরদের মুখে ২টি প্রাণ হারাইল। অন্যটিকে আমি অতি কষ্টে কুকুরের হাত হইতে বাঁচাইলাম। সে সময়ে শিয়াল-মাতার অবস্থা দেখিলে পাষাণ প্রাণও গলিয়া যায়। তাহার ভয় কোথায় গেল! সে কেবল ব্যাকুলভাবে নিকটে ঘুরিতে লাগিল। পরম শত্রু মানুষের নিকট যেন সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। এত নিকটে আসিয়াছিল যে তাহাকে সহজে বধ করা যাইত, কিন্তু পাছে কুকুরের গায়ে গুলি লাগে, এজন্য বন্দুক ব্যবহার করিতে পারা গেল না।

গলায় শিকলি দিয়া ছানাটি উঠানে বাঁধিয়া রাখা হইল। নিকটে একটি কাঠের বাক্স ছিল, মানুষ দেখিলেই সে বাক্সের মধ্যে পলায়ন করিত। কিন্তু যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই সে অস্থির হইয়া পড়িল। অবশেষে কিছুতেই বাঁধন কাটিতে না পারিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে দূরে শিয়ালের ডাক শুনিতে পাইলাম। মুহূর্ত মধ্যে শিয়ালী তাহার ছানার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু লাফাইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। মাতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কঠিন শিকলির বন্ধনে শিশু বাঁধা রহিয়াছে, সুতরাং নিষ্ফল মনোরথ ও নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে দেখিলাম, অবোধ শিশু সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া মাতার স্তন্য পান করিতেছে। আমি সেখানে যাইবামাত্র সে পলায়ন করিল। দেখিলাম, সে সন্তানের জন্য দুইটি মৃত ইঁদুর রাখিয়া গিয়াছে।

পরদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই পুরাতন স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, শোকার্ত মাতা মৃত শিশু তিনটিকে গর্ত হইতে বাহির করিয়াছে ও তাহাদের শরীর লেহন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া পাশাপাশি রাখিয়াছে। সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, যে তাহারা মৃত। তাহাদের আহারার্থে হাঁস মারিয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ তো আর সন্তানের হাঁস লইয়া কাড়াকাড়ি করিল না। মাটির উপরে চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, সে সমস্ত রাত্রি মৃত-সন্তানগুলির পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য ও তাহাদের শীতল দেহ গরম করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। শেষে বুঝিতে পারিয়া, শোকে মৃত্তিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ক্ষুদ্র বন্দিটি মাতার সকল স্নেহের অধিকারী হইল। আমাদের উঠানে কুকুর সমস্ত রাত্রি পাহারাতে নিযুক্ত থাকিত। আমার ও চাকরের প্রতি আদেশ হইল যে শিয়ালীকে দেখিবামাত্র গুলি করিতে হইবে। এই শোকার্ত মাতার দুঃখ স্বচক্ষে দেখিয়া, আমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে তাহাকে দেখিয়াও দেখিব না। আসিবার সমস্ত রাস্তা প্রায় বন্ধ, তথাপি সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া সে প্রত্যহ সন্তানের আহারার্থ কিছু আনিত ও একবার তাহাকে বুকে রাখিয়া গরম করিয়া যাইত। আর সে শিশুর ডাকের অপেক্ষায় থাকিত না।

আর একদিন শিয়ালী পুনরায় শিকলি কাটিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে যখন অকৃতকার্য হইল, তখন গর্ত খুঁড়িয়া শিকলিটি মাটি চাপা দিয়া মনে করিল, এইবার বুঝি বন্ধন ঘুচিয়াছে। কিন্তু ছানা মুখে করিয়া ছুটিবামাত্র ভুল টের পাইল। গলায় ফাঁসি লাগিয়া বাচ্চাটি কাতর স্বরে কাঁদিয়া বাক্সের মধ্যে ফিরিয়া গেল। এইবার কুকুর শিয়ালীকে তাড়া করিয়াছে। কিন্তু যে কুকুর শিয়ালীর পশ্চাৎ ছুটিল তাহাকে আর বাড়িতে ফিরিতে হইল না। আজ শিয়ালী সুযোগ বুঝিয়া সন্তান বধের প্রতিহিংসার উপায় বাহির করিয়াছে। সে ছুটিয়া রেলের লাইনের উপর দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কুকুরও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল। সেসময়ে রেলের গাড়ী আসিয়াছিল, গাড়ি নিকটে আসিলে শিয়ালী হঠাৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কুকুর আপনাকে বক্ষা করিতে পারিল না, গাড়ির চাকার আঘাতে প্রাণ হারাইল।

পরদিন রাত্রে আবার শিয়ালী সন্তানের জন্য হাঁস মারিয়া আনিল, আবার বুকে করিয়া তাঁহার তৃষ্ণা দূর করিল। সে মনে করিত সে ছাড়া সন্তানের ক্ষুধা দূর করিবার আর কেহ নাই। সেই মৃত হাঁসের অবশিষ্টাংশ দেখিয়া আমার মামা বুঝিলেন, যে শিয়ালী এখনও প্রত্যহ সেখানে আসে। তখন তিনি নিজে পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই রাত্রিতে শিয়ালী

হাঁস মুখে করিয়া যেমন উঠানে পা দিবে, এমনসময় গুড়ুম-গুড়ুম্ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া সে হাঁস ফেলিয়া পলাইল। আবার আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া চলিয়া গেল। সকলে ভাবিল, আর সে আসিতে সাহস করিবে না, কিন্তু পরদিন শিকলিতে দাঁতে চিহ্ন দেখিয়া জানিলাম, বন্দুকের শব্দে সে ভীত হয় নাই। সন্তানকে দেখা দিয়া আর একবার তাহার বন্ধন মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। এত সাহস ও এত সন্তান-বৎসলতা দেখিয়া কাহার না মনে দয়ার উদয় হয়? আজও কি সে আসিবে? পূর্ব রাত্রিতে গুলির মুখে পড়িয়া কি সে ভীত হয় নাই? আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শাবকের অস্ফুট ক্রন্দন শুনিলাম ও উঠানে কাল ছায়া দেখিলাম। তবে মা সন্তানকে ত্যাগ করে নাই।

আজ শিয়ালী শিকার করিতে যায় নাই। আজ সে যে করিয়া হউক সন্তানকে মুক্ত করিবেই। সন্তানকে বন্দি দেখিয়া সে কীরূপে নিজে সুখ ভোগ করে? শিকল কাটিতে এতদিন সে বিধিমতো চেষ্টা করিয়াছে, যতরকম উপায় সে জানিত, তাহা প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হয় নাই, শত বিপদ ও বাধা সে তুচ্ছ করিয়াছে, কিন্তু সন্তানকে মুক্ত করিতে পারে নাই। তবে এই বন্ধন মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় আছে, সুতরাং শিয়ালীকে মরিবার জন্য যে বিষাক্ত মাংস ছড়ানো ছিল, আজ সে তাহার এক অংশ মুখে করিয়া সন্তানকে খাইতে দিল। শৃগাল-শাবক চিরদিনের জন্য বন্ধন মুক্ত হইল। সেদিন হইতে শৃগাল-মাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ইতর প্রাণীদের দয়া

আমাদের সাধারণ ধারণা এই, যে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি বুঝি মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার। ইতর প্রাণীদের মধ্যে বুঝি তাহা নাই, তাহারা বুঝি পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। মানুষ এই অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পশুপক্ষীদিগকে অবজ্ঞা করে, এবং এক সঙ্গে এক জগতে বাস করিয়াও তাহাদের সুখ-দুঃখের প্রতি নিতান্ত উদাসীন থাকে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি পশু-পক্ষীদের জীবন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে তাহাদের জীবনও ঠিক মানুষের মতন সুখ ও দুঃখে পূর্ণ। তাহাদের মধ্যেও স্নেহ দয়া আছে, এমন কী পশুপক্ষীদের জীবন হইতে মানুষের অনেক শিখিবার আছে।

পশুপক্ষীদের মধ্যে মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তোমরা অনেক শুনিয়া থাকিবে। সন্তানদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পশুপক্ষী-মাতাও আমাদের জননীর ন্যায় প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। বানরদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে কোনো বানর-শিশু মাতৃহীন হইলে অন্য বানরী তাহাকে অপত্য নির্বিশেষে লালনপালন করে। পক্ষীযুগলের মধ্যে একের মৃত্যুতে অন্যের গভীর শোকের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আজ জন্তুদের মধ্যে বন্ধুত্বের একটি দৃষ্টান্ত দিব। তাহাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থতা দেখা যায়। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, পশুপক্ষীদের মধ্যে বৃদ্ধ ও পীড়িতের জন্য দয়া নাই; কিন্তু বাউটন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এক বন্য টিয়ার অদ্ভুত পরসেবার কথা

বলিয়াছেন। বন্য-টিয়াটি অন্য জাতীয় একটি পঙ্গু ও শীতে মৃতপ্রায় পাখিকে আশ্রয় দিয়া প্রত্যহ তাহার পালকগুলি পরিষ্কার করিয়া দিত, তাহার জন্য খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া আনিত ও তাহাকে অন্য অন্য পাখিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। আর একজন ভদ্রলোক একটি অন্ধ ও বৃদ্ধ পেলিকান পাখিকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে পালের পাখিদের যত্ন ও সেবাতে তাহার দিন ওইরূপে সুখে কাটিতেছিল। সুবিখ্যাত ডারউইন বলেন যে মুরগিদের মধ্যেও তিনি ওইরূপ অন্ধের সেবা করিতে দেখিয়াছেন।

আমাদের দেশে কাকেরাও স্বজাতীয় অন্ধের সেবা ও যত্ন করিয়া থাকে।

আর একজন ইংরাজ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে তিনি আবিসিনিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা একপাল বেবুনের (বানর) মধ্যে পড়েন। তাহারা দল বাঁধিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে মানুষ দেখিয়া দলশুদ্ধ পলায়ন করিলে, কেবল একটি দুর্বল ক্ষুদ্রকায় বেবুন পলাইতে না পারিয়া একটা ক্ষুদ্র পাথরের উপব পড়িয়া রহিল। সেই ইংরাজের কুকুরগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, সে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ওই ভদ্রলোকটি কুকুরের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে যাইবার পূর্বেই পাল হইতে এক বৃহৎ সবল বেবুন আসিয়া কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া সেই ক্ষুদ্রকায় বন্ধুকে পিঠে করিয়া মহা জয়োল্লাস করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই বেবুনের মতন বীরত্ব আমাদের কয়জনের আছে? আমাদের কি ইতর প্রাণী হইতে শিখিবার কিছু নাই। এই তো গেল অপেক্ষাকৃত বড় জন্তুর কথা। ক্ষুদ্র পিপীলিকার মধ্যেও বন্ধুত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একদল পিপীলিকাকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ৩/৪ মাস পরে একস্থানে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের মধ্যে যে বন্ধু সমাগমের আনন্দ হইতেছে, তাহা বুঝা যায়; সুতরাং ৩/৪ মাসেও ইহারা বন্ধুত্ব বিস্মৃত হয় না ইহা প্রমাণ হইল। অপরিচিত হইলে একজাতীয় পিপীলিকার মধ্যে দেখা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে বিরোধী-দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ভুলক্রমে যদি বন্ধুর সহিত বন্ধুর সংঘর্ষণ ঘটে, তবে টের পাওয়ামাত্র পরস্পরের মধ্যে যেন অনুনয়-বিনয় ক্ষমা প্রার্থনা চলিতে থাকে, তাহা দেখিলেই আশ্চর্য হইতে হয়।

রুষিয়া দেশের একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে একটি পিপীলিকা উদর পুরিয়া আহার করিয়া আসিতেছে, পথে তাহার একজন ক্ষুধার্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল; অমনি আপনার কুক্ষিস্থ অতিরিক্ত খাদ্য উগরিয়া তাহাকে আহার করিতে দিল।

সচরাচর যে সকল শামুক দেখিতে পাও, যাহাকে দেখিবামাত্র কত ছেলে পা দিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলে, ওই শামুকদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। একটি সবল, সুস্থ শামুক তাহার দুর্বল নির্জীব বন্ধুর জন্য প্রাচীর পার হইয়া সুখাদ্যপূর্ণ স্থান অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে আসিয়া বন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে; এরূপ দেখা গিয়াছে।

প্রাণীজগতে যাহাদিগকে আমরা ইতর জন্তু বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারাও যে দুর্বলের উপর দয়া ও স্নেহপ্রদর্শন করে, এরূপ ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পাঠক-পাঠিকা! তোমরাও কি তাহাদের নিকট হইতে এই সদ্‌গুণ শিক্ষা করিবে না? প্রতিদিন তোমরা কত শত-শত জন্তু দেখিতে পাও, তাহাদিগকে কি দুর্বল মনে করিয়া দয়া প্রদর্শন করিবে না?

সুরেশদের বাগান

সুরেশদের বাড়িতে একটা বাগান আছে, এবং বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। বাগানটি সুরেশদের ভাইবোনের প্রিয়, তাহারা নিজেরা একটু একটু জমি লইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ফুলগাছ লাগায়, মালিকে দিয়া জল দেওয়ায়, এবং ফুল হইলে কত আমোদ করিয়া তাহা তুলিয়া ঘর সাজায়। সুরেশদের বাড়িতে ফুলের বড় আদর। সে বাড়ির ছেলেরা গাছপালা ও ফুলপাতার মধ্যে লালিতপালিত হওয়ায় সকলেই ফুল বড় ভালোবাসে, সেই বাগানটিতে এমন গাছ, এমন ফুল, এমন প্রাণী ছিল না, যাহাদের আকৃতি প্রকৃতি তাহারা জানিত না, যদিও কোনো দিন একটা কিছু নূতন দেখিবার জিনিস পাইত, অমনি শিশু মহলে কোলাহল পড়িয়া যাইত ও সকলে মিলিয়া তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিত। এইরূপে সেই বাগানটি যেন তাহাদের একখানা পড়িবার গ্রন্থের মতো হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন সমস্তদিন বৃষ্টির পর বৃষ্টি থামিবামাত্র সুরেশ তাহার ছোট ভগিনী বিনোদিনীকে লইয়া পুকুরের কত জল বাড়িল তাহা দেখিবার জন্য বাগানে গেল। গিয়াই দেখে পুকুরের চারিধারে "কোঁ ক্যাঁ কোঁ" ব্যাঙ ডাকিতেছে। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল,—'ব্যাঙেরা এত ডাকছে কেন?' সুরেশ উত্তর দিলেন, 'অনেকদিন পরে বৃষ্টি হয়েছে কি না, তাই ওদের আনন্দ হয়েছে, এবং আবার শীঘ্র জল হবে বলে আনন্দ করছে।'

বিনোদিনী।—ওরা কী করে জানলে যে জল হবে?

সুরেশ।—ওরা জানতে পারে। সেই যে একজন কৃষক একটা ব্যাং পুষেছিল, সে কখন জল হবে তা বলে দিত, তা কি শুনিসনি?

বিনোদিনী।—ওমা! কখন জল হবে ব্যাঙ কি করে তা জানে? দাদা! একটা ব্যাং ধরো না আমি ব্যাঙ দেখ্‌বো।"

সুরেশ দৌড়িয়া বাড়ির ভিতর হইতে একটা চুপড়ি আনিয়া তাহাতে অনেক কষ্টে একটা ব্যাঙ তুলিল। ক্রমে অপরাপর ভাইবোনগুলি আসিয়া জুটিল। সব শিশুতে মিলিয়া ব্যাঙের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

একজন বলিল, "দেখ ভাই, চোখ দুটো দেখ, যেন চশমা পরেছে। সে চশমার ধার যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।" সকলে "তাই বটে, তাই বটে।"

সুরেশ বলিল, 'মাস্টার সেদিন ক্লাসে বলেছেন, যে ব্যাঙের মাথার মধ্যে চক্ষু দুইটি সার, উহাদের মাথার মধ্যে মগজ খুব কম, তাই ব্যাঙগুলি বড় বোকা। আবার দেখো ব্যাঙের ঘাড় একেবারে নাই, মাথা একেবারে পিঠে বসানো।" সেই সময় একটা ছোট মাছি উড়িয়া চুপড়ির মধ্যে বসিবামাত্র ব্যাঙটা জিভ বাহির করিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। একজন বলিয়া উঠিল, 'দেখ ভাই ব্যাঙটা কি চালাক কেমন খপ করে মাছিটা খেয়ে ফেল্‌লে।' বিনোদিনী—'ওমা! মাছি খেয়েছে, তবে বমি করে মরবে।' অপর একটি শিশু বলিল, 'দূর ওকি মানুষ যে মাছি খেয়ে বমি করবে? ওরা যে পোকামাকড় খায়।' ইতিমধ্যে তাহাদের

পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

বিনোদিনী।—'হ্যাঁ বাবা? ব্যাঙটা মাছি খেলে, ওর কি বমি হবে না?'

পিতা হাসিয়া উত্তর করিবেন—কীটপতঙ্গই ওদের খাদ্য। ওইজন্যই তো ওরা আমাদের উপকারী বন্ধু। ব্যাঙ না থাকলে আমরা পোকামাকড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠতাম, আর আমাদের গাছপালা সুদয় নষ্ট হয়ে যেত।

পিতা।—ব্যাঙেরা মানুষের বন্ধু এমনকী ওই যে গাছে ছোট টুনটুনি পাখি দেখছ, ওই যে টিপ টিপ করে ডালে ডালে বেড়াচ্ছে, ওরাও মানুষের বন্ধু।

একটি শিশু।—কেন, ওরা কি কাজ করে?

পিতা!—ওরা মস্ত কাজ করে, কীটপতঙ্গ ধরে খায়, তাহাতে গাছপালা বাঁচে। যারা গোলাপের বাগান করে তারা অনেক সময় গোলাপ গাছের তলায় চাউল, কড়াই প্রভৃতি দেয়, তাহলে পাখি আসে, পাখি এলেই গোলাপ গাছের পোকা খেয়ে ফেলে, তা না হলে পোকাতে গাছ মেরে ফেলে।

দ্বিতীয় শিশু।—ওমা বিধাতার কি সৃষ্টি! তিনি পাখিকে পাঠিয়ে গাছকে বাঁচান!

পিতা।—তা বুঝি জানতে না! একবার ফ্রান্সদেশের ভদ্রলোকের মেয়েদের সখ হল যে, তাঁহারা টুপির ওপরে ছোট ছোট মরা পাখি পরিবেন। এই ফ্যাশানের গুণে দেশের হাজার হাজার ছোট পাখি মারা পড়িতে লাগিল। শেষে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, পোকাতে সব শস্য খেয়ে ফেলছে, ফসল আর হচ্ছে না; তখন আইন করিয়া পাখি মারা নিবারণ করিতে হইল।

তৃতীয় শিশু।—ও বাবা! তবে তো ব্যাঙ কি ছোট পাখি মারা উচিত নয়?

পিতা।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে! আর কেনই বা মারবে? যে উপকার ভিন্ন কোনো অপকার করে না, তাকে অকারণ মারা কি পাপ নয়?

বিনোদিনী।—বাবা, ব্যাঙটা কি চালাকি করে মাছিটা খেয়েছে যদি দেখতে, তাহলে কি বলতে।

পিতা।—ওরা কি করে খায় শুনবে? আমাদের জিহ্বা যেমন মুখের পশ্চাতে বসানো আমরা কেবল সম্মুখে জিহ্বা বাড়াইতে পারি, ইহাদের তেমন নয়, ইহাদের জিহ্বা মুখের সম্মুখে বসানো এবং ইহারা ইচ্ছামতো সম্মুখে ও পশ্চাতে দুদিকেই জিহ্বা বাড়াইতে পারে। পোকা দেখিবামাত্র সামনের দিকে বাড়াইয়া পোকা ধরিয়া একেবারে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া তাহা গিলিয়া ফেলে। চিবাইবার দরকার করে না।

বিনোদিনী।—বাবা, ওরা পুকুরের ধারে কেন থাকে?

পিতা।—ওদের চামড়া স্পঞ্জের মতো সচ্ছিদ্র, সর্বদা জল টানিয়া লইতেছে, শুষ্ক স্থানে থাকিলে সেই চামড়া শুকাইয়া যায় এজন্য উহারা পুকুর বা ডোবার ধারে থাকে। গ্রীষ্মকালে উহাদের গরমে কষ্ট হয়, জল না হইলে বাঁচিতে পারে না।

বিনোদিনী।—আচ্ছা বাবা, ব্যাঙের গা এত ঠান্ডা কেন?

পিতা।—তোমরা হয়তো জান যে, আমরা নিশ্বাস দ্বারা বাতাস শরীরের ভিতর টানিয়া লই বলিয়াই আমাদের গা গরম থাকে। ব্যাঙ সচরাচর জলে বাস করে। অধিক পরিমাণে বাতাস উহাদের শরীরে প্রবেশ করে না, এজন্য উহাদের শরীর শীতল।

বিনোদিনী।—আচ্ছা বাবা, ব্যাঙাচি তো মাছের মতো, তা থেকে ব্যাঙ কি করে?

পিতা।—পাখি ডিম পাড়িয়া তাহার উপর বসিয়া তা দেয়। কিন্তু ব্যাঙের শরীর যে ঠান্ডা, কি করিয়া নিজেরা ডিম ফুটাইবে? কাজেই তাহারা জলের নীচে ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে; ডিমগুলি উপরে ভাসিয়া গাছের পাতা প্রভৃতি আশ্রয় লয় এবং সূর্যের উত্তাপ পাইয়া ফুটে। ব্যাঙাচি দেখিতে আদবেই ব্যাঙের মতো নয়, বরঞ্চ ছোট ছোট মাছের মতন, কেবল মাথা ও লেজ আছে; জল হইতে উঠাইলে মরিয়া যায়। মাছের মতন ব্যাঙাচির কানকো আছে, তাহা দ্বারা নিশ্বাস ফেলে, আমরা যেমন ফুসফুল দ্বারা জলে নিশ্বাস ফেলিতে পারি না, উহারা তেমন কানকো দ্বারা জলের বাহিরে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না।

ব্যাঙাচির মুখও ব্যাঙের মতন সম্মুখে নয়, মাথার নীচে, তাহা দ্বারা ঘাস পাতা খাইয়া বাড়িতে থাকে। ব্যাঙাচি বড় হইয়া ব্যাং হইতে ৪/৬ বা ৮ সপ্তাহ লাগে। দিন-দিন ব্যাঙাচির পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে লেজের নিকট দুইটি গোঁজ বাহির হয়; এই গোঁজ দুইটি যত বাড়ে লেজটি তত শুষ্ক হইতে থাকে, এই গোঁজ দুইটি হইতে যখন পশ্চাতের পা দুটি গঠিত হয়, তখন লেজটি খসিয়া যায়, এদিকে কান্‌কো শুকাইয়া তাহার পরিবর্তে ফুসফুস প্রস্তুত হইতে থাকে। চক্ষু দুটি বড় হয়, সম্মুখেও দুটি পা বাহির হয়। সেই ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে; লেজ খসিয়া তাহার স্থানে পা হইয়াছে; মাথাটি মস্ত হইয়াছে; মুখটি সম্মুখে আসিয়াছে; কান্‌কোর স্থানে ফুসফুস হইয়াছে। এখন সে আর জলে থাকিতে পারে না; এবং জলের ঘাস পাতাতে তাহার আর রুচি হয় না, এখন নিরামিষের পরিবর্তে আমিষ আহারের প্রতিই তাহার লোভ বেশি। কাজেই তাহাকে পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে; তবে সে পুরাতন বাসস্থানকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই; কেই বা পারে?

বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু

জীবিত ও মৃতের প্রভেদ

সজীব ও নির্জীব বস্তুতে কি প্রভেদ জানো? মৃত ও জীবিত জন্তুর মধ্যে কি-কি ভিন্নতা বলিতে পারো? একখানা কাষ্ঠ ও একটি জীবন্ত বৃক্ষে কি পার্থক্য?

জীবন বর্ধনশীল আর মরণ ক্ষয়শীল। মৃত জিনিস কোনদিন বাড়ে না, যার মধ্যে কোনরূপ গতি কি স্পন্দন নাই, তাকে আমরা মৃত বলি। যাহা জীবিত তাহা ক্রমাগত বাড়িতেছে—যাহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায় তাহার ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্যু ক্রমশ নিকটে আইসে।

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে একবার যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যে যাইতে-যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া প্রথমত সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জলাশয়ে পাঠাইয়া দেন। সহদেব অন্বেষণ করিতে করিতে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। এই যক্ষ সেই সরোবর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

পাণ্ডুপুত্র জল আনিতে যাইতেছেন দেখিয়া যক্ষ কহিল অগ্রে আমার কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেও, পরে জল পান করিও। নতুবা জল স্পর্শ করিলেই প্রাণ হারাইবে। পাণ্ডুপুত্র এই কথা শুনিয়া জল পান করিতে যাইয়া যক্ষের শাপে প্রাণ হারাইলেন। এদিকে সহদেব ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির তৎপশ্চাতে নকুল, অর্জুন ও ভীমকে একে একে পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই এক দশা ঘটিল। যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এবং তাহার বাক্য অবহেলাপূর্বক জলস্পর্শ করিয়া একে একে চারিটি ভাই সেই যক্ষের মায়াবলে সরোবরের তীরে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন যক্ষ তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না। জীবিত বস্তু সচরাচর গতিশীল। অণ্ডে জীবন লুক্কায়িত থাকে, অথচ জীবনের লক্ষণ যে গতি ও বৃদ্ধি দেখা যায় না।

বীজে নিদ্রিত জীবন

যেমন অণ্ডে জীবন ঘুমাইয়া থাকে, উত্তাপ পাইলে অণ্ড হইতে জীবশিশু জন্ম লাভ করে। সেইরূপ বীজে বৃক্ষশিশু লুক্কায়িত থাকে, মৃত্তিকা, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজানুতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ

বীজের ওপরে এক কঠিন আবরণ তদ্দ্বারা বৃক্ষশিশু আবৃত থাকে। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ক্ষুদ্র কোনোটা অতি বৃহৎ। বীজের আকার হইতে বৃক্ষের আকার নির্ণয় করা যায় না। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সরিষার অপেক্ষা ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। কে মনে করিতে পারে এই ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড বৃক্ষ লুক্কাইয়া আছে।

কে বীজ বপন করে?

তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে শস্য বপন করিতে দেখিয়াছ। মানুষেরা কেবল বীজ বপন করে এমন নহে। অনেক সময়ে পাখিরা ফল খাইয়া অনেক দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে সমুদ্রের মধ্যে জনমানব শূন্য দ্বীপে বীজ উত্তপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অতি দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমূল ফুল যখন পাকিয়া উঠে তখন এক-একটি বীজ তুলার উপর ভর করিয়া বাতাসে অনেক দূর চলিয়া যায়। এই প্রকারে দিবারাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ বপন হইতেছে।

প্রত্যেকে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না, হয়তো কঠিন প্রস্তরের উপর বীজ পড়িল। সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। কঠিন প্রস্তরে কি করিয়া ক্ষুদ্র শিশু পালিত হইবে। অঙ্কুরোদগমের জন্য উত্তাপ, জল ও মৃত্তিকার আবশ্যক।

বীজের জীবনী শক্তি

যেখানেই পড়ুক না কেন বহুকাল পর্যন্ত বৃক্ষশিশু বীজের মধ্যে নিরাপদে নিদ্রিত থাকে—যতদিন বাড়িবার উপযুক্ত স্থান না পায় ততদিন উপরকার দৃঢ় আবরণ বর্মের ন্যায়

বৃক্ষশিশুকে বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা করে। শুনিতে পাই মিশর দেশে পিরামিডের মধ্যে শস্যের বীজ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রায় ৬০০০ বৎসর পুরাতন। সেই বহু পুরাতন বীজ মাটিতে বপন করিলে পর, তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

"অপার তাহার করুণা"

কী আশ্চর্য কথা। এত সহস্র বৎসর শিশু ঘুমাইয়াছিল। মৃত্তিকা স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। এতদিন কে ইহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। কার প্রাসাদে মৃত্যু আসিয়া ইহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা বলেন একটি ক্ষুদ্র পক্ষী শাবকেও বিধাতার (প্রকৃতির) স্নেহ দৃষ্টির অন্তরালে হয় না। বীজের জীবন একটি পক্ষীর জীবন হইতে অনেক ক্ষুদ্র। পক্ষীরা চেতন, বীজ অচেতন। তবু দেখো বিধাতা (প্রকৃতি) তাহার ঘুমন্ত প্রাণটুকুকে কেমন যত্নে রক্ষা করেন।

ধাত্রী ক্রোড়ে শিশু

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পক্ক হয়। আম, লিচু, প্রভৃতির বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। ধান যব ইত্যাদি শস্য আশ্বিন কার্তিক মাসে পক্ক হয়। মনে কর একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে দু-একদিন প্রচণ্ড ঝড়ে গাছগুলি মূল পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে। তাহার পাতা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন হইয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এই সময়ে বীজগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে? মনে কর একটি বীজ সমস্ত দিনরাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একটি মৃত্তিকা স্তূপের নীচে অথবা একখণ্ড ভগ্ন ইষ্টকের নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল, ক্রমে ক্রমে ধূলি মৃত্তিকা আসিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল—এখন হইতে সে মানুষের চক্ষু হইতে অন্তর্ধান হইল।

মনুষ্য চক্ষুর আড়াল হইল বটে, কিন্তু বিধাতার (প্রকৃতির) চক্ষুর অন্তরালে যায় নাই। পৃথিবী ধাত্রীর ন্যায় তাহাকে ক্রোড়ে লইল। সে মৃত্তিকার আবরণে বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাপাত হইতে রক্ষা পাইল। এখন অদৃশ্য হইয়া বীজটি নিদ্রিত হইয়া রহিল। মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, শীত অবসানে বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দু-একদিন বৃষ্টি হইল। জল স্পর্শে ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহিরের আলোক শিশুকে বলিতেছে "আলোকে আইস উপরে সূর্যকিরণ দেখিবে। আর ঘুমাইও না।" আস্তে আস্তে বীজের বাহিরের আবরণটি খসিয়া পড়িল, দুটি কোমল পাল্লার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে যাইয়া মৃত্তিকা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল। আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া আলো লক্ষ্য করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ক্ষুদ্র মস্তক তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত নূতন রাজ্য উঁকি দিয়া দেখিতেছে।

কুমুদিনীর নিশি জাগরণ

[বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাষণের সারাংশ। জগদীশচন্দ্র বসু ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যুগ্মনামে প্রকাশিত।]

বৈজ্ঞানিকের আগেই কবি আসব লইযাছেন। "ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী"-তে কুমুদিনীর উল্লেখ ও দিবসে "নির্মল উজ্জ্বল" সূর্যকরের প্রভাবে নলিনীর বিকাশ দেখিয়া" কবি গাহিলেন ঃ

"গিরো ময়ূরাঃ গগনে পয়োদাঃ
লক্ষান্তরে ভানুঃ জলে চ পদ্মম্।
ইন্দুদ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু—
র্যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম।।"

কবি এইখানে থামিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও কবির ন্যায় এই বৈচিত্রময় ব্রহ্মাণ্ডে এক মহান ছন্দ এবং বিরাট ঐক্যের সন্ধানে ফিবিতেছেন। তাই বৈজ্ঞানিক মন তমসাবৃত অমানিশায় কুমুদিনীর স্বরূপ দেখিবার ভার লইলেন; প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে প্রিয়সখার আদর্শজনিত কোন চিহ্নই তিনি কুমুদিনীতে দেখিতে পাইলেন না। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন কুমুদবন্ধু আকাশে দেখা দিল আর না দিল প্রতিরাত্রেই কুমুদের সেই একই উন্মেষ—সেই একই উল্লাস; আরও দেখিলেন যে রবিকর স্পর্শমাত্রেই কুমুদিনীর সঙ্কোচ ঘটে না, তাহার সুষুপ্তি আসে সূর্যোদয়ের অনেক পরে।

একখানি ফরাসি অভিধানে কাঁকড়া সম্বন্ধে লেখা ছিল—কাঁকড়া একটি ছোট লাল মাছ যাহা পিছন দিকে চলে। অভিধানকার কাঁকড়ার এই বর্ণনা যথাযথ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ কুভিয়ার-এর নিকট যান; কুভিয়ার শুনিযা বলিলেন—চমৎকার হইয়াছে, শুধু এইটুকু তফাত কাঁকড়া মাত্রেই ছোট নয়, সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহা লাল নয়। ইহা মাছ নয় এবং আর যেদিকে যাউক ইহা পিছনে চলে না, এই যা প্রভেদ, নচেৎ বর্ণনা একেবারে হুবহু হইয়াছে। কবি বর্ণিত কুমুদিনীর প্রণয়েতিহাসও অনেকটা এইরূপই। চন্দ্র না উঠিলেও কুমুদ ফোটে এবং সূর্য উঠিলেই ইহা মুদিয়া যায় না।

"বেলা গেল সন্ধ্যা হল ফুট্‌ল ঝিঙ্গার ফুল" গান শুনিয়া আর এক জাতীয় পুষ্পের বিকাশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গঙ্গার ধারে সিস্‌বেড়িয়ার বাগানে খানিকটা জায়গায় মালি ঝিঙ্গা গাছ দিয়াছিল। সকালের সেই বাগানকে আর অপরাহ্ণে যেন চেনাই যায় না। সূর্যের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য প্রস্ফুটিত ঝিঙ্গাফুল নবরং-এ রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এখানেও ফুলগুলি সমস্ত রাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিয়া সকালবেলা মুদ্রিত হয়।

উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমানো বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়াল মাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এই রূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উলটা করে।

একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকা।
তর্পণে তিল দরকার, সরিষা নাস্তি কি কারণে।।

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকঞ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকার; ঢোল নাস্তি যে কারণে।।

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিয়ত মিলিত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এই কী শেষ কথা থাকিবে? কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে এ বিষয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষার ফল হইতে কি তথ্যে উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক।

টবসুদ্ধ একটা গাছকে কাত করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তো দেখা যায় ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোন গাছে খুব বেশি, কোথাও বা উহা খুব কম।

মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিত আলোক স্পর্শে পাতা উঠাইয়া নামাইয়া নানা রকমে সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কোন গাছে উহারা আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া থাকে। একটি মাদার গাছের পাতার উপর আলো ফেলা হইল, পাতাটি এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়াছিল। আলোক পাইবা মাত্র মন পুলকিত হউক বা যাহাই হউক এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী এইরূপ অবস্থায় যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোকজনিত উত্তেজনা, মাত্র এই দুইটি শক্তি যদি উদ্ভিদের উপর কাজ করিত, তাহা হইলেও উহাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন সংঘটিত করিত। কোথাও একটি শক্তি অপরটির বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে, কোথাও বা তাহারা পরস্পর সহায়তা করিতেছে; এবং প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়ার পরিমাণ কত বিভিন্ন। সুতরাং কোনো উদ্ভিদে এই দুইটি ভিন্ন শক্তির সমবেত ফল দেখিয়াই বলা চলে না। কোন্‌টা কতটুকু কাজ করিতেছে; তজ্জন্য পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃপণ ১৫ টাকা রোজগার করিয়া তাহার মধ্যে ১০, টাকা জমায়; দাতা ১৫০০ টাকা রোজগার করিয়া আবার মাসের শেষে ধার করে; সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখিয়া কোনো গৃহস্থের আয় ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া চলে না; তজ্জন্য তাহার হিসেবের খাতা দেখিতে হইবে।

প্রথমত দেখা যাউক এই পাতা খোলা বা পাতা বন্ধ পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটিতেছে কিনা। একটি অর্ধপ্রস্ফুটিত কুমুদফুল লওয়া হইল; পাপড়িগুলি যদি উপরের দিকে উঠে তো ফুলটি মুদিয়া যাইবে, যদি নীচের দিকে নামে তো উহা আরও খুলিবে; কিন্তু ঠিক বিপরীত হইবে যদি ফুলটিকে মাথা নীচু ও ডালটি উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা যায়; তখন পাপড়িগুলির উপরে উঠার ফলে ফুলটি আরও খুলিয়া যাইবে এবং নীচে

নামিলে ফুলটি বন্ধ হইবে। সুতরাং একটি ফুলকে যদি মাথা নীচু করিয়া রাখা যায় তো যখন তাহার ফুটিবার কথা তখন সে বুজিয়া যাইবে। যখন তাহার মুদিবার কথা তখন সে খুলিয়া যাইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সোজাই দাঁড়াক বা উলটিয়া থাকুক যখন ফুটিবার কথা তখনই কুমুদ ফোটে। তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সুতরাং কুমুদ যে মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় ফোটে না তাহা দেখা গেল। এইবার আলোর ক্রিয়ার ফল অনুসন্ধান করা যাউক।

একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মিত হইল যাহাতে পরীক্ষাকারীব সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার অনুপস্থিতিতেও ফুলের পাপড়ির উঠানামা মিনিটের পর মিনিট ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন স্বতঃই লিপিবদ্ধ হইতে চলিল। দেখা গেল সূর্য উঠিলেই রবিকর স্পর্শে কুমুদিনী মুদ্রিতা হয় না, বেলা ১০/১১ টার পর তাহার পাপড়ি বুজিয়া আসে।

সুতরাং ইহা আলোকের উত্তেজনার ফলেও নয়। ফুলের এই নিজ লিখিত লিপির সাক্ষ্য হইতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় সে উহা সন্ধ্যা ৬টার সময় খুলিতে আরম্ভ করে, এবং রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া যায়। আর বেলা ১০ টার সময় সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। আরও দেখা যায় সন্ধ্যার সময় হইতে তাপমাত্রা যন্ত্রের পারদ বেশি নামিতে থাকে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ তবে কী বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে?

পূর্বের ওই যন্ত্রটির গায়ে আর একটি যন্ত্র লাগাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে ফুলের ওই লিপির পাশে পাশে সমস্ত দিনরাত্রির তাপ পরিবর্তনের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন এইরূপ লিপিসাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। পরে মিলাইয়া দেখা গেল যে দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ এক, মিশাইলে চেনাই যায় না যে দুইটিতে দুইটি বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়; এবং যে কারণে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নোয়ায় এবং প্রাতঃকালে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, সেই একই কারণে সমস্ত পৃথিবীর কুমুদ রাত্রে বিকশিত হইয়া দিবসে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সেই কারণে গঙ্গার ধারে সিস্‌বেড়িয়ার বাগানে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঝিঙ্গাফুলের রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যে দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি রাত্রের শৈত্য বজায় রাখা যায়, তো দিবসেও রাত্রের ন্যায়ও কুমুদ প্রস্ফুটিত থাকে, পক্ষান্তরে রাত্রে যদি উহার চতুর্দিকে দিনের উত্তাপ সমপরিমাণে রাখিতে পারা যায় তো আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইলেও কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিবে না।

কিন্তু একটা কথা, কুমুদিনী যখন বিকশিতা তখন নলিনী মলিনী কেন, আবার কমলিনীর উন্মীলনে কুমুদিনী মুদ্রিতা কেন? বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য কিরূপে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতেছে?

একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে, অথচ প্রত্যেকটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশি বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক আর একদিক অপেক্ষা

বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মতো হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে কি না দেখিবার জন্য, নবনির্মিত ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ যাহা অত্যধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণের দৃষ্টির অতীত, গাছের বৃদ্ধিকে কোটি গুণ পরিবর্ধিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে। সেই ক্রেস্কোগ্রাফে একটি গাছ বসানো হইল; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠান্ডা বরফ জল চারিদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার বরফজল ফেলিয়া গরমজল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল।

বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপড়ি বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশি কমণীয়, সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশি বাড়িবে। ফলে সমস্ত পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে, সুতরাং ফুলটি একেবার মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা কোমল, সুতরাং, এক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে, তবে এবার উলটাদিকে বাঁকিবে, ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে।

সুতরাং, একই উত্তেজনা যে ভিন্ন জাতীয় পুষ্পকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠনবৈচিত্র্যের ফলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে নিম্নতম প্রাণীর সাড়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। জীবমাত্রেই বাহিরের যাবতীয় আঘাতে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ। কেবল উদ্ভিদকে যেদিকে নাড়াও সে সেই দিকেই নড়িবে, যেদিক বাড়িবার সে শুধু সেই দিকেই বাড়িবে। বহির্জগতের আমাদের সাড়া দিবার কোনো ক্ষমতা তাহার নাই। কেবল লজ্জাবতীর ন্যায় কয়েকটি স্পন্দনকারী উদ্ভিদ ভিন্ন, যাবতীয় উদ্ভিদই নীরব নিস্পন্দ এবং এই অস্পন্দনতাই যেন উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম এই কথাই মনে করা হইত। কিন্তু উদ্ভিদকে কত অবস্থা পরম্পরায় মধ্যেই না বাড়িতে হইয়াছে। নিয়ত পরিবর্তনশীল আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য, পৃথিবীর আকর্ষণ ঝঞ্ঝা কতই না তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, কতভাবেই না সে তাহার অন্তর্নিহিত বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু মানবচক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই এমন সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ আপনি আপনার অদৃশ্য বেদনার কাহিনি নিজ হাতে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহা এমন ভাষায় লিখিবে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেবলমাত্র তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হইল যে উদ্ভিদমাত্রেই, না কেবলমাত্র লজ্জাশীলা লতা, বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় অভিভূত হয়। আজ সেই লিপির সাক্ষ্যে আমরা বলিতে পারি যে, এই ভূমণ্ডলে শুধু মানবই যে বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইতেছে তাহা নয়, নীরব উদ্ভিদও সমভাবে উহা অনুভব করিতেছে এবং কত কাল কত যুগ ধরিয়া কত অশ্বত্থ বট কত তাল তমাল সেই আঘাত উত্তেজনার ইতিহাস নিজেদের দেহে বহন করিতেছে।

প্রবাসী ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ

বক্তৃতাবলী

ছাত্রসমাজের প্রতি*

ছাত্রসমাজের সভ্যগণ,

তোমাদের সাদর সম্ভাষণে আমি আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিতেছি। তোমরা আমাকে একান্ত বিজ্ঞ এবং প্রবীণ মনে করিতেছ। বাস্তবপক্ষে যদিও জরা আমার বাহিরের অবয়বকে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি এখনও তোমাদের মতো ছাত্র ও শিক্ষার্থী। এখনও স্কুলে যাইবার পুরাতন গলিতে পৌঁছিলে স্মৃতিদ্বারা অভিভূত হই। আমার শৈশবের শিক্ষক দর্শনে এখনও হৃদয় চিরন্তন ভক্তিপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা শিক্ষার জন্য দীর্ঘতর সময় পাইয়াছি; অনেক ভুল সংশোধন করিতে পারিয়াছি এবং অনেকবার পথ হারাইয়া পরিশেষে গন্তব্য পথের সন্ধান পাইয়াছি। আজ যদি কোনো ভুলচুক কিম্বা দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্রভাষা ব্যবহার করি তবে মনে রাখিও যে সে সব করাঘাত হইতে নিজেকে কোনোদিন বঞ্চিত করি নাই। কুসুমশয্যায় সুপ্ত থাকিবার সময় অতীত হইয়াছে; কণ্টকশয্যাই আমাদিগকে এখন জাগরিত রাখিবে।

এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণির উপদেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ-কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণরূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনোদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যদবাণীর পর তাহাদের নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাক যে দেশে এরূপ দুর্দিন আসিয়াছে তবে কেন বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা কর না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ-কাজ করিলেন, কেন এ-কাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। পরের কর্তব্য কি তাহা নিষ্পত্তি করিবার আমি কে? ' ম কি করিতে পা'রি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।

আবার অন্যদিকে একদল আছেন যাহারা অতীতকালের কথা লইয়া বর্তমান ভুলিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুই অবিদিত ছিল না। আমাদের পূর্ব ঐশ্বর্য যদি এতই মহান তবে আমাদের অধঃপতনের হেতু কি? ইহার প্রতিবিধান কি নাই? আমরা যদি সেই মহান পূর্বপুরুষদের প্রকৃত বংশধর হই তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে পূর্ব গৌরব অধিকার করিতে পারিবই পারিব।

পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ উপলক্ষে আমি দ্বিবিধ জাতীয় চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি। একজাতীয় চরিত্র এই যে, তাঁহারা গতকালের স্মৃতি লইয়া বৃথাগর্বে ভুলিয়া আছেন। পৃথিবী যে স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাহাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্তজাতির

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের সভায় পঠিত অভিভাষণ।

চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইতেছে। ইজিপ্ট আসীরিয়া এবং ব্যাবিলন—ইহাদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কি আছে?

চীনদেশে ভ্রমণকালে সে স্থানের বিখ্যাত কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল। আমি আমার চিনা বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি করিয়া চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন? তখন তাঁহারা বলিলেন, চীনদেশের মতো যে দেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে দেশকে কি সেদিনের জাপান পরাভূত করিতে পারে? বরঞ্চ আমাদের সভ্যতাই জাপানকে পরাস্ত করিবে। এইসব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শীঘ্রই চীনের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হইবে।

অন্যদিকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান পুরাতন কথা বলিয়া সময় অপচয় করিতে চাহেন না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট ব্যস্ত। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে মানবসমাজের নিয়ম আর Law of hydrostatic pressure একই। যে স্থানে pressure বেশি সে স্থান হইতে জলস্রোত অল্প pressure-এর দিকে ধাবিত হয়। জীবনস্রোতও সজীব হইতে নির্জীবের দিকে। পৃথিবীতে সজীব নির্জীবের স্থান অধিকার করিবে।

অথচ সেই জাপানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারতবর্ষীয় ছাত্র সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিদেরও উপরে উচ্চস্থানে অধিকার করিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধির ত্রুটি নাই, তবে এরূপ দুর্দশা কেন।

আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। ইহার মধ্যে ন্যূনকল্পে দশ হাজার ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের চরিত্রে কী কী গুণ তাহা জানি আর কী কী দুর্বলতা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। প্রধানত তাহাদের স্বভাব অতি কোমল, সাধারণত তাহারা নম্রপ্রকৃতি, অতি সহজেই তাহাদের হৃদয় অধিকার করা যায়; এক কথায় তাহারা বড় ভালোমানুষ, একবার পথ দেখাইয়া দিলে অনেকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনার সময় ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত কার্যপরায়ণতা দেখা গিয়াছে। এতগুলি ছেলে কি সুন্দরভাবে নিজেকে organise করিয়াছে। বেশি কথা না বলিয়া অতি সংযতভাবে কি সুন্দররূপে লোকসেবা করিয়াছে। এরূপ শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা, এরূপ ধৈর্য, এরূপ কষ্ট সহিষ্ণুতা, এরূপ অসন্তুষ্টির অভাব সচরাচর দেখা যায় না। আমি যেসব গুণ বর্ণনা করিলাম তাহা পুরুষে প্রায় দেখা যায় না, নারীজাতিই এসব মহৎগুণের অধিকারিণী।

ইহার বিপরীত কেন্দ্রে কোনো কোনো পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। তাঁহাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা একেবারেই নাই, তাঁহারা কিছুই মানিয়া লইতে চাহেন না। তাঁহারা সর্বদাই অসন্তুষ্ট, তাঁহাদের হৃদয় দুর্জয় ক্রোধে পূর্ণ। এইরূপ লোকের জাতীয় জীবনে স্থান কোথায়?

আমি এইরূপ প্রকৃতির একজনকে জানিতাম তিনি চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজের নির্মম বিধানে তাঁহার ক্রোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকিত। আশ্চর্য এই যে ক্রোধ ও মমতা অনেকসময় একাধারেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোমলহৃদয় আর কোথায়

দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি কোনো বিধানই মানিয়া লইতেন না; অসীম শক্তিবলে তিনি একাই সমাজের কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রকার দুর্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ লোক কখনও কখনও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের জীবন নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়, তাহাদের ধৈর্য নাই, তাহাদের সহিষ্ণুতা নাই। দেশব্যাপী রোগের সেবা ও পরিচর্যা? পীড়ারও অন্ত নাই, শুশ্রূষারও অন্ত নাই, এরূপ কতকাল চলিবে? ইহার কি প্রতিবিধান নাই? কি করিয়া ম্যালেরিয়া দেশ হইতে দূর করা যায়? এরূপ জঙ্গল ও ডোবার মধ্যে মানুষ কি করিয়া বাঁচিতে পারে? ইহার প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে।

তাছাড়া আরও শত শত কার্য আছে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার, জ্ঞান প্রচার, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি, দেশবিদেশে ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করা। দুর্বল ভালমানুষের দ্বারা এসব হইবে না, এইসবের জন্য বিক্রমশীল পুরুষের আবশ্যক, তাহাদের পূর্ণ শক্তির আঘাতে সব বাধাবিঘ্ন মিশিয়া যাইবে।

আর যে শক্তির ক্রোড়ে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ও সুপ্তভাবে জীবনযাপন করিয়াছি, জগৎ হইতে সেই শান্তি অপসৃত হইতেছে। শান্তি কোনো জাতির পৈতৃক অথবা চিরসম্পত্তি নহে; বল দ্বারা, শক্তি দ্বারা, জীবন দ্বারা শান্তি আহরণ করিতে এবং রক্ষা করিতে হয়। বলযুক্ত হও, শক্তিমান হও, এবং তোমাদেব শক্তি দেশের সেবায় এবং দুর্বলের সেবায় নিয়োজিত হউক।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দশমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আচার্য বসুর ভাষণ*

স্থান ঃ বসু বিজ্ঞান মন্দির

দশবৎসর পূর্বে মানবজাতির ভাগ্যাকাশ যখন মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল, সেসময় আমি এই বিজ্ঞানমন্দির মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করি। এইরূপ মহাসমস্যার সময়ই মানুষ অসত্যের মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লইতে পারে এবং যাহা চিরন্তন সত্য তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে—তখনই সত্য সাধনার জন্য মন্দির নির্মিত হয়। একক শক্তির পক্ষে যাহা অসম্ভব আমি তাহাই সম্ভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই বিজ্ঞান মন্দির যে নিষ্ঠার স্মৃতি-উৎসব করিতেছে, সে নিষ্ঠার অর্থ এই যে, কেহ যদি কোনো মহৎ কার্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে বদ্ধ দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হইবে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব তাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। প্রাণী এবং অ-প্রাণী সংক্রান্ত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান চেষ্টাই এই বিজ্ঞান মন্দিরেব উদ্দেশ্য। জড় পদার্থের

* বক্তৃতাব পূর্ণ বিবরণ ৩০, ১১, ২৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয। লেখাটি তারই অংশবিশেষ।

মধ্যে যে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং উদ্ভিদজীবন যেরূপ অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার ফলে পদার্থ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ঔষধি-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান এবং মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার গুরুত্ব যে শুধু সিদ্ধান্তাত্বক তাহা নহে, ইহার ব্যবহারিক গুরুত্বও আছে।

যাহারা অনন্য তৎপর হইয়া অহৈতুকী জ্ঞানান্বেষণের জন্য চরিত্র বল ও দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে আমি তাহাদিগকেই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম। জাতিধর্ম, পুং-স্ত্রী নির্বিশেষে চিরকাল সকলের মধ্যে যতদূর সম্ভব জ্ঞান প্রচার এই মন্দিরের আব একটি উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান মন্দিরের স্বল্প স্থানের মধ্যে যতদূর সম্ভব—সকল দেশের কর্মীকে সুযোগ দেওয়ারও আমার ইচ্ছা আছে। বহু শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিয়া নালন্দা এবং তক্ষশীলায় সমবেত হইত, আমি আমার দেশের সেই প্রথারই অনুসরণ করিতেছি।

আমার আশা এই যে এই স্থানে মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হইবে, তাহার ফলে এই কথাটি স্বীকৃত হইবে যে, ভারতের দান ভিন্ন জগতের জ্ঞানভাণ্ডার অসম্পূর্ণ থাকিযা যাইবে। আমি আরো আশা করিয়াছিলাম যে, এই বিজ্ঞান মন্দিরের শিক্ষা এবং সাফল্য এদেশের লোকের মধ্যে যে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করিবে এবং তাহার দেশের নিহীত সম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগাইতে পারিবে।

প্রাণী ও অ-প্রাণী

সত্যের অনুসরণ করিতে করিতে আমি অজ্ঞাতসারে জড়বিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞানেব সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছাই। আমি সবিস্ময়ে দেখিতে পাই যে, জড় ও চৈতন্যের সীমারেখা ক্রমশ লোপ পাইতেছে। জড়মাত্রই অচেতন নহে। চতুর্দিকে শক্তির খেলা দেখিয়া জড়ও সাড়া দেয়। ধাতব পদার্থ, উদ্ভিদ এবং জীব সকলেই যেন একই নিয়মের অধীন। সকলেই ক্লান্তি ও অবসাদের পরিচয় দেয়, জীবনের পরিচয় দেয়, আবার মৃত্যুর মতো অসাড়তার লক্ষণও তাহারা প্রকাশ করে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে একথা ঘোষণা করা হয়। এই আবিষ্কারের পূর্ণ মুল্য বুঝিতে দীর্ঘ ২৭ বৎসর সময়ের আবশ্যক হইয়াছে। এবৎসর আমেরিকায় রাসায়নিকদের মহাসভায় ঠিক-ঠিক আমার কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া সভাপতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, অ-জৈব ও জৈব জগতে যেমন কোনও পার্থক্য নাই, তেমনি প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যেও কোনো পার্থক্য নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে।

অঙ্গসঞ্চালনই প্রাণের লক্ষণ। অজৈব পদার্থও এই সচলতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই দেখুন একটি পুকুর। ওপরে শেওলা ভাসিতেছে। জলের মধ্যে অজৈব পদার্থের জীব জড়াইয়া দিলাম, দেখুন তাহারা প্রাণীর মতো কেমন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমি জলের উপরিভাগ জমাইয়া দিতেছি, দেখুন ভাসমান বরফ দেখা যাইতেছে। বরফের হ্রদে এই বীজগুলির চলচ্ছক্তি রুদ্ধ হইয়াছে।

খণ্ডসত্য সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণ কখনও সন্তুষ্ট থাকে না। একটা তথ্য আবিষ্কার

করিলেই সে নিশ্চিন্ত হয় না। অমনি তাহার মনে প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বসৃষ্টির সহিত এই ব্যাপারের কি সম্পর্ক? আপাতদৃষ্টিতে পারস্পরিক বিরোধী সত্যগুলির সংযোগসূত্র কোথায় তাহার সন্ধানে সে ব্যস্ত হয়। বহু কষ্টে সে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে সে সমস্ত একত্র করিয়া সে বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী

জড় ও সুব্যক্ত প্রাণী জগতের অন্তরালে রহিয়াছে, অব্যক্তপ্রাণ উদ্ভিদের রাজ্য। সকলের জন্যই একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে; কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মতোই কি তাহাদের প্রাণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? বিশেষজ্ঞগণ সকলেই বলেন যে, উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া একটু স্বতন্ত্র রকমের। প্রাণীদেহের তন্ত্রীগুলির সংকোচ, প্রসারণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ উদ্ভিদ নাকি আঘাতে সাড়া দেয় না, তাহাদের নাকি কোন স্পন্দমান তন্ত্রী নাই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণাই উদ্ভিদ জীবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রয়াল সোসাইটির সম্মুখে আমি দেখাই যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের আঘাতে সকল উদ্ভিদই সাড়া দেয় এবং তাহা হইতেই উদ্ভিদের অস্তিত্বের প্রাণ প্রমাণ হয়; কিন্তু সে সময় আমাব উক্তি প্রচলিত মতবাদের বিরোধী ছিল বলিয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়।

নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রচলিত মতবাদকে অস্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই,—যিনি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তিনি তাহা জানেন; সুতরাং আমি আশা করি নাই যে, আমার মতবাদ জীবিতকালেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। কিন্তু যে প্রাণশক্তি একটা জাতিব ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে, সে শক্তির ইচ্ছা অন্যরূপ। যে মহাশক্তি আমাকে আমার চেষ্টায় নিরত রাখিয়াছে এবং যাহার ফলে আমি সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমি সেই মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতেছি।

আমার আবিষ্কারের ফল এতকাল প্রচলিত মতবাদের এত বিরোধী যে, আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি ঠিক কিনা, তৎসম্বন্ধে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বসন্তকালে "টাইমস্" পত্রিকায় এক বিতর্ক উপস্থিত হয়। রয়াল সোসাইটির কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি আমার যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করেন। খ্যাতনামা পদার্থবিদ স্যার উইলিয়াম এবং খ্যাতনামা শরীরতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম বেলিস এই কমিটিতে ছিলেন। তাঁহারা রিপোর্ট করেন যে, আমার "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্র উদ্ভিদের সাড়ার লক্ষণ এক কোটিগুণ বড় করিয়া দেখাইতে সমর্থ, ইহা তাঁহারা নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের শ্রোতারা আমাব আবিষ্কারের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা আপনাদের স্মরণ আছে।

নিম্নলিখিত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ খ্যাতনামা—বার্লিনের হাবারল্যান্ডে, ভিয়েনার মলিশ, প্রাগের প্রিগসিম এবং নেমেক, জেনেভার সোদাৎ, প্যারিসের মাঙ্গিন, রাশিয়ার টিমিরিয়াজেফ এবং ইংলন্ডেব ভাইন্‌স। আমার আবিষ্কারের ফলে প্রাণ রহস্যের যে, নূতন দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে তাহা ইহারা সকলেই স্বীকার করেন। ইংলন্ডের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এবং

চিন্তাশীলগণ ভারত সরকারের নিকট একখানা আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন যে জ্ঞান প্রচারে ভারতের যে গৌরব ছিল সেই গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এই বিজ্ঞান মন্দিরের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।...

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ

[ভাষণটি ইং ১৯২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখের। পরদিন ২২.১২.১৯২৫ তারিখে ভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নীচের ভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণের অংশবিশেষ। ১৯২৫ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি সুন্দর চিঠি লেখেন জগদীশচন্দ্রকে। চিঠিটি হল।]

Lucknow 1925
16th November,

Dear Sir Jagadish,

It seems an age since you visited the Hindu University. I write to day to request you to be good enough to repeat your visit and to deliver the Convocation address at the next Convocation which will be held on the 19th proximo. I hope you will accept the invitation. I need hardly say that we shall all be grateful for it. I hope the date will suit you. Kindly favour me with a reply by wire or letter at the "Benares Hindu University," where I hope to reach after two days. Kindly convey my invitation to Lady Bose also. I hope she too will come. I hope you are both quite well. Looking forward to the pleasure of meeting you.

Dr. Sir Jagadish Chandra Bose
Calcutta, F.R.S.

Yours Sincerely
S/d M. M. Malaviya

[১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশী-হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন উপলক্ষেও আচার্য জগদীশচন্দ্র ভাষণ দেন।]

......বীজাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক বীজাণুর একদিন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অঙ্কুর যেমন একদিকে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবার জন্য মাটির বুক চিরিয়া মূল প্রবেশ করাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি সে আলোকের সন্ধানে মাথা তুলিয়া আকাশের

দিকে ধাবিত হয়—পত্রমণ্ডিত শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়।

সর্বপ্রকার সংগ্রামে জয়ী হইবার এই শক্তি বৃক্ষ কোথা হইতে পায়? তাহার জন্মস্থান হইতে; পরিবর্তন বোধ ও তৎসঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায়—তাহার জন্মস্মৃতি হইতেই সে এক ক্ষমতা পায়। ওই স্থান এবং স্থানীয় যাহা কিছু তাহা হইতেই সে জীবনীশক্তি পায়। এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে হতভাগ্য, বিদেশি চিন্তাধারায় এবং বিদেশি পন্থায় পরিবর্ধিত হয় তাহার চরমগতি কোথায়? মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। ধ্বংসই তাহার একমাত্র পরিণতি।

আমাদের জাতীয় জীবনে এইরূপ কোনো শক্তি আছে কিনা, যদ্দ্বারা আমরা সর্বদাই নবীন জীবন লাভ করিতে পারি? আমাদের অতীত কি কেবল স্মৃতিতেই পর্যবসিত হইবে, না আমাদের নবীন জীবন সঞ্চারের শক্তিস্বরূপ হইবে? অতীতের এই নিহিত শক্তি যে জাগরূগ আছে, তাহার প্রমাণ বিদ্যার এই প্রাচীন পীঠস্থানে চারহাজার বৎসর ধরিয়া অবিরত বিদ্যার চর্চা হইয়া আসিতেছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এমন একটা নিহিত শক্তি আছে, যাহা কালের সর্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সভ্যতা অসংখ্য পরিবর্তন সহ্য করিয়া আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে সভ্যতা মিশরের, অ্যাসিরিয়ার এবং ব্যাবিলনের সভ্যতার উত্থানপতন দেখিয়া আজও বাঁচিয়া আছে, যে সভ্যতা অতীতের সেই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যতের দিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই সভ্যতার মধ্যে এই শক্তি নিশ্চয়ই নিহিত আছে।

এই চিন্তায়ই যেন আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ না করি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে। আমাদের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা অতীতের বিপদ হইতেও কঠোরতর। অতীতে আমাদের কি শক্তি ছিল এবং বর্তমানে কেন আমরা সে শক্তি হারাইলাম, তাহা আমাদিকে জানিতে হইবে।

বিদ্যার অনুসরণ

সমালোচকগণের মতে স্থায়ী জ্ঞান প্রসারে ভারত অপটু। তাঁহারা বলেন যে যেখানে শাস্ত্রের আদেশ মুক্তির ওপরে প্রভুত্ব করে, যে দেশ আয়তনে এত বৃহৎ এবং বহুধা বিভক্ত তথায় সত্য-জ্ঞানের প্রচার সম্ভব নহে। অপর পক্ষ আবার ঠিক ইহার উলটা কথা বলেন। কাহার কথা ঠিক? পশ্চিমে দ্বারকা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পুরী এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম হইতে উত্তরে কেদারনাথ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ভূভাগ ভ্রমণ করিবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন্ শক্তি এই দেশকে সংযত রাখিয়াছিল।

প্রাচীন আদর্শ

শাস্ত্রের গোঁড়ামির মতো বিদ্যার প্রসারের প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই। সকলেই জানেন যে, গ্যালিলিওকে বাধ্য হইয়া স্বমত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কয়েকমাস মাত্র পূর্বে উন্নতিশীল আমেরিকায় অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করায় এক ব্যক্তির সাজা হইয়াছে।

ধর্মের একদেশদর্শিতা ভারতের বিদ্যানুশীলনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি না? সকলেই জানেন যে, এখানে দুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দুইটি চিন্তাধারা

দুই পথে ধাবিত হইয়াছিল—একটি ভক্তির, বিশ্বাসের পথ—আর একটি জ্ঞানের মুক্তির পথ। কাহারও মতবাদের জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা হইত না। এই দেশের লোক মনে করিত যে, যিনি সৃষ্টির নিত্য নূতন রহস্যে আমাদিগকে সমাবৃত রাখিয়াছেন—যিনি ধূলিকণার পরমাণুর মধ্যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিহিত করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা দিয়া রাখিয়াছেন।

পুরাকালে চার বিদ্যার প্রতীকস্বরূপ এই বিদ্যাপীঠে চারটি প্রদীপ রাখা হইত, অতি দূর স্থান হইতে আসিযাও যদি কেহ এই স্থানেব পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাজিত করিতে পারিতেন, তবে এই প্রদীপ নির্বাপিত করা হইত। আবার বিজয়ীকে পরাজিত করিতে পারিলে তবে এই প্রদীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হইত। স্বাধীন চিন্তার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে?

জ্ঞানের অনুশীলন কোনো বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে তক্ষশিলায়, উত্তরে নালন্দায় এবং দক্ষিণে কাঞ্চীপুরে বহু শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্বলিত ছিল। জ্ঞানপ্রচারেও কোনপ্রকার ভৌগোলিক বাধা ছিল না। আচার্য শঙ্কর তর্কসংগ্রামে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি দেশকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। কয়েকখানি মাত্র তালপাতার পুঁথি সম্বল করিয়া বঙ্গদেশ হইতে মনীষীগণ দুর্লঙঘ্য হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চিন এবং সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞান প্রচারে গমন করিয়াছিলেন। প্রেম এবং সেবার আকাঙক্ষাই তাঁহাদিগকে এই কার্যে অনুপ্রেরিত করিযাছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভারতীয় সভ্যতা কত বিভিন্ন জাতিকে তাহার দেহে লীন করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই সম্মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে।

আমাদের অধঃপতন

যদি আমরা কেবলমাত্র অতীতের স্মৃতি লইয়াই বসিয়া থাকি, তবে নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আমাদিগকে ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হইবে। অবিরত কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমাদের পূর্ব-পিতৃগণ সর্বদেশী ছিলেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারি না। তাঁহারা কত যুগ-যুগান্তবের অবিরত চেষ্টার দ্বারা বিদ্যামন্দির গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি? বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফল আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কতকাল যে অতীত হইয়াছে আমরা তাহার ধারণাও করিতে পারি না। জ্ঞানের এই উৎকর্ষের পরও তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ যদি সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বেদকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে—এতটা মহত্ব তাহাদের ছিল। তাঁহারা সর্বদাই জড় জগতে অজ্ঞাত কারণরাশির অনুসন্ধান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের ছিল প্রকৃত সন্ন্যাসীর তেজ। জ্ঞানের অনুসরণে এই তেজের দ্বারা তাঁহারা শারীর বৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারিতেন। অভীষ্টকে তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হইতেন না—পার্থিব প্রলোভন কখনও তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিরোধ করিতে পারিত না।

আজ সেই তেজেব অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের জীবনে আজ যে অবসাদ আসিয়াছে। মৃত্যুর অগ্রদূত সেই অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমাদিগকে নবজীবন লাভ করিতেই হইবে। এই সঞ্জীবনী শক্তি আমাদিগকে আমাদের মধ্য হইতেই পাইতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে সেই জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

বর্তমান যুগসিন্ধুতে ভারতের দান

জ্ঞান কোনো জাতি বিশেষের সম্পত্তি নহে। অতীতে ভারত জগতের সমৃদ্ধিবর্ধন করিতে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দেয় দান করিয়াছে। সেই শক্তি কি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে? বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের কথাই ধরা হউক। বৃহৎ আবিষ্কারের জন্য জ্বলন্ত অন্তর্দৃষ্টি, আবিষ্কারের ক্ষমতা এবং বিশেষ হস্ত কৌশলের আবশ্যক হয়। উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানে কোনো বিশেষ ফল হয় না। আবার অবাধ কল্পনা বাজে কল্পনার সৃষ্টি করে। খাঁটি অনুসন্ধানকারীকে নিজের চিন্তাধারাকে বাহ্য জগতের সত্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। সত্যের কষ্টি পাথরে তাহার কল্পনার পরখ করিয়া লইতে হয়, ভুল হইলেই নির্দয়ভাবে সেই কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই আত্মসংবরণের পথে তাহাকে এক বিস্ময়কর জগতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। দৃশ্যমান আলোক যখন শেষ হয়, তখনও তাহাকে অদৃশ্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে হয়। যেখানে কিছু শোনা যায় না, সেখানে তাহাকে অশ্রুত-ধ্বনির অনুসরণ করিতে হয়। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় প্রতিহত না হইয়া তখন সে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার করে।

আমাদের বিপদ

দেশের সম্মুখে দুইটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। প্রথম বিপদ বিদেশীর পীড়ন এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি। শান্তি ছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব নহে। যদি বিদ্যার্থীরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেনাদলে ভরতি না হয়, তবে নাগরিক হিসাবে তাহাদের প্রাথমিক কর্তব্যে ত্রুটি হইবে। কঠোরতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা শিক্ষা করা তাহাদের কর্তব্য; কারণ কেবলমাত্র তদ্দারাই তাহারা মনুষ্যত্ব (মানুষ অমরত্ব) লাভ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় বিপদ আরও সমূহ এবং সর্বত্র প্রসারিত। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমন বেকার সমস্যা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে অশান্তি একটু বেশি, এইমাত্র পার্থক্য। শান্তির সময়ে যাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, ক্ষুধার তাড়নায় হতাশ হইয়া লোকে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে, আমাদের দেশে এত খনিজ ধনরত্ন নিহিত থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে যে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, ইহা অতীব শোচনীয়। অনবরত এই মিথ্যা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বৃহৎ আবিষ্কার করিতে আমরা সক্ষম নহি। এই অপবাদ ফলেই কেহ খনিজ কারখানার কার্যে উদ্যোগী হইতে সাহসী হয় নাই। এই অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজকাল এমন সমস্ত যুবক আছে, যাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত শিক্ষাগারে শিক্ষাদান করিলে তাহারা সমোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মত আমাদের কর্তব্য উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী না হওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বিদ্যাচর্চার প্রসারের পরিচায়ক, কিন্তু ইহাতে বিপদও আছে। প্রথম হইতেই এই বিপদ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। জ্ঞান প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য না হইয়া সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধ ইহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, ফলে বিদ্যাপীঠসমূহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

মধ্যে মৈত্রী থাকা কর্তব্য! প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দান করিতে পারেন। অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুবিধা থাকা কর্তব্য।

বিদ্যার্থীদের প্রতি

আমি চিরকালই বিদ্যার্থী। বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমি দুঃসাধ্য কার্যের অনুসরণে যুবকের মতো বল পাই। জীবিকা হিসাবে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ করি নাই, সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। সমগ্র ভারতের ছাত্র সম্প্রদায় আমাকে তাহাদের সুহৃদ, পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করে, এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে। প্রতিদানে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাভিন্ন আর কিছু দেওয়ার নাই। আমি তোমাদের দুর্বলতার কথা বলিব না; আমি তোমাদের শক্তির উদ্বোধন করিতে চাহি, সুতরাং যাহা সহজ, আমি তাহা তোমাদের উপস্থিত করিব না, যাহা কঠিন, তাহাই তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সর্বতোভাবে উপদেশ দিব। তোমাদিগের উত্তরাধিকার তোমাদিগকে সাহায্য করুক, কিন্তু তোমরা অতীতের দাস না হইয়া পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞানরাশির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হও।

নানাপ্রকার আশঙ্কা তোমাদের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। বিদ্যায়তনে যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে অনেকেই পীড়ন বলিয়া মনে করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা করিতেছে। তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, সেই নিরোধ করিবার শক্তিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎশক্তি। তোমাদের জীবনের এই সময়েই তোমাদিগকে এই নিরোধ শক্তি লাভ করিতে হইবে।

স্বাধীন চিন্তাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কি কোথাও আছে? বহু বৎসরের আত্মনিয়োগের ফলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার শক্তি লাভ করিবে। পোশাক পরিচ্ছদ নহে—বিপদের ঘাত—প্রতিঘাতই তোমাদিগের দেহকে শক্ত করিয়া তুলিবে। বৃথা কথা বলিয়া শক্তির অপচয় করিও না। অপরকে উপদেশ দিতে যাইও না, নিজের উপদেশ নিজে পালন করিও। যে দুর্বল সকলের সহিত সংগ্রামে যোগ দেয় না, সে কিছু পায়ও না, তাহার দিবারও কিছু নাই। জীবনে যে সংগ্রাম করিয়াছে এবং জয়ী হইয়াছে, সেই তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধশালী করিতে পারে, এই বীরভূমি ভারতবর্ষে অতীতকালে কর্মেরই প্রশংসা করা হইত, নিস্ক্রীয়তার নহে। এমনকি ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সকলের জন্য যে সুখ আমরা দিতে পারি না, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। দেশের আহ্বান যখন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না—ব্যক্তিগত মুক্তি পর্যন্ত কামনা করিতে পারি না।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ

৩ নভেম্বর ১৯২৭ (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

[এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রলাল শীল জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান।]

University of Mysore
Seal
RAJATANTRA PRAVINA

Dr. B. N. Seal
Vice-Chancellor

Mysore
Dated The 2nd Oct, 1927

My Dear Sir Jagadish,

I have very great pleasure in conveying to you the invitation of His Highness the Chancellor of the University to deliver the Address at the next convocation to be held at Mysore on the 3rd November. The University will feel it a great honour if you kindly accept the invitation.

I need hardly add that the accepting the invitation you will be conferring a personal obligation upon me. For "auld long Syne," do kindly consent.

Yours Sincerely
Brajendra Nath Seal

আপনাদের সানুগ্রহে আমন্ত্রণ পাইয়া আমি নূতন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমনি ভারতবর্ষে সারস্বত সমাজের মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে। মহাদেশের প্রাচীন বিদ্যার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি গত ৩৪ বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তৎপ্রতি আপনাদের সহানুভূতিবশতই বোধ হয় আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই সমাবর্তন সংস্কারে অভিভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি বহু পূর্বে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলাম—বৃত্তি হিসেবে নহে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পরও যাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই, সে সমস্ত যুবকদিগকে পরিচালিত করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করাকে জীবনের ব্রত করা অপেক্ষা মহত্তর কিছু ধারণা আমি করিতে পারি নাই।

আমার সম্মুখে আমি তরুণ ছাত্রদিগকে দেখিতেছি, তাহারা কঠোর জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে যাইতেছে। জীবনে যখন নৈরাশ্য আসিবে তখন কোন্ আদর্শ তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিবে? আজিকার দিনে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য যুবক শক্তির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক দাবির আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং আজ আমি তোমাদের দৌর্বল্যের কথা বলিব না, আমি আজ তোমাদের শক্তির উদ্বোধন করিব—যাহা সর্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য সে আদর্শ আজ আমি তোমাদের সম্মুখে ধরিব। তোমরা সত্যান্বেষী—সত্যের সন্ধান করিতে হইলে তোমাদিগকে যে কঠোরতার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, সেই কঠোরতর কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। এই কঠোরতা সহ্য করিতে অতীত তোমাদিগকে সাহায্য করিবে—আমি তোমাদিগকে অতীতের দাস হইতে বলিতেছি না, আমি বলিতেছি,—তোমাদিগকে অতীত জ্ঞান গরিমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে।

আমার জীবনযাত্রার প্রারম্ভে আমি প্রায়ই শুনিতাম যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন দার্শনিকের দেশ, এজন্যই ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব সে গৌরবও লোপ পাইয়াছে। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে। এ সমস্ত কথায় আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার ভ্রান্তি কি করিয়া দূর হইল, বিরাট বিঘ্ন অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় আমি কোথা হইতে পাইলাম। আমার উত্তর এই যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক, ব্যর্থতাই আমাকে আবশ্যক উৎসাহ দিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার উৎসাহের চির উৎস।

আমার বিশ্বাস এই যে, যাহা আমাদের সভ্যতায় স্বত সংশ্লিষ্ট নহে আমাদের জাতীয় জাগরণের উপযুক্ত শক্তি আমরা তাহা হইতে পাইতে পারি না। এই মহাসত্যের গুরুত্ব বলিয়া শেষ করা যায় না।

যাহা অসম্ভব বা যাহা শুধু অন্য দেশেই সম্ভব, সে সমস্ত বিষয়ের কথা আজ তোমাদিগকে শুনাইব না। ভারতবর্ষ যাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। তোমাদিগকে যে সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও সেই সমস্ত বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তোমরা যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে তখন তোমরা এই কথাটি স্মরণ রাখিও যে, বহু বর্ষ অধ্যবসায় সহকারে বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার পূর্বে আমি আশার ক্ষীণ আলোকরেখাও দেখিতে পাই নাই। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট পরাজয় স্বীকার করায় মনুষ্যত্ব নাই, অসীম সাহসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাজিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমি জানি যে, পূর্বে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা হইবে, অতীতকে শুধু স্বপ্নের স্মৃতি বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

আমি বলিয়াছি যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক। বহু বর্ষ অবিরত সত্যান্বেষণের ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই জ্ঞান বলেই আমি, কঠোর বৈজ্ঞানিক উপায়ের মধ্য দিয়া এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সর্বপ্রকার প্রাণের ধারা একই প্রকার। প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কিভাবে হয় তাহার রহস্য আমি ভেদ করিয়াছি, সে কথা আমি তোমাদিগকে বলিব।

উদ্ভিদের প্রাণ

বৃক্ষকে অগণিত ব্যষ্টি সমষ্টি লইয়া গঠিত একটি রাষ্ট্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমষ্টির কল্যাণের জন্য এই ব্যষ্টিগুলির বিভিন্ন অঙ্গ এক একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোথাও অসামঞ্জস্য ঘটিলেই বৃক্ষরাষ্ট্রের অনিষ্ট হয়। বৃক্ষটি স্বীয় ভূমিতে দৃঢ় মূল থাকে বলিয়াই বাঁচিয়া থাকে, ভূমি হইতেই সে নিজের পুষ্টি ও সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উপযোগী শক্তি সংগ্রহ করে। বাহিরের আঘাত তাহাকে কখনও পরাজিত করিতে পারে না, তাহাতে তাহার ভিতরের সুপ্ত শক্তিই জাগ্রত হয়। বাহিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার নিজের শক্তি নূতন করিয়া গুছাইয়া লয়। অধিকন্তু তাহার জন্মভূমি হইতেও সে শক্তি লাভ করে। বীজাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্কুর কোষের মধ্যে মহাবটের ভবিষ্যৎ নিহীত রহিয়াছে। এই শক্তি বৃক্ষ কোথা হইতে পায়? এই শক্তি সে পায় তাহার জন্মভূমি হইতে, অবস্থানুসারে পরিবর্তনশীলতা হইতে এবং অতীতের স্মৃতি হইতে। এই যে প্রাণের মহাশক্তি, ইহা জন্মভূমি এবং জন্মস্মৃতিরই দান। যে হতভাগ্য এই জন্মভূমি ও জন্মস্মৃতির কথা বিস্মৃত হইয়া ভিন্নরূপে চিন্তা ও জীবনধারার মধ্যে বর্ধিত হইতে চাহে তাহার গতি কি? প্রতিপদে মৃত্যু তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, ধ্বংসই তাহার অনিবার্য পরিণতি।

সুতরাং ভারতবর্ষে যদি কোনো স্থায়ী কল্যাণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতার মধ্যে যাহা নিজস্ব তাহাই জাগ্রত করিতে হইবে। এই জাগৃতির ফলে একটা মহাশক্তি বন্ধনমুক্ত হইবে এবং ভারতে মহাজাগরণ আনয়ন করিবে। এই জাগরণের শক্তি আমাদের মধ্যে, উদ্বুদ্ধ জাতির মধ্যে সে শক্তির পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞানের গরিমা এবং জ্ঞান প্রচার করিয়া জগৎকে সমৃদ্ধশালী করিবার শক্তি দ্বারাই একটা জাতীয় জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ হয়। যে জাতি সে শক্তি হারাইয়াছে, যে শুধু পরের নিকট হইতে অনুগ্রহই নয়, পরকে কিছুই দেয় না, সে জাতির জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে একটা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা যায় না, কোনো সনন্দ বলেও তাহার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা জগৎকে যাহা দিবে তাহার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে। সুতরাং জীবন্ত এবং শক্তিশালী হইতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম আদর্শ হওয়া কর্তব্য, অভিব্যক্তি, এবং সেই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতকে স্বীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

সমালোচকগণ বলেন, যে, ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষাপ্রচার করিবার যোগ্যতা ভারতবর্ষের নাই। তাঁহারা বলেন যে, ভারতে সার্বজনীন আদর্শ নাই, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত অধিবাসীদের মধ্যে কোন সংযোগসূত্র নাই, তাহার অতীত ও বর্তমানের অব্যাহত পরম্পর্য নাই—আছে শুধু অসহিষ্ণু শাস্ত্রের অনুশাসন, যুক্তির পরিবর্তে শাস্ত্রের আদেশ—কল্পনা প্রিয় বলিয়া ভারতবাসীরা সত্যজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে পারে না; বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই—এই সমস্ত উক্ত অজ্ঞতাপ্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ভারতের সর্বজনীনভাব

প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র এবং সাধারণ প্রজার পুত্রকে গুরুগৃহে একই প্রকার আড়ম্বরবিহীন জীবনযাপন করিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে আছে বলিয়া আমি জানি না। আমাদের মহাকাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, তিন হাজার বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজসভার সম্মুখে একটি বিরাট অস্ত্র পরীক্ষা হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র অর্জুনকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জুন ঘৃণাভরে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—'যাহার কোনো বংশমর্যাদা নাই, রাজপুত্র তাহার সহিত অস্ত্র বিনিময় করেন না।' প্রত্যুত্তরে কর্ণ বলিয়াছিলেন—'আমিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা, আমার কার্যই আমার আভিজাত্যের পরিচয়।' নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের নিজের অধিকারের দাবি বোধ হয় এই সর্বপ্রথম।

আমার যখন শিক্ষারম্ভ হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা আমাকে কোনো ইংরেজি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া বাংলা পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন। তথায় কৃষক পুত্ররা ছিল আমার সহপাঠী, তাহাদের নিকট হইতে আমি শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা চাষ করিয়া সবুজ ক্ষেতে সোনার ফসল জন্মাইত, তাহাদের সহিত থাকিয়া আমার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জন্মে। বিশাল নদীর মধ্যে এবং এদো পুকুরে যে সমস্ত আশ্চর্য জীব বাস করে ধীবর বালকেরা তাহাদের গল্প আমাকে শুনাইত। তখন হইতেই প্রতি পদে আমি একটা অদ্ভুত আবেগ অনুভব করিতাম। সহপাঠীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইতাম, আমার জননী আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু, আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ "অস্পৃশ্য" ছিল, তাহাতে কিন্তু মায়ের কোনও বিরক্তি হইত না। তিনি সকলকেই নিজের পুত্রের মতো আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সত্য সত্য মায়ের প্রাণ এইভাবে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া কাঙালকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে পারে। এই সুকুমার বয়সে আমাকে কেন বাংলা পাঠশালায় দেওয়া হইয়াছিল আজ আমি তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তথায় আমি মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং আমাদের মহাকাব্যগুলির মধ্য দিয়া আমি আমাদের জাতীয় সভ্যতার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম।

এইভাবেই অতীত ভারতের সর্বজনীনভাব বিদ্যামান ছিল। বিক্রমাদিত্যের সভা ছিল রাষ্ট্রচালক, বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিনিধিস্বরূপ "নবরত্ন" না থাকিলে সে সভা পূর্ণ হইত না। প্রজা রাজাকে সম্মান করিত, রাজশক্তির ভয়ে নহে, রাজা প্রজার মন ও হৃদয় রঞ্জন করিতেন বলিয়াই। দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্য যেন চিরকাল বিরাজমান দেখিতে পাই।

ভারতে বিদ্যাচর্চার ধারা

শিক্ষা প্রচারে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ভারতে কখনও কোনো বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, অমর আচার্যগণ আজিও জীবিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। দেখিতেছি, আচার্য শঙ্কর পাণ্ডিত্য প্রভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত

দেশ জয় করিয়া চলিয়াছেন। দেখিতেছি বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কয়েকখানি তালপাতার পুঁথি মাত্র সম্বল লইয়া হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিতেছেন—উদ্দেশ্য তিব্বত, চীন ও সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞানালোক প্রচার। এই যে বিদ্যার অনুশীলন, তাহা কখনও কোনো বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না! বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত ছিল। আচার্যের খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই সুদূর দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিয়া আচার্যগৃহে সমবেত হইত। সেই প্রাচীন রীতি অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। কারণ, বর্তমানকালেও চিন্তানায়কগণ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ঐক্য ও জাতিবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। ঠিক ঠিক ভাবে যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও প্রকৃতির লোক এদেশে আসিয়া এদেশকে নিজের মনে করিয়াছে, তাহাদিগকে এদেশ কি মহাশক্তি বলে নিজের করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে।

জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা

একথা সত্য যে আচারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে নূতন সত্য গ্রহণ করা যায় না, সত্যান্বেষণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড় বিঘ্ন আর নাই। একথা বলা যায় যে, এই সংকীর্ণতার ভাব প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যেই অধিকতর প্রকট। গ্যালিলিওকে যে বাধ্য হইয়া সত্য কথা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল এবং ব্রুনোকে যে আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল ইহা সর্বজনবিদিত! এই অসহিষ্ণুতা পাশ্চাত্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ডারুইনের ঊর্ধ্বর্তন বাদ শিক্ষা দেওয়া দণ্ডনীয়। বিজ্ঞানক্ষেত্রেও এরূপ একটা গণ্ডি আছে! কোন বড় আবিষ্কারই আবিষ্কারকের জীবনকালে আদৃত হইতে দেখা যায় না।

এদেশে শাস্ত্রানুশাসনের গণ্ডি জ্ঞানচর্চাকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশেই দুইটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটি শাস্ত্রাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্তিবাদ অপরটি যুক্তিবাদ—প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাহার ভিত্তি। ভক্তিবাদীরা বোধ হয় একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তাহাদের অনুগ্রহের ওপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহাতে ভগবানের অবমাননা করা হয়, এজন্যই বোধহয় যুক্তিবাদের সৃষ্টি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সর্বদর্শী ছিলেন, সুতরাং জ্ঞানের আর প্রসার সম্ভব নহে! এরূপ অন্যায় দাবি অবশ্য আমাদের করা কর্তব্য নহে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবিরত পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞানের মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অতটা সাফল্য সত্ত্বেও একথা বলিবার মতো উদারতা তাঁহাদের ছিল যে, সত্যের সহিত না মিলিলে বেদও অগ্রাহ্য। এই যে সত্যান্বেষণের স্বাধীনতা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করার অর্থ—কপট দেশভক্তি।

অতীত ভারতের দান

কোনও একটা বিশেষ জাতির উপরই জগতের জ্ঞানের প্রসার নির্ভর করে, একথা বলার মতো অজ্ঞতা আর নাই। সমগ্র জগৎ পরস্পর নির্ভরশীল, যুগযুগান্তের চিন্তাধারা

অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যজগৎকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই পরস্পর নির্ভরশীলতাই মানবসভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

জ্ঞানের উন্নতি একমাত্র পাশ্চাত্যের দান, একথা বলার অর্থ ইতিহাসের কদর্থ করা। রাষ্ট্রনীতির উন্নতিও পাশ্চাত্যের দান—একথাও অসত্য। মহীশূর রাজ্যের দুইজন কর্মচারী অসীম ধৈর্য বলে অতীতের আবরনোম্মচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা মহীশূরের পক্ষে গৌরবের কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাভারতীয় চেষ্টার ফলেই প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ডাক্তার শ্যামা শাস্ত্রী যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বাহির করিয়াছেন তাহাও একটি মহৎ দান।

কিন্তু অতীত গৌরবে সন্তুষ্ট থাকিলেই আমাদের চলিবে কি? সমালোচকগণ বারংবার বলিয়াছেন যে, আমাদের অতীত গৌরব যাহাই হউক না কেন, ভারতের জাতীয় জীবনে নবজাগরণ অসম্ভব। তাঁহারা বলেন যে, সাফল্য আমাদের কদাচিৎ হইয়াছে, ব্যর্থতাই আমাদের বেশি। আমার উত্তর এই যে, ব্যর্থতা তো অস্থায়ী, সফলতাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী। যাহা অতি স্পষ্ট তাহাই আমরা দেখিতে পাই না। মনুষ্য চক্ষুর অগোচর যে মহাশক্তি রহিয়াছে, যে শক্তি মানুষকে আকাঙক্ষা পূরণে চেষ্টিত করে, সে শক্তি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি তবে বুঝিতে পারিব যে, কার্যকারণের সম্বন্ধ যেমন নিত্য, জয়-পরাজয়ের সম্বন্ধও তেমনি নিত্য। আমাদের একথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ব্যর্থতার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মহাশক্তি, সে শক্তি যখন পরিচালিত হয় তখনই আসে সাফল্য।

আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান

বিজ্ঞান প্রাচ্যেরও নহে, পাশ্চাত্যেরও নহে, ইহা বিশ্বজনীন। তথাপি ভারতবর্ষ উত্তরাধিকাসূত্রে বংশ পরম্পরায় যে ধীশক্তি পাইয়াছে, তাহার দ্বারা সে জ্ঞানপ্রচারে বিশেষ করিয়া সক্ষম। যে জ্বলন্ত কল্পনা বলে ভারতবাসী পরস্পর বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্য হইতে সত্য বাছিয়া লইতে পারে, সে কল্পনাই আবার ভারতবাসী সংযত করিতে পারে। এই মনঃসংযমই সত্যান্বেষণের শক্তি দিয়া থাকে।

সত্যান্বেষণের জন্য দুইটি পথ আছে। একটি অন্তদর্শন, অপরটি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা। উদ্দেশ্যবিহীন গবেষণায় কোনো বিশেষ ফল লাভ হয় না, অসংযত কল্পনা আকাশকুসুমের সৃষ্টি করে। সুতরাং কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা সমানভাবে থাকা চাই।

বৃক্ষের প্রাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর অসুবিধা এই যে, বৃক্ষের প্রাণক্রিয়া মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে বৃক্ষের অভ্যন্তরে নির্বাহ হইয়া থাকে। বৃক্ষের কলাকৌশল জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুকে স্বয়ং বৃক্ষের হৃদক্রিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার জটিল প্রাণক্রিয়া বুঝিতে হইলে, ক্ষুদ্রতম প্রাণাণু বা 'প্রাণ-কোষের'' সন্ধান করিতে হইবে। এবং সেই কোষের স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এজন্য আমাকে অতি সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনো জিনিসকে মাত্র কয়েক হাজার গুণ বড় করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই বিজ্ঞান রাজ্যে একটা নবযুগের সূচনা হইয়াছে। ''ক্রেস্কোগ্রাফ'' নামক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহাতে কোনো জিনিসকে পাঁচ কোটিগুণ বড় করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্র উদ্ভাবনের

ফলে একটা নূতন জগতের বিরাট রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, উদ্ভিদ স্বয়ং নিজের আভ্যন্তরীণ প্রাণক্রিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

সংযতভাবে তথ্যানুসরণের পথে অগ্রসর হইতে হইতে অনুসন্ধিৎসু একটা আশ্চর্যের রাজ্যের দিকে চলিয়া থাকে। আলোকের শেষ রশ্মি যখন লোপ পায় তখনও তাহাকে অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে হয়। যখন শব্দের ধ্বনি শেষ হয় তখনও সে শব্দের স্পন্দন শুনিতে পায়। এইভাবে সে অদৃশ্যপূর্ব একটা নূতন জগতের সন্ধান পায়, অশ্রুতপূর্বকে শুনিতে পায়। সে তথায় এমন একটা প্রাণের সন্ধান পায়, যাহা আমাদের প্রাণের মতোই সুখদুঃখ ভোগ করে। মানুষের কর্মেন্দ্রিয় অপরিপূর্ণ, সেই অপরিপূর্ণতাকে অগ্রাহ্য কবিয়া মানুষ যে অজানিত মহাসাগরে অনুসন্ধান করিবার মতো একটি চিন্তাতরণী নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা কি আশ্চর্যের কথা নহে। অনুসন্ধিৎসুর এই সন্ধানযাত্রার মাঝে মাঝে সে নূতন নূতন আশ্চর্যের সন্ধান পায়। এ পর্যন্ত যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সে জগতের মহাস্পন্দন অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছে, এই সমস্ত নূতন আশ্চর্যের দ্বারা তাহার সে মায়ার বিনাশ হয়। অন্তদর্শন এবং বহিঃ পরীক্ষার মিলনের ফলে সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার ঐক্য প্রমাণিত হইয়াছে, একই প্রকারের অভিব্যক্তির মধ্যে যে যবনিকা ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রাণক্রিয়া যে একই প্রকার তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মনঃসংযোগ

প্রথমে যে সমস্ত বিঘ্ন দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, বহুবর্ষ চেষ্টার ফলে সেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করার পর এই সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপার আমার নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতসুলভ মনঃসংযমই পরিণামে জয়ী হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পথ সুগম নহে। তাহাকে লোহার শরীর মন লইয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রামে অগ্রসর হইত হয়। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া জীবনকে আহূতি দিতে হয়। সুলভ সাফল্যের লোভ তাহার বীরহৃদয়কে আকৃষ্ট করে না। দুর্লভের অনুসরণে ব্যর্থতার দুঃখই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

আমি যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করি, তখন একথা বলা হইত যে. আমাদের ছাত্ররা হস্ত কৌশলে নিপুণ নহে, ভারতবাসীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। বহুবর্ষের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইচ্ছাশক্তি সহায়ে অতিক্রম করা যায় না এমন কোনো বিঘ্ন নাই। যখন কেহ একটা মহান উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করে তখন তাহার নিকট রুদ্ধগৃহের কপাট খুলিয়া যায়, অসম্ভব সম্ভব হয়। যে জাতি অতীতকালে হস্ত নৈপুণ্যে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে সে জাতিএখনও লোপ পায় নাই, ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। আমার কারুশিল্পীদিগকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগকে একটা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়া তুলিলাম। যে সমস্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে তাহা আমার বিজ্ঞান মন্দিরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কারুশিল্পীগণই নির্মাণ করিয়াছে। ইউরোপে ও আমেরিকার সর্বত্র এই সমস্ত যন্ত্র অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে, দক্ষ যন্ত্রশিল্পীগণকে অনুরূপ যন্ত্র নির্মাণের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদের যন্ত্রশিল্পীদের হস্তনৈপুণ্যের কাছাকাছি অগ্রসর হইতেও

তাঁহারা সমর্থ নহেন। বর্তমানকালে বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশ বিশেষ কোন শিল্পোন্নতি করিতে সমর্থ নহে, এজন্যই এই কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন।

উপযোগিতা

প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, উদ্ভিদ জীবনের রহস্যভেদের চেষ্টা করিয়া লাভ কি? ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে যখন আমি প্রথম বেতার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত শক্তি সহায়ে দূরাবস্থিত একটি যন্ত্রকে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং একটি মাইন ফাটাইয়াছিলাম সেদিনও আমাকে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। বহুদূরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ সমস্যাও আমার বিজ্ঞানাগারে উদ্ভাবিত "গ্যালিনা রিসিভার" নামক যন্ত্র দ্বারা সমাধান হইয়াছিল।

উদ্ভিদ জীবনের রহস্যভেদের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, "ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। ব্যবহারিক কৃষিতে ইহা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ঔষধির সমক্রিয়া সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। ফলে ভারতের অনেক ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। নবোদ্ভাসিত 'রেজনেন্ট কার্ডিওগ্রাফ' বৃক্ষের হৃদস্পন্দন ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে সমর্থ। অবসাদের সময় বিভিন্ন ঔষধি প্রয়োগের দ্বারা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া কীভাবে বর্ধিত হয় তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় গাছপালা হইতে মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য বহু নূতন ঔষধ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শিক্ষা প্রচারে ভারতের চেষ্টা

সম্প্রতি আমি লোকানোতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। সেই সম্মেলন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। যে শিক্ষা পদ্ধতি লোককে চিরকাল দাস করিয়া রাখে তাহা অনিষ্টকর না হইয়া পারে না। ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে যাইবে ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর কিছুই নাই, তাহাতে অনেক বিপদও আছে। আমরা কেন নিজেদের দেশেই শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব না? এই ধারণা লইয়াই আমি আমার বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নালন্দা এবং তক্ষশীলায় যে জন্য বিদ্যার্থীগণ আসিয়া সমবেত হইত আমি সেই আদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী। আমার সে স্বপ্ন বহুলাংশে সফল হইয়াছে। আমি যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছি এই উন্নতিশীল রাজ্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি করিতে পারিবে এ আশা আমি করি। আপনাদিগকে অটল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সেই বিশ্বাসের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতীয় চেষ্টায় ভারতীয় বিদ্যার্থী দ্বারা কি কার্য হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

অর্থনৈতিক সমস্যা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেরও তেমনি অর্থসংকট দেখা দিয়াছে। ভারতে এই সংকট প্রবল বলিয়াই সমস্যা কঠিন দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার তাড়ণায় লোকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং শান্তির প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিয়া দেয়। অতীব দুঃখের কথা এই যে আমাদের দেশে এত সম্পদ নিহিত থাকা এবং শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদিগকে এই অবস্থায়

পড়িতে হইয়াছে। আমরা কিছু আবিষ্কার করিতে পারি না, কিছু উদ্ভাবন করিতে পারি না— এইরূপ বাজে কথা বলিয়া এতদিন আমাদের সমস্ত চেষ্টার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে এই উক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়ীগণ দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মত ছোটো ছোটো দেশেও আমি কোনো অর্থকষ্ট দেখি নাই; অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ওই সমস্ত দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা সম্পন্ন নহে। তাহাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তথায় সর্ববিষয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে, দারিদ্র্য তথায় নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের সম্পদ কাজে লাগাইয়া তাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারি না? শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য আমাদেরও কর্তব্য বিদেশের উপর নির্ভর না করা। ইহা করিতে হইলে দূরদর্শী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আবশ্যক। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তির একটা বিশেষ উপেক্ষা দেখা যায়। মহীশূর রাজা এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন, ইহা সুখের কথা।

কূটচক্র

মানুষ যখন তাহার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত এই বিস্তীর্ণ সাগর ও আকাশ দেখিতে পাইল তখন সে ছুটিয়া বাহির হইল। তরঙ্গায়িত সাগর বহিয়া সে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিল। আকাশের স্পর্ধার আহ্বান সে গ্রহণ করিল, সাহসের দ্বারা আকাশ জয় করিয়া অবারিত শূন্যমার্গ প্রতিষ্ঠা করিল। মানুষ স্রষ্টা, এই সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপারই মানুষের অজেয় ঐশী শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। যে দুর্বল নিজের ঐশী শক্তির কথা বিস্মৃত হয়, সে হীন নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করে। যে লোক স্বীয় চেষ্টার দ্বারা জয়ী হইয়াছে, একমাত্র সেই নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জগতকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

আজ জাতীয় জীবনে একটা আশ্চর্য দৌর্বল্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দুর্বল ও জীর্ণের প্রতি প্রকৃতির কোনো দয়া নাই।

জীবনধারণের জন্য, যতটুকু আবশ্যক, অলস প্রকৃতির লোক ততটুকু সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। তাহাতে তাহার কর্মশক্তি হ্রাস পায়। সে ব্যাধিকে বাধা দিতে পারে না। ফলে জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, তারপর আসে দারিদ্র্য, শেষে মৃত্যু। এইভাবে কূটচক্র ঘুরিতেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যে এরূপ দেখা যায় না। জাতির মহাদুর্দিনেও তাহারা কর্মশক্তি বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের শ্রমের বলে তাহারা জাতিকে স্বচ্ছল করিয়া তুলিতেছে।

দুইয়ের পার্থক্যের উদাহরণস্বরূপ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই বিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগ বিসর্জন দিয়া আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আদালতে যাইয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের অনুসরণ ভিন্ন যেখানে প্রতিভা দেখাইবার অন্য উপায় নাই, সে দেশ যে কি দুর্দশায় পড়িয়াছে এবং সে দেশে যে কি দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অন্ধ ভিন্ন সকলেই দেখিতে পায়।

জাপানের গভর্নমেন্ট প্রতিভাবান ছাত্রের মধ্যে কি যত্ন লইয়া থাকেন তাহা দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান ছাত্রদিগকে জাপানের গভর্নমেন্ট দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করেন। আমি দেখিয়াছি যে, প্রতিভাবান ছাত্ররা প্রধান প্রধান কর্মচারীদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতি। ইউরোপ এবং আমেরিকায় জাপানি ছাত্রদের শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যে, দুই বৎসরের মধ্যে তাহারা খ্যাতনামা শিক্ষকদের নিকট হইতে স্ব-স্ব বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। দেশে ফিরিয়া তাহারা বেকার বসিয়া থাকে না। জাপান গভর্নমেন্ট পূর্ব হইতেই তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। তাহারাও প্রতিভা খাটাইবার পূর্ণ সুযোগ পায়।

আদর্শ দেশীয় রাজ্য

মহীশূর রাজ্য যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করিতেছে এক্ষণে আমি সে আদর্শের কথা আলোচনা করিব। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পোন্নতির চেষ্টা বিচ্ছিন্ন নহে। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্ভব নহে। অবশ্য অন্যান্য এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্ভব। কিন্তু আমাদের অত টাকা ব্যয় করিবার সামর্থ নাই; কিন্তু সেজন্য পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। অজেয় শক্তিসম্পন্ন মানুষের মন কি কিছুই করিতে পারে না? অবসাদ দূর করো, দৌর্বল্য পরিহার করো। স্মরণ রাখিও ভারতবর্ষই আমাদের কর্মক্ষেত্র, এস্থানেই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, অন্য কোথাও নহে। সামান্য সম্বলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিরাট কার্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেকথা ভুলিয়া না যাই।

যাঁহারা দূরে আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, জাতি গঠনের জন্য এই রাজ্য কতটা চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রজাদের সমস্ত সংবাদ রাখেন। প্রজাদের স্বচ্ছলতা রাজ্যেরই গৌরব। এই রাজ্যেই ভারতীয় রাষ্ট্র চালকগণ স্ব-স্ব প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছেন। রেলপথ প্রসার করিয়া, কোলার স্বর্ণখনির উন্নতি করিয়া, জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া, শিব সমুদ্রম জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া স্যার শিবস্বামী আয়ার যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। অর্থের দ্বারা এই সমস্ত কার্যের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদিগের প্রতিভার পরিচয় দিবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ সহজ নহে। অন্যতম মন্ত্রী স্যার বিশ্বেশ্বরায়া ভদ্রাবতী লৌহ কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, এই রাজ্যের অধিবাসীরা স্বপ্নলোকে বাস করে না, স্বপ্নকে সত্য করিয়া তুলিবার মতো ধৈর্য ও শক্তি তাহাদের আছে। তাহাদের এই উৎসাহের উৎস কোথায়? দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুরুক্তিই এই উৎস।

শিক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা

শিক্ষাদান ও অনুসন্ধিৎসা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। শুধু পুরাতন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষা দেওয়া চলে না। অনেক সময় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন

বলিয়া প্রমাণিত হয়। বড়লোকের কথাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়ার মতো অনিষ্ট নাই। বিদ্যার্থীকে নিজে সত্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করাই আচার্যের প্রধান কর্তব্য। এরূপ আচার্য সহজে মিলে না। সেরূপ আচার্য আপনাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাঁহাকে কার্যের সুবিধা দিতে হইবে। নিজেদের জন্য সর্বদা বিশেষ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবে, এমন একটা শিক্ষিত জাতির সৃষ্টি যেন আপনারা না করেন। একমাত্র জ্বলন্ত প্রদীপই আলোক বিতরণ করিতে সমর্থ। এইরূপ আচার্যের অধীনে থাকিয়া ধৈর্য এবং প্রতিপদে সতর্কতা শিক্ষা করিবে। বিদ্যার্থীরা আচার্যের অংশস্বরূপ হইয়া উঠিবে এবং বংশ পরম্পরায় সত্য ও প্রীতির বিতরণ করিবে। সে প্রীতির ভাব কখনও নাশ হইবে না। আমরা মরিয়া যাইব। রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে সত্য ও প্রীতি বিলাইয়া যাইবে তাহা ধ্বংস হইবে না। সত্য চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ, সত্য অবিনাসী।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

মানব জাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞানের প্রচার ও প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান কার্য, অবশ্য ইহাই একমাত্র কার্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বিভিন্ন মানবজাতির আদর্শ চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া থাকি। মানুষের সাময়িক ত্রুটি দেখিয়া আমাদের নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। মানুষের মহত্ব দেখিয়াই আমাদিগকে উৎসাহিত হইতে হইবে। সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিয়া নহে, সংগ্রামে যোগ দিয়াই আমরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সেবা করিতে পারিব।

দেশ আজ তোমাদিগকেই সর্বাপেক্ষা বেশি চাহিতেছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ, সে কথা স্মরণ রাখিও। তোমরা যে সভ্যতার অধিকারী তাহা যুগযুগান্ত ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, অলস নিস্ক্রিয় থাকিয়া তোমরা সে সভ্যতা নষ্ট করিও না। মানবজাতির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া যে আহ্বান তোমাদের নিকট আসিয়াছে তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দাও। দুঃখ এবং দুঃখের কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। প্রত্যেকে ক্ষত্রিয় হও। পৃথিবী মানুষের দুঃখের রঙ্গক্ষেত্র, সে দুঃখের অংশ কে লইবে? কে গুরুভার বহন করিবে, দুর্বল না সবল?

অতীত ভারতে কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, অবসাদকে নহে। যুদ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। যে সুখে আমরা অপরকে অধিকারী করিতে সমর্থ নহি, আমরা সে সুখের অধিকারী নহি। সুতরাং আমি তোমাদিগকে শক্তিমন্ত্রে আহ্বান করিতেছি। আমি তোমাদিগকে অমর আশায় উদ্বুদ্ধ করিতেছি। এই আশা আমাদিগকে চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিবে। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি নিহীত আছে। যে সভ্যতা নীল উপত্যকার সভ্যতাকে, এসেরিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতাকে প্রজ্বলিত ও নির্বাপিত হইতে দেখিয়াও বাঁচিয়া আছে, সে সভ্যতার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা স্বতঃশক্তি নিহীত আছে—অতীতের অটল বিশ্বাস লইয়া সে সভ্যতা আজ ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে।

ফ্রি-প্রেস

ট্রপিক্যাল মেডিসিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে বক্তৃতা

স্থান ঃ বসু বিজ্ঞান মন্দির ৬. ১২. ১৯২৭ সাল

সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার সমক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দ্যেশ্যে আমি আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করি। যদি এই সমক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে বিজ্ঞান রাজ্যে একটা বিরাট রহস্যের দ্বারোদঘাটন হইবে। জীবদেহের যে সমস্ত জটিল সমস্যা আমরা সমাধান করিতে সমর্থ হই না, উদ্ভিদ দেহের অনুরূপ ক্রিয়া দেখিয়া সে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও জীবের প্রাণের সমক্রিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায়? নিছক কল্পনা যতই আনন্দদায়ক হউক না কেন, তাহাতে কোনো ফল হইবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কঠোর পথে অনুসরণ করিতে হয়। নানাপ্রকার কৌশলে মূক উদ্ভিদকে দিয়াই স্বীয় প্রাণক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[৭. ১২. ২৭ আনন্দবাজার পত্রিকা।]

অবয়ব ও অবয়বের কার্য ঃ প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়ব সমগ্র দেহের এক—একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির পাকযন্ত্রের কার্য তুলনা করিলে এই কথাটি স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পাকযন্ত্রের কার্য হইতেছে পাচকরস নিঃসরণ দ্বারা ভুক্তদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া হজম করা। Sundew নামক কীটভুক উদ্ভিদের পত্রগুলিব মধ্যে কতকগুলি শুঁয়া থাকে, সেই শুঁয়াগুলি একপ্রকার টক রস নিঃসরণ করে। এই রসের মধ্যে কীটপতঙ্গ আটক পড়িয়া যায়। পরে কীটপতঙ্গ যখন ছাড়া পাইবার জন্য হস্তাদি বিক্ষেপ আরম্ভ করে, তখন অন্যান্য শুঁয়াগুলি শিকারকে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। অতঃপর কীটগুলি দ্রবীভূত হইয়া যায়, শুধু কঙ্কালগুলি অবশিষ্ট থাকে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পাকস্থলীর কার্যের নিদর্শন এই ক্ষেত্রে দেখা গেল; কিন্তু প্রাণীদেহের অভ্যন্তরস্থ পাকস্থলীর কার্য এত সহজ নহে। যাহা হউক, পচনক্রিয়ার ক্ষমতা দেখিয়া, ডারুইনের অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য প্রকাশের পর সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কীটভুক উদ্ভিদের পাকস্থলী আছে। Venus নামক গাছের পাতার দুইটি অর্ধাংশ মিলিয়া একটি ফাঁদের আকার ধারণ করে। ঠিক যেন বৃক্ষটি মুখব্যাদান করিয়া থাকে, যেই কোনো কীট ওই ফাঁদে পড়ে অমনি পাতাটি বুজিয়া যায়। Nepenthe-র পাকযন্ত্র একটি থলিয়ার আকৃতি। ইহার পাকযন্ত্র কতকটা প্রাণীদেহের পাকযন্ত্রের অনুরূপ। এইরূপ যদি উদ্ভিদ জীবনে অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যায় যে, সকল সহজে যন্ত্র কীভাবে ধীরে ধীরে জটিল যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রাণীদেহে তিনপ্রকার কোষ আছে—পেশি-কোষ, স্নায়ু-কোষ এবং স্বতঃস্পন্দনশীল কোষ। উদ্ভিদদেহেও অনুরূপ ক্রিয়াশীল কোনো কোষ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উদ্ভিদের নাড়ির সংকোচন প্রসারণ কার্য দেখাইয়াছি, এক্ষণে শুধু রক্ত বা রস সঞ্চালন ক্রিয়া দেখাইলেই চলিবে। প্রাণীদেহে কতগুলি কোষ আছে, যাহাদের স্বতঃসংকোচন বিস্ফোরণের দ্বারা এই কার্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদদেহে এরূপ কোন স্বতঃসংকোচন বিস্ফোরণশীল কোষ আছে কিনা?

উদ্ভিদ ও প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্র ঃ একটি সংকোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদেহের রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই যন্ত্রটির নাম হৃদ্‌যন্ত্র। কেঁচো প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে হৃদ্‌যন্ত্রটি একটি লম্বমান নালাকৃতি, এই হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন বিস্ফোরণের সহায়ে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর স্তরের প্রাণীর মধ্যেও হৃদ্‌যন্ত্রটি লম্বাকৃতি। প্রাণীদেহের হৃদ্‌যন্ত্রস্থিত কোষগুলির বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্পন্দনশীলতা, বিভিন্ন অবস্থায় এই স্পন্দনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোন কোন উত্তেজক ঔষধির ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, ফলে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয়। আবার অবসাদজনক ঔষধির ফলে ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যায়।

রক্তসঞ্চালন কার্যে প্রত্যক্ষীকরণ ঃ একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি একটি ভেকের রক্তসঞ্চালনের কার্য এই যবনিকার ওপর প্রতিফলিত করিতেছি। দেখুন প্রধান শিরা এবং উপশিরার মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক্ষণে একটি অবসাদজনক ওষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, এই দেখুন রক্তপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালন ঃ এক্ষণে প্রশ্ন এই যে উদ্ভিদদেহের রসসঞ্চালন অনুরূপ হৃদ্‌ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয় কিনা? প্রচলিত সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালন জড়ক্রিয়ার ফল—জীবন্ত কোষের প্রাণ ক্রিয়ার ফল নহে। ইউক্যালিপটাস বৃক্ষে ৪৫০ ফুট পর্যন্ত উর্ধে রসসঞ্চালিত হয়, কোনো জড়যন্ত্রের সাহায্যে এতো উচ্চে জল উত্তোলন করা অসম্ভব। প্রাণ ক্রিয়াদ্বারাই এই কার্য হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য স্ট্রাসবার্গার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থাকার ফলে এই প্রাণক্রিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটা খর্ব হইয়া পড়ে।

স্ট্রাসবার্গার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিষ প্রয়োগ দ্বারা উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালন হ্রাস পায় না। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি উদ্ভিদের দেহে রসসঞ্চালন কার্য জীবিত কোষের সাহায্যেই হইত, তবে বিষক্রিয়ার ফলে কোষগুলির নিশ্চয় মৃত্যু হইত এবং রসসঞ্চালন বন্ধ হইত। অন্যান্য অনেকে অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। একটু বাদেই আমি আপনাদিগকে যাহা দেখাইব তাহাতে স্ট্রাসবার্গারের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে আমি প্রমাণ করিব যে, জীবন্ত কোষের স্পন্দনশীলতার ফলেই রসসঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিদদেহে কীভাবে রসসঞ্চালিত হয়, আমি এক্ষণে দেখাইতেছি। আমি আরো দেখাইব

যে অবস্থায় প্রাণীদেহে রক্তসঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সে অবস্থায় উদ্ভিদদেহে রসসঞ্চালনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। রসসঞ্চালনের কোন পরিমাপক কোনো সন্তোষজনক উপায় ইতিপূর্বে উদ্ভাসিত হয় নাই। রসসঞ্চালনের বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমি একটি উপায় বাহির করিতেছি। এই উপায়ে উদ্ভিদের পত্রগুলিকেই মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা যায়। জলাভাবে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে, আবার জল পাইলে পাতাগুলি সোজা হইয়া ওঠে; অধিকন্তু কোনও উপায় যদি রসসঞ্চালন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে পাতাগুলি দ্রুত সোজা হইয়া উঠে! আবার অবসাদ জন্মাইয়া রসসঞ্চালন হ্রাস করিলে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে। পাতাগুলির এই উত্থানপতনের হার এত সামান্য যে চক্ষে ধরা সম্ভব নহে, যন্ত্র সাহায্যে এই হারকে বৃহদাকারে প্রতিফলিত করা সম্ভব, আমি তাহাই দেখাইতেছি। এই যে গাছটি দেখিতেছেন। ইহা জলশূন্য স্থানে ছিল, কাজেই পাতাগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষণে গাছটিকে জলসিঞ্চন করিতেছি। দেখুন পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই পাতাগুলি ঠিক একচোটে সোজা হইয়া উঠিতেছে না, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেছে। ইহা দ্বারাই অদৃশ্য সংকোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আমি এক্ষণে পটাশিয়াম ব্রমাইড নামক অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন, জলসিঞ্চনের ফলে পাতাগুলি যেভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই। পাতাগুলি এক্ষণে আবার কাঁপিতে কাঁপিতে হেলিয়া পড়িতেছে।

প্রাণীদেহে কর্পূর প্রয়োগের ফলে হৃদ্‌ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। আমি সামান্য কর্পূর মিশ্রিত জল এই গাছটিকে দিতেছি। দেখুন, দুইটি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ায় কি সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই দেখুন শেষকালে উত্তেজনা ঔষধটির কার্যই জয়লাভ করিল—প্রতিচালিত আলোকরেখা উর্ধ্বগমন করিয়া রসসঞ্চালন বৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। আমি এক্ষণে গাছটাকে তাড়িতাঘাত করিতেছি। দেখুন তড়িতাঘাতে আমাদের দেহ যেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হয়, গাছটিতেও সেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হইল।

উদ্ভিদ হৃদয়ের সন্ধান ঃ এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গাছটির মধ্যে নিশ্চয়ই আকর্ষণ-বিকর্ষণ কোষ আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে কোষগুলির এই সংকোচন-প্রসারণ হয় তাহার অবস্থিতি কোথায়? আমি আমার বৈদ্যুতিক শলাকা (Electric Probe) সহায়ে এই যন্ত্র অর্থাৎ বৃক্ষের হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থিতির স্থান নির্ণয় করিয়াছি। আমি ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক শলাকাটি গাছটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছি। যে মুহূর্তে শলাকাটি হৃদ্‌যন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে, অমনি বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাওযা গিয়াছে। তারপর যবনিকার উপর প্রতিফলিত আলোকরেখাটি একবার দক্ষিণে, আর একবার বামে দুলিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার আশ্চর্যজনক পরিচয় দিতেছে।

জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম ঃ আপনারা দেখিলেন যে, প্রাণীদেহের এবং উদ্ভিদদেহের হৃদক্রিয়া সমপ্রকার। এক্ষণে আমি আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাই। তাহা প্রাণী এবং উদ্ভিদের হৃদযন্ত্রে ঔষধের সমক্রিয়া। আপনাদের নিকট এই যে গাছটি দেখিতেছেন, এই গাছটিকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করা হইয়াছে। যবনিকার আলোকরেখা দেখুন। দেখিতেছেন যে, গাছটি কিভাবে মৃত্যু কবলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, ঠিক প্রাণীদেহের মতো। দেখুন ক্রমশ

সমস্ত যন্ত্রণা শেষ হইয়া আসিল, ঠিক যেন মৃত্যু হইয়াছে। যথা সময়ে যদি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়াজনক ঔষধি প্রয়োগ করা যায়, তবে গাছটিকে বাঁচানো যাইতে পারে। মৃগনাভি প্রয়োগ করিয়া ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখানো যাইতে পারে।

The Voice of Life
by
Jagdish Chandra Bose

Inaugural Address delivered at the Bose Institute on November 30, 1917

I dedicate today this Institute– not merely a Laboratory but a Temple. The power of Physical methods applies for the establishment of that truth which can be realised directly through our senses, or through the vast expansion of the perceptive range by means of artificially created organs. We still gather the tremulous messages when the note of audible reaches the unheard. When human sight fails, we continue to explore the region of the invisible. The little that we can see is as nothing compared to the vastness of that which we cannot. Out of the very imperfection of his senses man has built himself a raft of thought by which he makes daring adventures on the great seas of the Unknown. But there are other truths which will remain beyond even the super-sensitive methods known to science For these we require faith, tested not in a few years but by an entire life. And a temple is erected as a fit memorial for the estibalishment of that truth for which faith was needed. The personal, yet general, truth and faith whose establishment this Institute commemorates is this; that when one dedicates himself wholly for a great object, the closed doors shall open. And the seemingly impossible will become possible for him.

Thirty-two years ago I chose teaching of science as my vocation. It was held that by its very peculiar constitution , the Indian mind would always turn away from the study of Nature to metaphysical speculations. Even had the capacity for inquiry and accurate observation been assumed present, there were no opportunities for their employment; there were no

well-equipped laboratories nor skilled mechanicians. This was all too true. It is for man not to quarrel with circumstances but bravely accept them; and we belong to that race and dynasty who had accomplished great things with simple means.

FAILURE AND SUCCESS

This day twenty-three years ago, I resolved that as far as the whole hearted devotion and faith of one man counted, that would not be wanting, and within six months it came about that some of the most diffcult problems connected with Electric Waves found their solution in my Laboratory, and received high appreciation from Lord Kelvin, Lord Rayleigh and other leading Physicists. The Royal Society honoured me by publishing my discoveries and offering, of their own accord, an appropriation from the special Parliamentary Grant for the advancement of knowledge. That day lighted would continue to burn brighter and brighter. But man's faith and hope require repeated testing. For five years after this the progress was uninterrupted; yet when the most generous and wide appreciation of my work had reached almost the highest point there came a sudden and unexpected change.

LIVING AND NON-LIVING

In the pursuit of my investigations I was unconsciously led into the border region of physics and physiology and was amazed to find boundary lines vanishing and points of contact emerge between the realms of the Living and Non-living. Inorganic matter was found anything but inert; it also was a thrill under the action of multitudinous forces that played on it. A universal reaction seemed to bring together metal, plant and animal under a common law. They all exhibited essentially the same phenomena of fatigue and depression, together with possibilities of recovery and of exaltation, yet also that of permanent irresponsiveness which is associated with death. I was filled with awe at this stupendous generalisation; and it was with great hope that I announced my results before the Royal Society,

results demonstrated by experiments. But the physiologists present advised me, after my address, to confine myself to physical investigations in which my success had been assured, rather than encroach on their preserve. I had thus unwittingly strayed into the domain of a new and unfamiliar caste system and so offended its etiquette. An unconscious theological bias was also present which confounds ignorance with faith. It is forgotten that He, who surrounded us with this ever-evolving mystery of creation, the ineffable wonder that lies hidden in the microcosm of the dust particle, enclosing within the intricacies of its atomic form all the mystery of the cosmos, has also implanted in us the desire to question and understand. To the theological bias was added the misgivings about the inherent bent of the Indian mind towards mysticism and unchecked imagination. But in India this burning imagination which can extort, new order out of a mass of apparently contradictory facts, is also held in check by the habit of mediation. It is this restraint which confers the power to hold the mind in pursuit of truth, in infinite patience, to wait, and reconsider, to experimentally test and repeatedly verify.

It is but natural that there should be prejudice, even in science against all innovations; and I was prepared to wait till the first incredulity could be overcome by further cumulative evidence. Unfortunately there were other incidents and misrepresentations which it was impossible to remove from this isolating distance. Thus no conditions could have been more desperately hopeless than those which confronted me for the next twelve years. It is necessary to make this brief reference to this period of my life; for one who would devote himself to the search of truth must realise that for him there awaits no easy life, but one of unending struggle. It is for him to cast his life as an offering, regarding gain and loss, success and failure, as one. Yet in my case this long persisting gloom was suddenly lifted. My scientific deputation in 1914, from the Government of India, gave the opportunity of giving demonstrations of my discoveries before the leading scientific societies of the world. This led to the acceptance of my theories and results, and the recognition of the importance of the Indian contribution to the advancement of the world's science. My own experience told me how heavy, sometimes even crushing, are the difficulties which confront an inquirer here in India; yet it made me stronger in my determination, that I shall make the path of those who are to follow me less arduous, and

that India is never to relinquish what has been won for her after years of struggle.

THE TWO IDEALS

What is it that India is to win and maintain? Can anything small or circumscribed ever satisfy the mind of India? Has her own history and the teaching of the past prepared her for some temporary and quite subordinate gain? There are at this moment two complementary and not antagonistic ideals before the country. India is drawn into the vortex of international competition. She has to become efficient in every way,—through spread of education, through performance of civic duties and responsibilities, through activities both industrial and commercial. Neglect of these essentials of national duty will imperil her very existence; and sufficient stimulus for these will be found in success and satisfaction of personal ambition.

But these alone do not ensure the life of a nation. Such material activities have brought in the West their fruit, in accession of power and wealth. There has been a feverish rush even in the realm of science, for exploiting applications of knowledge, not so often for saving as for destruction. In the absence of some power of restraint, civilisation is trembling in an unstable poise on the brink of ruin. Some complemantary ideal there must to be save man from that mad rush which must end in disaster. He has followed the lure and excitement of some insatiable ambition, never pausing for a moment to think of the ultimate object for which success was to serve as a temporary incentive. He forgot that far more potent than competition was mutual help and co-operation in the scheme of life. And in this country through milleniums, there always have been some who, beyond the immediate and absorbing prize of the hour, sought for the realisation of the highest ideal of life—not through passive renunciation, but through active struggle. The weakling who has refused the conflict, having acquired nothing, has nothing to renounce. He alone who has striven and won, can enrich the world by giving away the fruits of his victorious experience. In India such examples of constant realisation of ideals through work have resulted in the formation of a continuous living

tradition. And by her latent power of rejuvenescence she has readjusted herself through infinite transformations. Thus while the soul of Babylon and the Nile Valley have transmigrated, ours still remains vital and with capacity of absorbing what time has brought, and making it one with itself.

The ideal of giving, of enriching, in fine, of self-renunciation in response to the highest call of humanity is the other and complementary ideal. The motive power for this is not to be found in personal ambition but in the effacement of all littlenesses, and uprooting of that ignorance which regards anything as gain which is to be purchased at other's loss. This I know, that no vision of truth can come except in the absence of all sources of distraction, and when the mind has reached the point of rest.

Public life, and the various professions will be the appropriate spheres of activity for many aspiring young man. But for my disciples, I call on these very few, who, realising some inner call, will devote their whole life with strengthened character and determined purpose to take part in that infinite struggle to win knowledge for its own sake and see truth face to face.

EXTENDED REGIONS OF ENQUIRY

The work already carried out in my laboratory on the response of matter, and the unexpected revelations in plant life, foreshadowing the wonders of the highest animal life, have opened out very extended regions of inquiry in Physics, in Physiology, in Medicine, in Agriculture and even in Psycology, Problems, hitherto regarded as insoluble, have now been brought within the sphere of experimental investigation. These inquiries are obviously more extensive than those customary either among physicists or physiologists, since demanding interests and attitudes hitherto more or less divided between them. In the study of Nature, there is a necessity of the dual view point, this alternating yet rhythmically unified interaction of biological thought with physical studies, and physical thought with biological studies. The future worker with his freshened grasp of physics, his fuller conception of the inorganic world, as indeed thrilling with "the promise and potency of life" will redouble his former energies of work and thought. Thus he will be in a position to win now the old knowledge with finer seives,

to re-search it with new enthusiasm and subtler instruments. And thus with thought and toil and time he may hope to bring fresher views into the old problems. His handling of these will be at once more vital and more kinetic, more comprehensive and unified. The further and fuller investigation of the many and ever-opening problems of the nascent science which includes both Life and Non-Life are among the main purposes of the Institute I am opening today; in these fields I am already fortunate in having a devoted band of disciples, whom I have been training for the last ten years. Their number is very limited, but means may perhaps be forthcoming in the future to increase them. An enlarging field of young ability may thus be available, from which will emerge, with time and labour, individual originality of research, productive invention and some day even creative genius.

But high success is not to be obtained without corresponding experimental exactitude, and this is needed today more than ever, and to-morrow yet more again. Hence the long battery of super-sensitive instruments and apparatus, designed here, which stand before you in their cases in our entrance hall. They will tell you of the protracted struggle to get behind the deceptive seeming into the reality that remained unseen;—of the continuous toil and persistence and of ingenuity called forth for overcoming human limitations. In these directions through the ever-increasing ingenuity of device for advancing science, I see at no distant future an advance of skill and of invention among our workers; if this skill be assured, practical applications will not fail to follow in many fields of human activity.

ADVANCEMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE

The advance of science is the principal object of this Institute and also the diffusion of knowledge. We are here in the Largest of all the many chambers of this House of Knowledge—its Lecture Room. In adding this feature, and on a scale higherto unprecedented in a Research Institute, I have sought permanently to associate the advancement of knowledge with the widest possible civic and public diffusion of it; and this without any academic limitations, henceforth to all races and languages, to both men and women alike, and for all time coming.

The lectures given here will not be mere repetitions of second-hand

knowledge. They will announce, to an audience of some fifteen hundred people, the new discoveries made here, which will be demonstrated for the first time before the public. We shall thus maintain continuously the highest aim of a great Seat of Learning by taking active part in the advancement and diffusion of knowledge. Through the regular publication of the Transacations of the Institute, these Indian contributions will reach the whole world. The discoveries made will thus become public property. No patents will ever be taken. The spirit of our national culture demands that we should for ever be free from the desecration of utilising knowledge for personal gain. Besides the regular staff there will be a selected number of scholars, who by their work have shown special aptitude, and who would devote their whole life to the pursuit of research. They will require personal training and their number must necessarily be limited. But it is not the quantity but quality that is of essential importance.

It is my further wish, that as far as the limited accommodation would permit, the facilities of this Institute should be available to workers from all countries. In this I am attempting to carry out the traditions of my country, which so far back as twenty-five centuries ago, welcomed all scholars from different parts of the world, within the precincts of its ancient seats of learning, at Nalanda and at Taxilla.

THE SURGE OF LIFE

With this widened outlook, we shall not only maintain the highest traditions of the past but also serve the world in nobler ways. We shall be at one with it in feeling the common surgings of life, the common love for the good, the true and the beautiful. In this Institute, this Study an Garden of Life, the claim of art has not been forgotten, for the artist has been working with us, from foundation to pinnacle, and from floor to ceiling of this very Hall. And beyond that arch, the Laboratory merges imperceptibly into the garden, which is the true laboratory for the study of Life. There the creepers, the plants and the trees are played upon by their natural environments,--sunlight and wind, and the chill at midnight under the vault of starry space. There are other surroundings also, where they will be subjected to chromatic action of different lights, to invisible rays, to

electrified ground or thunder charged atmosphere. Everywhere they will transcribe in their own script the history of their experience. From his lofty point of observation, sheltered by the trees, the student will watch this panorama of life. Isolated from all distractions, he will learn to attune himself with Nature; the obscuring veil be lifted and he will gradually come to see how community throught out the great ocean of life outweights apparent dissimilarity. Out of discord he will realise the great harmony.

THE OUTLOOK

These are the dreams that wove a network round my wakeful life for many years past. The outlook is endless, for the goal is at infinity. The realisation cannot be through one life or one fortune but through the co-operation of many lives and many fortunes. The possibility of a fuller expansion will depend on very large endownments. But a beginning must be made, and this is the genesis of the foundation of this Institute. I came with nothing and shall return as I came; if something is accomplished in the interval, that would indeed be a privilege. What I have I will offer, and one who had shared with me the struggles and hardships that had to be faced, has wished to bequeath all that is here for the same object. In all my struggling efforts I have not been altogether solitary; while the world doubted, there had been a few, now in the City of Silence, who never wavered in their trust.

Till a few weeks ago it seemed that I shall have to look to the future for securing the necessary expansion of scope and for permanence of the Institute. But response is being awakened in answer to the need. The Government have most generously intimated their desire to sanction grants towards placing the Institute on a permanent basis, the extent of which will be proportionate to the public interest in this national undertaking. Out of many who would feel an interest in securing adequate Endowment, the very first donations have come from two of the merchant princes of Bombay, to whom I had been personally unknown.

A note that touched me deeply came from some girl-students of the Western Province, enclosing their little contribution "for the service of our common motherland." It is only the instinctive mother-heart that can truly

realise the bond that draws together the nurselings of the common homeland. There can be no real misgiving for the future when at the country's call man offers the strength of his life and woman her active devotion; she most of all, who has the greater insight and larger faith because of her life of austereity and self-abnegation.

Even a solitary wayfarer in the Himalayas has remembered to send me a message of cheer and good hope. What is it that has bridged over the distance and blotted out all differences? That I will come gradually to know; till then it will remain enshrined as a feeling. And I go forward to my appointed task, undismayed by difficulties, companioned by the kind thoughts of my well-wishers both far and near.

INDIA'S SPECIAL APTITUDES IN CONTRIBUTION TO SCIENCE

The excessive specialisation of modern science in the West has led to the danger to losing sight of the fundamental fact that there can be but one truth, one science which includes all the branches of knowledge. How chaotic appear the happenings in Nature! Is nature a Cosmos, in which the human mind is some day to realise the uniform march of sequence, order and law? India through her habit of mind is peculiarly fitted to realise the idea of unity, and to see in the phenomenal world an orderly universe. This trend of thought led me unconsciously to the dividing frontiers of different sciences and shaped the course of my work in its constant alternations between the theoretical and the practical, from the investigation of the inorganic world to that of organised life and its multifarious activities of growth, of movement, and even of sensation. On looking over a hundred and fifty different lines of investigations carried on during the last twenty-three years, I now discover in them a natural sequence. The study of Electric Waves led to the devising of methods for the production of the shortest electric waves known and these bridged over the gulf between visible and invisible light; from this followed accurate investigation on the optical properties of invisible waves, the determination of the refractive powers of various opaque substances, the discovery of effect of air film on total reflection and the polarising properties of strained rocks and of electric

tourmalines. The invention of a new type of self-recovering electric receiver made of galena was the forerunner of application of crystal detectors for extending the range of wireless signals. In physical chemistry the detection for molecular change in matter under electric stimulation, led to a new theory of photographic action. The fruitful theory of stereo chemistry was strengthened by the production of two kinds of artificial molecules, which like the two kinds of sugar, rotated the polarised electric wave either to the right or to the left. Again the 'fatigue' of my receivers led to the discovery of universal sensitiveness inherent in matter as shown by its electric response. It was next possible to study this response in its modification under changing environment, of which its exaltation under stimulants and its abolition under poisons are among the most astonishing outward manifestations. And as a single example of the many applications of this fruitful discovery, the characteristics of an artificial retina gave a clue to the unexpected discovery of "binocular alternation of vision" in man,—each eye thus supplements its fellow by truns, instead of acting as a continuously yoked pair, as hitherto believed.

PLANT LIFE AND ANIMAL LIFE

In natural sequence to the investigation of the response in 'inorganic' matter, has followed a prolonged study of the activities of plant-life as compared with the corresponding functioning of animal life. But since plants for the most part seem motionless and passive, and are indeed limited in their range of movement, special apparatus of extreme delicacy had to be invented, which should magnify the tremor of excitation and also measure the perception period of a plant to a thousandth part of a second. Ultra-microscopic movements were measured and recorded; the length measured being often smaller than a fraction of a single wave-length of light. The secret of plant life was thus for the first time revealed by the autographs of the plant itself. This evidence of the plant's own script removed the long-standing error which divided the vegetable world into sensitive and insensitive. The remarkable performance of the Praying Plam Tree of Faridpore, which bows, as if to prostrate, itself, every evening, is only one of the latest instances which show that the supposed insensibility of plants

and still more of rigid trees is to be ascribed to wrong theory and defective observation. My investigations show that all plants, even the trees, are fully alive to changes of environment; they respond visibly to all stimuli even to the slight fluctuations of light caused by a drifting cloud. This series of investigations has completely established the fundamental identity of life-reactions in plant and animal, as seen in a similar periodic insensibility in both, corresponding to what we call sleep; as seen in the death-spasm which takes place in the plant as in the animal. This unity in organic life is also exhibited in that spontaneous pulsation which in the animal is heart-beat; it appears in the identical effects of stimulants, anaesthetics and of poisond in vegetable and animal tissues. This physiological identity in the effect of drugs is regarded by leading physicians as of great significance in the scientific advance of medicine; since here we have a means of testing the effect of drugs under conditions far similar than those presented by the patient, far subtler too, as well as more humane than those of experiments on animals.

Growth of plants and its variations under different treatment is instantly recorded by my crescograph. Authorities expect this method of investigation will advance practical agriculture; since for the first time we are able to analyse and study separately the conditions which modify the rate of growth. Experiments which would have taken months and their results vitiated by unknown changes, can now be carried out in a few minutes.

Returning to pure science, no phenomena in plant life are so extremely varied or have yet been more incapable of generalisation than the "tropic" movements, such as the twining of tendrils, the heliotropic movements of some towards and of others away from light, and the opposite geotropic movements of the root and shoot, in the direction of gravitation or away from it. My latest investigations recently communicated to the Royal Society have established a single fundamental reaction which underlies all these effects so extremely diverse.

THE GREAT MYSTERY

Finally, I may say a word of that other new and unexpected chapter which is opening out from my demonstration of nervous impulse in plants.

The speed with which the nervous impulse courses through the plant has been determined; its nervous excitability and the variation of that excitability have likewise been measured. The nervous impluse in plant and in man is found exalted or inhibited under identical conditions. We may even follow this parallelism in what may seem extreme cases. A plant carefully protected under glass from outside shocks, looks sleek and flourishing; but its higher nervous function is then found to be atrophied. But when a succession of blows is rained on this effete and bloated specimen, the shocks themselves create nervous channels and arouse anew the deteriorated nature. And is it not shocks of adversity and not cotton-wool protection, that evolve true manhood?

A question long perplexing physiologists and psychologists alike is that concerned with the great mystery that underlies memory. But now through certain experiments I have carried out, it is possible to trace "memory impressions" backwards even in inorganic matter, such latent impressions being capable of subsequent revival. Again, the tone of our sensation is determined by the intensity of nervous excitation that reaches the central perceiving organ. It would theoretically be possible to change the tone or quality of our sensation, if means could be discovered by which the nervous impulse would become modified during transit. Investigation on nervous impluse in plants has led to the discovery of a controlling method, which was found equally effetive in regard to the nervous impulse in animal.

Thus the line of physics, of physiology and of psychology converge and meet. And here will assemble those who would seek oneness amidst the manifold. Here it is that the genius of India should find its true blossoming.

The thrill in matter, the throb of life, the pulse of growth, the impulse coursing through the nerve and the resulting sensations, how diverse are these and yet how unified! How strange it is that the tremor of excitation in nervous matter should not merely be transmitted but transmuted and reflected like the image on a mirror, from a different plane of life, in sensation and in affection, in thought and in emotion. Of these which is more real, the material body or the image which is independent of it? Which of these is undecaying, and which of these is beyond the reach of death?

THE SOUL OF INDIA

It was a woman in the Vedic times, who when asked to take her choice of the wealth that would be hers for the asking inquired whether that would win for her deathlessness. What would she do with it, if it did not raise her above death? This has always been the cry of the soul of India, not for addition of material bondage, but to work out through struggle her self-chosen destiny and win immortality. Many a nation had risen in the past and won the empire of the world. A few buried fragments are all that remain as memorials of the great dynasties that wielded the temporal power. There is, however, another element which finds its incarnation in matter yet transcends its transmutation and apparent destruction : that is the burning flame born of thought which has been handed down through fleeting generations.

Not in matter, but in thought, not in possessions or even in attainments but in ideals, are to be found the seed of immortality. Not through material acquisition but in generous diffusion of ideas and ideals can the true empire of humanity be established. Thus to Asoka to whom belonged this vast empire, bonded by the inviolate seas, after he had tried to ransom the world by giving away to the utmost, there came a time when he had nothing more to give, except one half of an Amlaki fruit. This was his last possession and his anguished cry was that since he had nothing more to give, let the half of the Amlaki be accepted as his final gift.

Asoka's emblem of the Amlaki will be seen on the cornices of the Institute, and towering above all is the symbol of the thunderbolt. It was the Rishi Dadhichi, the pure and blameless, who offered his life that the divine weapon, the thunderbolt, might be fashioned out of his bones to smite evil and exalt righteousness. It is but half of the Amlaki that we can offer now. But the past shall be reborn in a yet nobler future. We stand here today and resume work tomorrow so that by the efforts of our lives and our unshaken faith in the future we may all help to build the greater India yet to be.

—সমাপ্ত—